শ্রীমতী অনীতা ও বিনয়ভূষণ রায়

—যুগলকরকমলেষু।

লেখকের অন্যান্য রচনা :

বসন্ত কেবিন

একটি অশ্রু, দুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ

চত্র ত্রবাচি

নব বৃন্দাবন

অন্য প্রত্যহ

এলেবেলে

অপাঠ্য

দ্বিতীয় প্রেম

নীলকণ্ঠ

১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট · কলকাতা·বারো·

দ্বিতীয় প্রেম

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

এখন রাস্তার দিকে তাকানো যায় না।

সূর্যদেব তাঁর ভরা যৌবন বিলুচ্ছেন দু'হাতে। যতদূর চোখ যায় শুধু রোদ্দুর আর রোদ্দুর; ধু ধু করছে রোদ্দুরের অথৈ সমুদ্দুর। রিক্সাওলা ফুটপাথের ওপর গাছের নীচে বসে ছাতু খাচ্ছে; পেতলের থালাবাটি; মাজতে মাজতে ঘষতে ঘষতে সোনার মতো তার রং হয়েছে। সেই পেতলের থালার কানার ওপর ঠিকরে পড়েছে সূর্যের আলো। মুহূর্তটাকও তার ওপর চোখ রাখা যায় না; চোখ রাখলে চোখ ঝলসে যায়। লোকজন বিরল হয়ে এসেছে রাস্তায়; বাড়ী ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ। কোনও কোনও জানালায় কোনও কোনও দরজায় খস্‌খস শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে জলে নেয়ে উঠতে না উঠতে। বালতি আর পিচকিরি পড়ে আছে সামনেই। চাকরটা খেতে গেছে; গাড়ী যাচ্ছে মাঝে মাঝেই; একটু দূরেই ট্রামের আর বাসের যাত্রীবিহীন যাতায়াত অব্যাহত। দু'একটা ছাতা অবশ্যই যে এই দুঃসহ দুর্বহ গরমেও রৌদ্ররুক্ষ রাজপথের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে না যে এমন নয়। থেকে থেকেই হাঁক দিচ্ছে তিন চাকার সাইকেল ঃ ম্যাগনোলিয়া আইসক্রীম। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কাপড়ওলা কপালের ঘাম আঙুলের বোঁটায় মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে ইদিক-উদিকের জানলায় দরজায় বারান্দায় তাকাচ্ছে আর হাঁকছে হঠাৎ হঠাৎ ঃ জামার ছিট, ভালো ভালো জামার ছিট, সস্তায় ছিট কাপড়! কয়েক শো গজ পেছনে পড়ে আছে তার কুলি; মাথায় মোট নিয়ে সে তপ্ত পায়ে আসছে এদিকেই; গাছের কাছাকাছি আসা মাত্তরই এগিয়ে পড়বে বিশ্রামরত ছিট কাপড়ওলা; চীৎকার করে চলতে সুরু করবার আগে অবশ্য গাছের গায়ে ঠেসান দেওয়া মাপবার গজ কাঠিটা দুহাতের চেটোয় তুলে নিতে ভুলবে না সে; শুধু কুলিটাই সময় পাবে না দুদণ্ড জিরোবার।

সদর ষ্ট্রীটের এই ছোট্ট হোটেলটায় ছটফট করছিলো রতনলাল মুন্সী।

ষ্টুডিও থেকে গাড়ী আসবার সময় সেই কখন পেরিয়ে গেছে: হর্ণ শুনবার অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে আধ কুড়ি সিগারেট পুড়িয়েছে রতনলাল অর্ধেক না খেয়ে; অর্ধেকেরও কম পর্যন্ত টান দিয়ে কোনওটায়। এবং খসখসের ফাঁক দিয়ে গাড়ীর আওয়াজ পেলেই উঁকি দিয়েছে তৎক্ষণাৎ। কিন্তু না; কোনও রথই তার হোটেলের সদর আঙিনায় পার্ক করেনি এখনও পর্যন্ত। ষ্টুডিওর গাড়ী আসতে দেরী হলে ভয় হয়; ভয় হয়,—বোধ হয় আর তাঁকে দরকার নেই। চিরকাল অবশ্য এমন ছিলো না; একদিন সত্যিই ছিলো যখন ষ্টুডিওর সিক্স সিলিণ্ডার ষোলো অশ্বশক্তি দিনরাত পড়ে থাকত তার দরজায়; কে জানে মুন্সী সাহেবের কখন দরকার হয় বাহনের। দরকার না হলেই বা কি এসে যেত সেদিন! রতনলাল মুন্সী তার সমস্ত জীবন দিয়ে একটা সত্য অন্তত জেনেছে;—যে সত্য মন থেকে কোনওদিন মুছবার নয়। যে মুহূর্তে তোমার সমস্ত দরকার ফুরিয়েছে সেই মুহূর্তে তোমার যা কিছু কাম্য সব লুটিয়ে পড়েছে তোমার দুপায়ে; আশ্চর্য।

টাকার যার দরকার নেই টাকা গড়াগড়ি যাবে শুধু তারই দরজায় চিরকাল। টাকার দরকার যার এতদূর যে মানুষের নিঃশ্বাস নেবার চেয়েও অনেক বেশী জরুরী, টাকা দূরে থাক এক কাণাকড়িও আর ছায়া মাড়াবে না তার; একদিনের জন্যও নয়। আশ্চর্য! জীবনে কতবার কত ব্যাপারে যে এই অভিজ্ঞতা অকাট্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে রতনলালের কাছে তার আর ইয়ত্তা নেই। যে চেয়েছিল ঘর বাঁধতে; একটি কল্যাণী নারী আর তিনটি সন্তান,—তিনটি তাজা কুসুম নিয়ে কালের কণ্ঠে চেয়েছিল চিরকালের হার হতে তার সংসার ভেঙ্গে গেলো তরঙ্গের একটি মাত্র আঘাতে যেমন ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে বালির বাঁধ। আর যে চায়নি কোনও দিন শান্তির নীড়; স্ত্রীলোক ছিলো যার কাছে একমাত্র কামনা উদযাপনের জীবন্ত সুযোগ মাত্র তাকেই বিবাহের প্রতিজ্ঞায় বাঁধতে গিয়ে আরেকজনের স্ত্রী বলি দিল নিজের সত্তা; সংসারের শ্রী; সন্তানের মঙ্গল। আশ্চর্য!

না; না। এসব কি ভাবছে রতনলাল মুন্সী। নিদারুণ ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ফিরিয়ে আনল অতীত দিনের রোমন্থনবিলাস থেকে। উত্তেজিত নার্ভ ঠাণ্ডা করবার কারণে গরল পান করে রতনলাল ঢক ঢক করে। এখন অবশ্য মদ হিসেব করে খেতে হয় তাকে। মনে রাখতে হয় তার স্বরচিত নীতিপত্রের নির্দেশ ঃ

যেজন দিবসে মনের হরসে চালায় বিলিতি দিশি,—আশুগৃহে তার দেখিবে না আর নিশীথে রঙীন শিশি।

নীচ থেকে ঠিক এই সময়েই একটা হাল্লা উঠে এলো ওপরের ঘরে।

রতনলাল মুন্সীর এখন যে ঘরে অবস্থান সেটা রাস্তার দিকের। বাইরে একটা গাড়ী থামার আওয়াজ; তারপর অনেকগুলো গলার মিলিত ঐকতান। রতনলাল মুহূর্তে গেলাস রেখে উঠে দাঁড়ায়। খসখস সরিয়ে প্রথমে; তারপর দরজা খুলে বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে দেখবার চেষ্টা করে ব্যাপারটা; কিন্তু রতনলাল কিছুই বুঝে উঠতে পারে না কি হয়েছে; রাস্তায় এত ভীড়ই বা কখন হোলো; এত হাল্লাই বা কিসের?

সদর ষ্ট্রীটের সেই ছোট্ট হোটেলটার সামনে ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে একটা ট্যাক্সি। এবং রতনলাল সেখানে যতক্ষণে পেঁাছেচে তার আগেই জমায়েত হয়েছে রীতিমতো না ছোট না বড় মোটামুটি এক জটলা। মাটিতে দুফোঁটা মধু অথবা এই এট্টুখানি গুড় আর নয় সিকি খাবলা চিনি যদি দৈবাৎ গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে চোখের পলক না ফেলতেই যেমন কোনও অদৃশ্য লোক থেকে দেখা দেয় সারিবদ্ধ পিপড়ের জলুস; তেমনি ট্যাক্সিখানার ভিতরে চোখ পড়তেই সদর ষ্ট্রীট যা এই একটু আগেও নির্জন নদীতীরে পড়ে ছিলো নিঃসঙ্গ কুমীরের মতো রোদে পিঠ দিয়ে সেই নিঃস্ব জনমানবহীন মরুভূমি সদৃশ সদর ষ্ট্রীট কখন যে রূপান্তরিত হলো 'হিট' ছবির টিকিট ঘরের সামনে গাদাগাদি করা ভীড়ের চেহারায় তার কোনও হদিস পাওয়া অসম্ভব। মনে হয় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে রঙ বেরঙের মানুষের একমুঠো উচ্ছ্বসিত ফোয়ারা। বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল রতনলাল; যেতে যেতে

চকিতে ফিরে দাঁড়ালো সে। কলকাতার রাস্তায় যে কোনও অছিলায় এবং কোনও রকম অছিলা ছাড়াই ভীড় জমতে দেরী হয় না; তাই চলে যাচ্ছিলো রতন মুন্সী; কিন্তু পা জড়িয়ে গেল ভীড়ের গুলতি থেকে ঠিকরে পড়া কয়েকটি কথার টুকরোয়; হুমড়ি খেয়ে ফের এসে পড়তে বাধ্য হলো সে জমায়েতের লাভাস্রোত যেখান থেকে নির্গত হচ্ছে সেই ক্রেটারের অন্ধ বিবরে একেবারে।

—মাতোয়ালা!

—মেয়েমানুষ দিনদুপুরে মাতাল হয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে?

—শাড়ী পরা এ্যাংলো মাইরী!

—তোকে বলেছে? মেম না হাতী? পেন্ট করেছে মাগী!

—কালে কালে আরও কত দেখতে হবে!

—ঘোর কলি! ঘোর কলি!

সূর্যের উজ্জ্বল আনন ঢেকে দিলো এক ঝাঁক পিচ্ছিল কাদা।

এরই মধ্যে ট্যাক্সির গহ্বর থেকে টলতে টলতে নির্গত হয় এই সব টক ঝাল মিষ্টি মুখরোচক আলোচনার একমাত্র টার্গেট; একটি শাড়ীপরা শ্বেতাঙ্গিনী মেয়ে। মেয়ে নয়; মহিলা। মহিলাও না। সেও কোনও এককালে ছিলো হয়ত; এখন আর তাও নেই। হঠাৎ দেখলে ভয় লাগে দিনের আলোতেও। মনে হয় রূপকথার পাতা থেকে এক ডাইনী উঠে এসে দাঁড়িয়েছে শান বাঁধানো শহর কলকাতার কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ করে। দিবালোকে অপরূপ দেখাচ্ছে সেই রাক্ষসীকে। বেশবাস ছেঁড়া; বিপর্যস্ত। আবরণের পক্ষে নেহাতই অপর্যাপ্ত। রুক্ষ কেশ। তবু সামনের দিকের হালকা হয়ে আসা মাথার পাতলা চুল এলোমেলো উড়ছে হাওয়ায়। ঢেকে দিচ্ছে চোখ; মুখের ওপর কখনও ভনভন করছে, কখনও এসে বসছে মাছির মতো। চোখের নীচে অন্ধকার বিদিশার নিশা। গোটা মুখখানা হাল আমলের ভেজাল চুনসুরকি দিয়ে কাজ চালানোয় ওস্তাদ কোনও কনট্রাক্টরের কারুকার্য। চোয়াল উঁচু হয়ে উঠে আর চোখ বসে গিয়ে দুগালেই এমন গহ্বরের জন্ম দিয়েছে যে ভালো করে না দেখলে ভয় হয় বুঝি মাংস নেই; বুঝি

গর্ত হয়ে গেছে। গায়ের চামড়া কুঁচকে ফেটে চেহারা নিয়েছে অনেকটা অবন ঠাকুরের দেওয়াল ছবির ; যাকে বিদগ্ধ কলা-সমালোচক অভিহিত করে থাকেন অলিখিত চিত্র বলে অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ মহলে। মুখে যদি প্রসাধনের কোনও প্রয়াসই না থাকেতো একেবারে তাহলে সম্ভবত সে মুখ এত ভয়ঙ্কর দেখাতো না প্রসাধনের অপপ্রয়াসে যেমন ভয়াবহ মনে হচ্ছে তাকে এখন। ঘামের সঙ্গে পেইণ্টের প্রলেপ প্রায় অবলুপ্ত ; অর্ধ-অস্তিত্বের মহিমায় সাদায় কালোয় সাজ্ঘাতিক সেই প্রোফিল। আর এর ওপর যার দিকে তাকানো যায় না কিছুতেই কিন্তু উপায় থাকে না না তাকিয়েও তা হচ্ছে অবিন্যস্ত অপর্যাপ্ত আচ্ছাদনের অকল্যাণ ; রাস্তার ওপর একগাদা অশ্লীল চোখের ওপরেই জ্বলজ্যান্ত সূর্যালোকে কুরুচির দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে উদ্যত ; ভীরু অধঃপতিত পাণ্ডবদের মত অসহায় দুপাঁচজন ভদ্রলোক পথচারী স্থানুর মতো নিরুপায় দাঁড়িয়ে আছে অধোবদনে ; এদৃশ্যের নীরব সাক্ষী-স্বরূপ।

দ্রুততম পদক্ষেপে গাড়ীর কাছ বরাবর হবার আগেই দরজা খুলে টলতে টলতে রাস্তায় পা দিয়েছে মহিলা ; আর অনেকটা দূর থেকে তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেছে রতনলাল মুন্সী। গ্লোরিয়া ? হৃদপিণ্ডের ধ্বক ধ্বক ধ্বনি কি থেমে গেছে মুহূর্তের জন্যে ? মুহূর্তের জন্যেই। সম্বিৎ পুরো ফিরে পাবার আগেই দৌড়েছে রতনলাল পতনোন্মুখী গ্লোরিয়াকে ধরবার জন্যে। কিন্তু ছোঁবার আগেই ছিটকে গেছে গ্লোরিয়া ঃ No! No! Leave me! please! Leave me in peace! বলতে বলতেই পালাবার চেষ্টায় দুপা গিয়েই পড়ে গেছে মহিলা রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে!

সেই বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ ; সেই উচ্ছ্বসিত ঝর্ণার মতো উন্মত্ত কণ্ঠস্বরই কেবল আজও পরিত্যাগ করেনি গ্লোরিয়াকে। দৌড়ে এল রতনলাল ; একটুখানি। রতনকে দৌড়ে আসতে দেখে মহিলা আরেকবার বৃথাই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ; এবং তারপর সম্ভবতঃ আবার দৌড়বার। কোনটাই অবশ্য সম্ভব হলো না ; আবার ধরাশায়ী হলো গ্লোরিয়া ডানাভাঙ্গা পাখার মতো। রতনলাল গিয়ে মাথাটা তুলে

ধরতেই তাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে উঠল সেই মহিলা ; কোনও এক অতি সুদূর অতীতে যার নাম ছিলো গ্লোরিয়া ম্যাকডোনাল্ড্ ; জাতে খাঁটি ব্রিটিশ ; রক্তে আভিজাত্যের পাকা নীল রং ; যার চোখের দিকে তাকালে পুরুষের চোখ থেকে চলে যেত ঘুম অনেক রাত পর্যন্ত। যার হাসিতে আগুন ধরে যেত বরফের গায় একদিন। একদিনই ; এখন নয় আর।

কলকাতার এ অঞ্চলে এমন দৃশ্য একটু বিরলই বটে ; যদিও শহরের বাসিন্দারা যে এর সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু করা হবে না ; তবুও স্থান কাল পাত্রের সঙ্গে গোটা ব্যাপারটা কেমন যেন খাপছাড়া ; সঙ্গতিহীন এবং অসমঞ্জস নিশ্চয়ই। তাহলেও চোখ কপালে তুলে অবলোকন করার মত দৃশ্য যে তাতে আর সন্দেহ কি ? কারণ পরের দুর্দশা যার কাছে চরম উপভোগের বস্তু নয় সে নিশ্চয়ই হতে পারেনি সভ্যতার আলোর এক কণিকা প্রসাদও। যে লোক অপর লোকের বিশেষ করে স্ত্রীলোকের কেলেঙ্কারী দেখলে সব কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে দাঁড়িয়ে না পড়ে সে লোক আর যেখানকারই হোক অধিবাসী ; কলকাতার সে কেউ না। আজই বা সদর স্ট্রীটে ভরদুপুর বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন ? ভীড় জমে উঠলো তাই দেখতে দেখতে খাঁটী দুধের ওপর যেমন জাল দিতে না দিতে পড়ে যায় এই ইয়া মোটা সর। দীর্ঘকাল রক্ত অভুক্ত ছারপোকার চেয়েও কামনা উপবাসী মানুষজন এমন উত্তেজক দৃশ্যের সন্ধান পায়নি অনেকদিন। উপবাসী তাদের মনের অতল অন্ধকারে কালো বিকৃত বাসনার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দুরন্ত সুড়সুড়ির শিহরণ। প্রকাশ্য রাজপথের অপমান শয্যায় একদা সম্ভ্রান্ত এক মহিলাকে গড়াগড়ি যেতে দেখে তুলে ধরবার লজ্জা ঢাকবার দুঃখিত হবার চেতনার সঞ্চার হল না একজনেরও। দাঁতের সব কটি পাটিই শুধু বিনাকা হাসি বিকীর্ণ করেই ক্ষান্ত হলো না ; আকর্ণ বিস্তৃত হয়ে তবে থামলো। দ্রৌপদীর আরেকবার বিবস্ত্র হওয়ার ট্রেলার মূল দৃশ্যের সঙ্গে ফাউ হিসেবে দেখবার জন্যে যারা দাঁড়িয়ে গেল তারা ধুতি

বা ট্রাউজার কিম্বা লুঙ্গি যাই পরুক তারা ম্যাসকুলীন নয়; নিউটার জেণ্ডার আসলে।

কিন্তু সমবেত এই ঐকান্তিক বাসনায় বাদ সাধল যে তার নাম রতনলাল মুন্সী।

মহিলাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে নিয়ে চললো, হোটেলের চত্বরে ঢুকে নিজের ঘরে উঠবার সিঁড়ির দিকে। ভীড়ের মধ্যে দু একজন ছিলো যারা অপেক্ষাকৃত কম আলোকপ্রাপ্ত সভ্যতার; তাদের সাহায্য না পেলে শিখ ড্রাইভারের অনভিপ্রেত বাহুর সবল সহযোগিতা যাচ্ঞা করা ছাড়া উপায় ছিলো কই। বাকী যারা রাস্তার নাটকে চরম দৃশ্যের অপেক্ষা করছিল 'এরপর কি-হয় কি-হয়'-এর রুদ্ধশ্বাস আগ্রহে তারা এই আকস্মিক অনধিকার হস্তক্ষেপে মধ্যপথে যবনিকা পতনের দুর্ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হলো যৎপরোনাস্তি; তাদের মধ্যে দু' চারজন ছিলো যারা চুপ করে গলাধঃকরণ করার পাত্র নয়। এই একান্ত অবাঞ্ছিত রসভঙ্গের নায়ক রতনলালের ওপর তারা মারমুখী হয়ে উঠলো রীতিমতো :

—বা দাদা! বেশ! মদ খেয়েছে বলে মেয়েছেলে নয় বুঝি?

—পুলিশে খবর দিন; আপনার ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

—পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা যে।

চলে যাচ্ছিলো রতনলাল; ফিরে দাঁড়ালো এর নাম গ্লোরিয়া—

খুব চেনা বুঝি? বৃশ্চিক দংশন করতে চায় যেন কে তখনও।

হ্যাঁ, খুব চেনা। গ্লোরিয়া আমার স্ত্রী।

অসংখ্য কোটি ক্যাণ্ডেল পাওয়ার দিনের আলোও ফিউজ হয়ে গেল নাকি সেদিন কলকাতার রাস্তায় হঠাৎ! অন্তত এক দণ্ডের জন্যে। তারপর আবার দ্বিগুণ তেজে দিগন্ত উদ্ভাস জবাকুসুম সঙ্কাস দিবাকর প্রজ্জ্বলিত প্রবর্ধিত হল স্বমহিমায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো ভীড় তার চেয়েও কম সময়ে; কাজের কথা মনে পড়লো দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলো যারা তাদের। হনহন করে ভীড় ঠেলে সটকে পড়ল কে কোথায়; হাল্লার নাম শুনে যেমন ছিটকে পড়ে ফুটপাতের ফেরিওয়ালা।

॥ ২ ॥

নিজের ঘরে এনে শুইয়ে দিলো গ্লোরিয়াকে বিছানায়। ঘরের পর্দা টেনে দিলো মুন্সী দিনের প্রখর তাপকে অস্বীকার করতে। অন্ধকার ঘরে পাখা চালিয়ে দিলো পুরো স্পীডে। ওডিকোলনের ৪৭১১-শিশি পুরো উপুড় করে দিলো গ্লোরিয়ার মাথায়-কপালে। বরফ দিলো চোখের ওপর; চুলে; কপালে; গালে। মুখময় দিলো ঠাণ্ডা জলের ছিটে। সাদা কম্বলে ঢেকে দিল গ্লোরিয়ার আপাদমস্তক। তারপর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেলো ম্যানেজারের ঘরে একতলায় ডাক্তারকে ফোন করতে। ডাক্তার মানে সারদা সেন; রতনলালের বৈদ্য এবং অভিন্নহৃদয় অন্তরঙ্গ। নাহলে সারদা সেনকে ভিজিট দেবার দুঃসাহস নেই রতনের; থাকলেও পকেট নেই আর সেইরকম সচ্ছল। নিজের ঘরের দিকে আসতে আসতেই দূর থেকেই আলো জ্বলতে দেখেই বুক কেঁপে উঠলো রতনের; দৌড়ে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকতেই রতন দেখতে পেলো সর্বনাশ হয়ে গেছে ততক্ষণে; রতন যা আশঙ্কা করছিলো তার ঘর ছেড়ে যাওয়া এবং ফিরে আসার সময়টুকুর মধ্যেই ধ্বসে গেছে সেই পাড়।

গ্লোরিয়া পড়ে আছে মেঝেয়। টেবলের ওপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে মদের বোতল; গেলাসটা চুরচুর হয়ে ছড়িয়ে গেছে মেঝেময়। গ্লোরিয়ার গায়ে হাত দিয়ে দেখল রতন মুন্সী; অসম্ভব হিমশীতল আর ঘামের বাঁধভাঙ্গা বন্যায় ভেসে গেছে জামা কাপড়। মদের গন্ধে মাতাল ঘরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে রতন মুন্সীর জীবনে যে জিনিষ কেউ দেখেনি, তার চোখে আজও তা দেখবার জন্যে, ভগবান রক্ষে, কেউ নেই; যে একজন আছে তার চোখ খোলা থাকলেও দেখবার ক্ষমতা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। রতন মুন্সীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল গালের ওপর; সারদা সেনকে ঢুকতে দেখেও সে জল জামার

হাতা দিয়ে মুছলো না সে। সারদা সেন বিছানার কাছে এসেই থেমে চমকে দাঁড়িয়ে গেলেন; তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুট উচ্চারিত হলো: গ্লোরিয়া ?

রতনলাল মুন্সীর কানে গেল কিনা সেকথা বোঝা গেল না। বজ্রাহত ব্যক্তি যেমন খাড়া দাড়িয়ে থাকে, তেমন দাঁড়িয়ে আছে রতন; কোনও রকম প্রাণের স্পন্দন আছে কিনা বোঝা যায় না। সারদা সেন হাতে তুলে নিলো গ্লোরিয়ার কব্জি। আষাঢ়ের জলভরা কালো মেঘের মতো থমথম করতে লাগল শহরের শ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরীর ব্যক্তিত্ব বিচিত্র সুগৌর আনন।

রতন মুন্সীর মুখে তার প্রতিক্রিয়া হলো না পরিস্ফুট; সে ফিরে গেছে তিরিশ বছর আগের জীবনে যখন তার বয়স তিরিশ হয়নি; গ্লোরিয়ার সঙ্গে দেখা হয়নি তখনও; গ্লোরিয়া তখনও মুন্সী হয়নি। তখনও তার অবিবাহিত নাম ছিলো গ্লোরিয়া ম্যাকডোনাল্ড। রবার্টসন এণ্ড রবার্টসন কোম্পানির বড় সাহেবের দেহে সাজ্ঘাতিক জরুরী এবং অসম্ভব জটিল অপারেশন করবার জন্যে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার থেকে উড়ে এসেছিলেন লণ্ডনের তদানীন্তন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শল্য চিকিৎসক স্যার অলিভার ম্যাকডোনাল্ড্; তারই সঙ্গে এসেছিলো তার মেয়ে গ্লোরিয়া ম্যাকডোনাল্ড। গ্লোরিয়া ম্যাকডোনাল্ডের দুধে আলতায় গোলাপী অঙ্গে অঙ্গে সেদিন কে যেন বাঁশী বাজাতো রাত্রিদিন।

স্যর অলিভার ম্যাকডোনাল্ড্ লণ্ডন থেকে কলকাতায় উড়ে এলেন কিন্তু টিঁকতে পারলেন না গরমে। রবার্টসন এণ্ড রবার্টসনের বড় সাহেবের শরীরে ছুরি বসিয়েই উড়ে গেলেন দার্জিলিং-এ। কথা ছিলো অপারেশনের পর সাত দিন আরও থাকবেন যদি দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। দার্জিলিংএ তখন গ্রীষ্ম উদযাপন করতে গেছে রতন-লাল মুন্সীও। ঘোড়ায় করে পাহাড়ী পথ দিয়ে নামছিলো গ্লোরিয়া ম্যাকডোনালড্; ঘোড়াটা কি কারণে কে জানে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য হয়ে দৌড়তে লাগলো বেলাগাম হয়ে। রতনলাল দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো মুহূর্তের জন্যে; ঘোড়ার পিঠে ভয়ে উত্তেজনায়

অপরূপ সেই মেয়ের চোখে কি জাদু ছিল রতন জানে, ঘোড়া যে আর একটু বাদেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে সেই লাবণ্যময়ীকে কোনও তোয়াক্কা করবে না তার তুলনাহীন বিউটির একথা যখন রতনের চেতনায় এলো তখন আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র। সামনে সমস্ত পৃথিবী তখন অন্ধকারে একাকার হয়ে আসছে ; মাথার লক্ষ মাইল ওপরের নীল আকাশ আর পায়ের তলায় শক্ত মাটি দুই-ই সরে গেছে কখন! মৃত্যুর কণ্ঠস্বর হয়রাজের হ্রেষার মাইকে গর্জন করছে কানের কাছে। সমস্ত অস্তিত্বর বিলুপ্তি আসন্ন সমাপ্তিসঙ্গীত বেজে উঠছে ; দারুন এক ঝাঁকুনি খেতেই ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো গ্লোরিয়া ; কিন্তু মাটিতে নয়। মাটি থেকে একটু উঁচুতে কোমরটা জড়িয়ে গেছে সবল বাহুতে কার আর সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গেছে দুরন্ত হয়রাজ ; যত বেলাগাম আর উন্মত্তই হোক কার সঙ্গে চালাকী চলে না রীতিমত জানে তা ওয়েলার।

জ্ঞান ফিরে আসতে যার বাহুলগ্ন হয়েছিলা তাকে দেখলো গ্লোরিয়া দুচোখ বড় বড় করে। ছফিট দুইঞ্চি ; বুকের ছাতি বিয়াল্লিশ; চোখ দুটোয় দামাল শিশুর দুরন্ত কৌতুক উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়তে চাইছে যেন এইমাত্র! জীবনপাত্র থেকে উচ্ছলিত মাধুরীর সেই দুচোখে দুরন্ত যৌবনতৃষ্ণা! যাদুর দেশ ভারতবর্ষ ; কি যাদু অঞ্জন মাখনো দুচোখে কে জানে ; ডুবে যেতে ইচ্ছে করে গ্লোরিয়ার।

স্যার অলিভার ম্যাকডোনাল্ড্ কম কথার লোক ; কাজের মানুষ। রতনলালকে সময় না দিয়েই বলেন : You saved the most precious life young man ; in fact more precious than Oliver Macdonald's knife ever did. I dont know how to repay. If you want anything, simply name it my boy—

রতনলাল মুন্সী সোজা অলিভারের বুলডগ ব্রিটিশ মুখে বসানো চীনে চোখের দিকে তাকিয়ে বললো : I want the hand of your daughter, Sir !

What ?

It is simple. I want to marry Gloria. Do you get it ?

Do you know the price of the gown she wears ?

I do. She should look lovlier in a simpler one.

Look at the cheek of this young Indian—Gloria—

She needn't. By now she knows that she was born with a silver spoon in her mouth while this young Indian with a silver tongue in his cheek.

স্যার অলিভার ম্যাকডোনাল্‌ড্‌ দার্জিলিংএর ঠাণ্ডায় ঘেমে নেয়ে উঠলেন দারুণ শীতের দেশের লোক বলে নয়; একজন ভারতীয়র আস্পর্ধায়। কিন্তু স্যার অলিভার বেনের জাত; রাগলেই হার এজ্ঞান তাঁর এখনও বিলুপ্ত হয়নি। তিনি যতদূর সম্ভব গলা নামিয়ে এনে বললেন: I can't say yes or no just now. I have to think it all over. আরও এক ধাপ নেমে গিয়ে গলার সিঁড়ি দিয়ে রতনলাল হাসল: Take your time sir, It's a deal—

হাত বাড়িয়ে দিলো রতন; একটুখানি সময় নিয়ে স্যর অলিভার ম্যাকডোনাল্‌ড্‌ শেষ পর্যন্ত কি ভেবে বাড়িয়ে দেওয়া সেই এক কালা আদমীর কর মর্দন করলেন খানিকটা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে খানিকটা না করলে যদি আরও এমন কিছু শুনতে হয় যা লণ্ডনের এক নম্বর সার্জেন ডিউক্ ডাচেসের বাড়ীতেও শুনতে প্রস্তুত নন। কথা রইলো, আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে রতনলাল মুন্সী আবার আসবে ম্যাকডোনাল্ডের হোটেলে তাঁর দরজায়; ভেতরে প্রবেশ করা না করা নির্ভর করবে স্যার ম্যাকডোনাল্ডের মুখের একটি কথায়: yes or no !

আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে হোটেলের দরজা থেকে ফিরে যেতে দেখা গেলো সেই কালা আদমীকে। মুখ নিচু করে নয় কিন্তু; বুক চিতিয়ে চলেছে সেই ছফিট ছুইঞ্চি মাথা এত উঁচুতে রেখে যে ভয় করে তারার আলো থেকে তার চুলে এই বুঝি আগুন ধরে যায়। ঠোঁঠের কোনে বিচিত্র হাসি; স্যার অলিভার ম্যাকডোনাল্‌ড্‌ আটচল্লিশ ঘণ্টা আর ভারতবর্ষের মাটিতে থাকা নিরাপদ মনে করেননি। রতন যেদিন এসে-ছিল সেই দিনই শেষ রাতে পাড়ি জমিয়েছেন দেশে অত্যন্ত জরুরী

ব্যবস্থায় হাওয়াই জাহাজে করে। রতনের জন্যে রেখে গেছেন একটা ছোট কার্ড; তাতে সুন্দর হস্তাক্ষরে জ্বলজ্বল করছে:

Couldn't decide. meet me at the following address.

লণ্ডন থেকে দূরে ইংল্যাণ্ডের একটা গ্রামের ঠিকানা; স্যার ম্যাকডোনাল্ডের কান্ট্রিহাউস; গ্লোরিয়ার মরা মায়ের নামে তার নাম; Lily's Little cottage। রতন মুন্সী কার্ডখানা হাতে করে মুষড়ে পড়লে সে অন্য কেউ হতো; অথবা তার বাবা তাহলে হতো না সখারাম মুন্সী। সেই মুহূর্তেই ডিসিসন নিলো রতন; স্যার ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে তাহলে তার সুইট হোমেই দেখা হবে এর পর। মুখ দিয়ে রতনের অজান্তেই উচ্চারিত হলো যা সে উদ্বিগ্ন হলে, চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে অথবা যে বিপদে যে কেউ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় সেই বিপদে পড়লে বেরোয়; তার সেই বিখ্যাত স্বগতোক্তি: very good!

এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিবার তা very goodই হয়ে দাঁড়ায় দেখেছে সে; এবারেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? বাবার কাছে বিলেত যাবার কথা পাড়াই ছিলো: যাবার সময় এসেছে এতদিনে।

॥ ৩ ॥

রতন মুন্সীর যে ছবি এতক্ষণ আঁকলাম তা বিশ্বাস করা শক্ত; কিন্তু সখারাম মুন্সীর ছেলে বলে তাকে জানতে পারলে সেই কলকাতায় আবার রতন মুন্সীর কাণ্ডকারখানা অবিশ্বাস করা ইকোয়্যালি অসম্ভব। তিরিশ বছর কি তারও আগের কলকাতার লিভিং লিজেণ্ড হলেন সখারাম। রতনের ছফিট তুইঞ্চির দিকে তাকিয়ে অল্পক্ষণ কথা বলতেই ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যেত লোকের। সাড়ে ছফিট, ষাট বছর পার করবার পরও শিড়দাঁড়া সোজা সখারামের সবচেয়ে মোক্ষম পরিহাসের পাত্র ছিলো পুত্র রতন; দেখলেই বলতেন: সিংহের বাসায় তুই বেটা শেয়াল এলি কি করে? জায়ান্টদের বংশে তুই একটা লিলিপুট,—

বেটাচ্ছেলে এ বংশের কলঙ্ক। সখারাম ছিলেন হিউম্যান স্কাইস্ক্র্যাপার ; হাঁটাফেরা চলা খাওয়া সব রাজকীয় ; মধ্যাহ্ন ভোজনে বসে দুমানুষ সমান খাবার পেটে দেবার পর একঝুড়ি ল্যাংড়া আম খেতেন যখন তখন ; না। ভুল বল্লাম ; যখন তখন নয়। যখন আমের সিজন নয় তখনই কেবল খাওয়ার প্রবল বাসনা জাগতো সখারামের। সে যুগের সব চেয়ে বড় সওদাগর ছিলেন তিনি। ফুলের সওদাগর ছিলেন সখারাম ; কিন্তু অনুরাগী ছিলেন তিনি বিউটিফুলের। সখারামের পূর্বপুরুষরা অতিসুদূর অতীতে বাঙলা দেশের অধিবাসী ছিলেন না ; সখারামের চরিত্রে বাঙালী রুচি আর অবাঙালী কর্মশক্তির সোনায় সোহাগা যোগ হয়েছিলো। বাইশ বছর বয়সে ফুলের প্রথম দোকান দেন কলকাতায় সখারাম ; পাকা আপেলের মতো টসটসে গালের নীচে চিবুকজোড়া ফ্রেঞ্চ কাট দাঁড়ি ধবধবে সাদা ফিনফিনে আদ্দির তলায় লোমষ গোলাপী বুকের আম্বেলা মহেন্দ্র দত্তর সব চেয়ে বড় ছাতি সম্পূর্ণ খুলে ফেল্লে যত বড় হয় তার সঙ্গে প্রায় সমান পাল্লা দেয়। গোঁফের দুপ্রান্তে বসরাই গোলাপের নির্যাস ভুরভুর করে ভরা ফাগুনের উদাস করা সন্ধ্যেয়। মধ্যরাতের জাহাজের বহুদূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসা বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠ আবৃত্তি করে সখারাম মুন্সীর :

'হালাত বদলনেওয়ালে হ্যাঁ ;
লামহাত বদলনেওয়ালা হ্যাঁ ;
ইস ওয়াক্ত বদলনেওয়ালে হ্যাঁ
ইস্ রাত ঘাবড়া কর্ ইনস্য
ইয়ে রাত বদলনেওয়ালী হ্যাঁ !'

সখারাম ফ্লাওয়ার স্টলের আলো নিভিয়ে দিয়ে দোকানে তালা দেবে সখারামের কর্মচারীরা ; সখারাম বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন, চাবির গোছা হাতে করে নিজের হাতে সব তালাগুলো একবার টেনে দেখবেন বন্ধ হয়েছে কি না ঠিক মতো, তারই অপেক্ষায় একদিন। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝলমল করে উঠলো ফুলের দোকান ; সোনার বাটের উপর সূর্যের আলো এসে পড়লে যেমন ঝলমল করে ওঠে তেমনই আলোয় উৎলে উঠল

অন্ধকার। মস্ত বড় কালো গাড়ী থেকে নেমে এল রক্তগোলাপ ; সায়াহ্নের সূর্য যেমন মেঘে মেঘে মাখিয়ে দেয় মুঠো মুঠো রক্তিম ফাগের পাওডার তেমনই একরাশ জ্যোৎস্না আলো করে দিলো দোকানের অন্ধকার। সখারাম ফ্লাওয়ার স্টলে আর কত বাতিই বা ছিলো ; হাজার বাতির রোশনায় আগুন ধরে গেল ফুলের গায়। সখারামের সামনে এসে যে দাঁড়ালো সে যদি ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে সেদিন ফস করে বলে বসত আরব্য উপন্যাসের এক হাজার রাতের একটি পাতা থেকে সে উঠে আসছে তাহলে দক্ষিণ সমীরণে বেল চামেলী কামিনী গোলাপের গন্ধে ব্যাকুল বসন্তে রজনী যখন উতলা হয়েছে সবে তখন তা অবিশ্বাস করা শক্ত হতো। কিন্তু কালো গাড়ী থেকে নেমে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে সেদিন সে তার নাম বলেছিলো ইন্দ্রাণী, যাকে রাজেন্দ্রাণী নাম হলে মানাতো, সে তার পরিচয় দিয়েছিলো এমন একটি ঘরের মেয়ে বলে যাদের ঠিকানার দরকার হয় না আজও বাংলা দেশের কোথাও ; উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের যারা মূলে তাঁদেরই একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির নাতনী।

সখারামকে গাড়ী থেকে নেমে অাক্সফোর্ড একসেণ্টে বিশুদ্ধ ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করল সেই বিদুষী সে সখারাম মুন্সীর সঙ্গে কথা বলছে কি না; সখারাম স্বীকার করলে হাতটা বাড়িয়ে দিলো রক্তকমল। না ; কোমল করপল্লব নয়। অনেকক্ষণ ধরে ঝনঝন করছিলো সখারামের শক্ত হাত শেকহ্যাণ্ড করার পর ; অবশ্য তার চেয়ে অনেক অনেকক্ষণ ধরে সখারামের নীল শিরার নদীতে ছলাৎ ছলাৎ করেছিলো যতো রক্তের জোয়ার। ইন্দ্রাণী এসেছে সখারামকে রাঁচী নিয়ে যেতে তাদের নতুন বাড়ীতে ফুলবাগান বসাবার কাজে। সখারাম মুন্সী ছাড়া বাঙলা দেশে আর কাউকে তার মনে ধরেনি সেদিন যে তার মনের মত করে মর্ত্তের মাটীতে রচনা করতে পারে নন্দনকানন। সখারাম তার দশ বছরের ফুলের বেশাতিতে অনেকরম অর্ডার পেয়েছে এযাবৎ ; কিন্তু নন্দনকানন রচনার ভার তার ওপর এই প্রথম। সখারাম মুন্সী বললে, সে রাজি আছে রাঁচী যেতে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে। রাজি না হলেও সখারামকে

রাঁচী যেতে হত যে পাগল হয়ে শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রাণী চলে যাবার পর সেকথাই কেবল মনে হয়েছে বারবার।

রাঁচীর সেই নতুন বাড়ী ইন্দ্রাণীর নিজের নামে করে দিয়েছেন তাঁর ব্যারিষ্টার বাবা ইন্দ্রাণীর জীবদ্দশাতেই : ইন্দ্রাণী কুটীর। মা-মরা ইন্দ্রাণীকে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন ইন্দ্রাণীর বাবা ইন্দ্রনীল রায়। ইন্দ্রাণী চাইলে আর সালটা উনিশ শো চৌত্রিশ পয়ত্রিশ না হয়ে দু হাজার সাল পার হলে হয়ত চাঁদও পেড়ে এনে দিতেন ধনকুবের ইন্দ্রনীল। চাঁদ পেড়ে দেওয়া ছাড়া আর প্রায় সব না চাইতেই অবশ্য দুহাত ভরে দিয়েছিলেন মেয়েকে। ছোটবেলা থেকে বিলেতে পড়িয়ে পাশ করিয়ে এনেছিলেন। ঘোড়ায় চড়া, মোটর চালানো, বন্দুক চালানো, সাঁতার কাটা, টেনিস খেলা, পিয়ানো বাজানো, বল ডান্স কোনও সাধ অপূর্ণ রাখেননি তিনি। সুযোগের এতটুকু অপব্যবহার করেনি কোনওদিন ইন্দ্রাণীও অবশ্যই।

রাঁচীর রাস্তায় যেতে যেতেই ইন্দ্রাণী তার যথেষ্ট পরিচয় দিলো। রাস্তায় পেছন দিক থেকে আসছিলো একখানা গাড়ী হর্ণ দিতে দিতে। সাদাচামড়া ছিলো ড্রাইভারের সিটে। নিজের গাড়ীটা চট করে থামিয়ে নেমে গেল ইন্দ্রাণী ; সাহেবের গাড়ী ব্রেক কষে দারুণ ঝাকুনি দিয়ে থেমে গেছে তখন ; ইন্দ্রাণী তার গাড়ীর বনেট খুলে হর্ণের তারটা ছিড়ে দিয়ে বনেট বন্ধ করে পরিস্কার বাংলায় বললো : শিং ভেঙ্গে দিলাম। অপ্রস্তুত সাহেব বাঙলা বুঝলো না তবে হর্ণ দিতে গিয়ে দেখল ফোঁকবার শিঙা নেই ; তখন বাকী রাস্তা ইন্দ্রাণীর গাড়ীর পেছন পেছন চলতে লাগলো বরাবর ; বেড়াতে বেরিয়ে শিক্ষিত সদ্বংশজাত কুকুর যেমন ফলো করে তার প্রভুকে।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে ইন্দ্রাণী সম্পর্কে এই অল্পক্ষণের মধ্যে সখারামের আরেকটি নতুন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো। ইন্দ্রাণার ইংরিজি ইংরেজের মতো ; কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে কথা বলতে হলে ইংরিজিতে বলে না একটি অক্ষরও ভুলেও ; এবং ইন্দ্রাণী বাংলাও বলে চমৎকার।

কিন্তু রাঁচী পৌঁছে তবেই সখারাম আসল ইন্দ্রাণীর পরিচয় পেল। সারা রাঁচী শহরের দ্রষ্টব্যস্থল ইন্দ্রাণীর বাড়ী। নিজের হাতে তাকে এমন করে সাজিয়েছে সে যে সখারামের ফুল সে বাড়ীর পক্ষে বাহুল্য মাত্র। .ফুল যে কখনও সৌন্দর্যের লাঘব করতে পারে একথা স্বর্গেও সখারাম স্বীকার করতেন না; ফুলের চেয়ে অনেক বিউটিফুল সেই বাড়ীতে ভারী অসহায় বোধ করেছিলেন সখারাম জীবনে সেই একবার। ইন্দ্রানীর বাবা ইন্দ্রনীলের ছুই মেয়ে; বড়র নাম মোহিনী। ইন্দ্রাণীর পাশে বড় নিষ্প্রভ; গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম নয়; রীতিমতো কালো। শুধু গাঁয়ের লোক নয় ইন্দ্রনীল স্বয়ং তাকে আদর করে বলতেন আমার কালো মেয়ে। ইন্দ্রাণীর ব্যক্তিত্বের সমারোহ উজ্জ্বলতর করে তোলবার জন্যেই যেন লঘুপদ সঞ্চারিনী মোহিনীর আবির্ভাব এই সংসারে। ইন্দ্রাণী দলমলে ঝলমলে; মোহিনী শীতের নদীর মত শান্ত; ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। ইন্দ্রাণী এই বন্দুক নিয়েছে; বন্দুক ফেলেই তুলে নিয়েছে টেনিসের র্যাকেট। র্যাকেট ছেড়ে এসেই বসেছে পিয়ানোর সামনে; পিয়ানো শেষ হয়ে গেছে ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের ডান্স ডিনারে। মোহিণী ভোরের সূর্য এসে পৌঁছবার আগে পৃথিবীর দরজায় চা এনেছে ইন্দ্রনীলের শয্যাপার্শ্বে; বেলা হবার আগেই স্নান করে নিয়েছে কোন্ সকালে; তারপরে ঠাকুর ঘরে বসেছে মালা গাঁথতে। মালা গাঁথায় সমাপ্ত হলে পূজা দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়েছে ইন্দ্রনীলকে; ইন্দ্রানীকে। ছুপুর বেলা বসেছে সেলাই নিয়ে; সন্ধ্যে বেলায় সেতার। ইন্দ্রাণী রক্তগোলাপ,—আগুন ধরিয়ে দেয় বাতাসে। মোহিনী একফালি রজনীগন্ধা,—অন্ধকার সুবাসে ভরে দেয় রাত্রের হৃদয়; ইন্দ্রাণী হচ্ছে—সকালবেলার সূর্যালোকে উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা; সন্ধ্যেবেলার সিন্ধুপারে প্রথম দেখা দেওয়া তারার নাম মোহিনী। তটের বুকে ভেঙ্গে পড়া তরঙ্গের গর্জন হচ্ছে ইন্দ্রাণী; মোহিনী মাঝ সমুদ্রের গভীর নিস্তব্ধতায় অতল জলের আহ্বান।

ইন্দ্রানীর সঙ্গে রাঁচীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন যখন সখারাম শীতের ছুটি উপভোগ করছেন তখন ইন্দ্রনীল সেখানে।

বাড়ীতে যত চাকরবাকর তার চেয়ে অনেক বেশী হচ্ছে ইন্দ্রনীলের স্যুটারের সংখ্যা। কিন্তু তারা সবাই নভো তারা,—সখারাম তাদের মধ্যে উদয় হলেন হাজার তারার মধ্যে একা তমোহন্তী পূর্ণচন্দ্রের মতো দিগন্ত উদ্ভাসিত করে আলোর বন্যায়। প্রমাদ গুনলো সবাই ; আশ্বস্ত হলেন কেবল ইন্দ্রনীল। সবাই বুঝল ইন্দ্রাণীর বাগানে কাজ করতে এসেছে যে নতুন মালী সেই শেষ পর্যন্ত হবে ইন্দ্রাণীর হৃদয়-মালঞ্চের মালাকর। ইন্দ্রনীলও খবর করতে লাগলেন সখারাম সম্পর্কে ; খুব বেশী খবরের প্রয়োজন ছিলনা অবশ্য কারণ সখারাম ফ্লাওয়ার স্টলের ফুলেব সৌরভ তখন বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে কয়েক বছর আগেই। আর ইন্দ্রনীলের চোখে সখারামের চেহারা স্বাস্থ্য এবং প্রাণবন্ততা কেবল তাঁর মেয়ের জন্যেই যেন মেড টু ওর্ডার বলে মনে হয়েছে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন ছুটি শেষ হবার আগেই এনগেজমেণ্ট ঘোষণা করবার উপযুক্ত সময় এবং সখারামের কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনার আহ্বান মুহূর্তেব জন্যে।

ইন্দ্রাণী আবও ঝক্‌মক্‌ করছে। সখারামকে আনবার আগেই ফুলের ব্যাপারে এত পড়াশুনো করেছে যে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সখারামের পক্ষেও হোঁচট খেতে হচ্ছে মাঝে মাঝেই জটিলতাব চৌকাঠে ঠোক্কর লেগে লেগে। ইন্দ্রাণীব সখারা ইন্দ্রাণীকে আড়ালে কখনও প্রকাশ্যেই ঠাট্টা করছে এই বলে যে ফুল লাগিয়ে কি কাজ হবে আর। এ বাড়ীতে সবচেয়ে তাজা সবচেয়ে সুন্দর ফুলটিই যখন উপড়ে নিয়ে যাবার মানুষ নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে হাজির হয়েছে ইন্দ্রাণী। তারপর একসময়ে তারাও চুপ করে গেছে যখন দেখেছে সখারাম সমানে টক্কর দেয় বটে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কিন্তু সেই আসল কথাটা কিছুতেই পাড়ে না ইন্দ্রনীলের কাছে। অন্য কোথাও অলরেডি গচ্ছিত রেখে এসেছে না কি সখারাম তার হৃদয়। যদি বা রেখেই এসে থাকে' তাব চেয়েও দুর্মূল্য আধার যদি মেলে সে রত্ন রাখবার তাহলে কে মনে রাখে সেই পুরাতন কৌটকে আর ?

অবশেষে শীতের বেলা পড়ে এলো ; ফুরিয়ে এলো ছুটি ইন্দ্রনীল

রায়ের। ফুলের পালা সাঙ্গ হলো সখাবামের ; আব ইন্দ্রাণীবও। সখারাম এলো ইন্দ্রনীলের কাছে। তুজনে মুখোমুখী ; চা দিয়ে গেল একটু বাদেই মোহিনী। সখাবাম বললেনঃ একটা কথা ছিল বলবাব—; ইন্দ্রনীল তুচোখ ভরে হাসলেনঃ নির্ভয়ে বলো। সখাবাম ভয় কি বস্তু জানেন বলে মনে হয়নি কোনও দিন সখাবামের নিজেরও যেমন; সখারামের সঙ্গে একঘণ্টাব সঙ্গ কবেছে যাবা তাদেরও তেমনই, ইন্দ্রনীলও জানতেন নির্ভয়ে ছাড়া ভয়ে কোনও কথা বলবাব পাত্র নন সখারাম তবু রীতি অনুযায়ীই বলে ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই সুনিশ্চিত প্রার্থনাব, এবং পব মুহূর্তেই এলো সেই বহুপ্রতীক্ষিত আহ্বানঃ আমি বিবাহ কববাব জন্যে প্রস্তুত হয়েছি।

ইন্দ্রনীল বললেনঃ জানতাম, এবং তোমাব দিক থেকে ফর্মাল প্রস্তাবেব অপেক্ষাটুকুই কবছিলাম বলতে এখন আব লজ্জাব নেই; তবে ইন্দ্রাণীব আব তোমাব, চার হাত এক কববাব আগে আমার আবও একটি কর্তব্য আছে। —সেটা খুলে বলিঃ সবাই জানে মোহিনী আমাব মেযে, মোহিনীও তাই জানে। মোহিনী আমার নয়; আমাব দাদাব কন্যা। মাবা যাবাব সময দাদা কেবল একটি অনুরোধই কবেছিলেন; মেয়েটিব জন্যে যেন আমি সুযোগ্য পাত্র নির্বাচন কবে নিজেব হাতে তাকে তুলে দিই। দাদাকে আমি কথা দিয়েছিলাম ইন্দ্রাণীব বিয়ে দেব আমি মোহিনীব বিয়ে দেবার পব তাব আগে নয়। সে কথা আমাকে বাখতেই হবে; মোহিনীব বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা কবতে হবে তুজনকেই তোমাদের—

তুজনকে নয; সখাবাম খুব আস্তে আস্তে বলেনঃ অপেক্ষা করতে হবে একজনকে।

একজনকে কেন?—বিস্মিত না হয়ে পারেন না ইন্দ্রনীল রায়।

কাবণ, আমি যাকে বিবাহ কবব বলে স্থিব কবেছি সেই মেয়েটির নাম ইন্দ্রাণী নয়, তাব নাম মোহিনী।

॥ ৪ ॥

সেই সখারাম মুন্সীব কাছে তাব ছফুট দুইঞ্চি লিলিপুট ছেলে যখন বিলেত যাবে বলে এসে দাঁড়ালো তখন অনেককাল হলো একটিব পর একটি সাদা চুলের পায়ে ভব কবে জীবনের অপরাহ্ণ কখন সায়াহ্নে গডিয়ে গেছে মনে না কবিয়ে দিলে সখাবাম তা টের পান না একটুও। চোখে এখনও বালকেব বিস্ময়; মনে এখনও গোলাপ ফুলেব সুবাস; কথায় এখনও মুহূর্তে মুহূর্তে কৌতুকেব ফুলঝুবি ফুলকি কাটছে তো কাটছেই। তবু অস্বীকার কববার উপায় নেই যে জীবনে এখন চৈত্রমাসেব ঝবাপাতাব পালা চলছে; বিশ্বপ্রকৃতিতে চৈত্রেব পর আবাব নোতুন করে ফুল ফোটাবার পালা আসে; কিন্তু গাছেব আয়ুব চেয়ে মানুষেব পবমায়ু যে কত কম মানুষেব মাথার দিকে তাকালেই তা বোঝা যায, তার জন্যে আপাদমস্তক লক্ষ্য করবার দবকাব হয় না মোটেই। সখাবাম মুন্সীব মনেব জমি সবুজ কিন্তু মাথা হয়ে এসেছে কেশবিবল।

বতনলালকে দেখেই চেগে ওঠেন তিনিঃ তা যাওনা বিলেত, বাগ্ড়া দিচ্ছে কে?

রতনলাল হচ্ছে সিপাইকা ঘোড়া; তাতাতে পাবলে বাপকে আর কিছু চায় না জগৎসংসাবেঃ না, তাই বলতে এসেছিলাম—

কোনও কথা আজকেব দিনে আবাব বাপকে বলে নাকি?

সে পাঠশালায় আপনাব ছেলে পড়েনি, ওটি পাবেন না আমার কাছে; প্রত্যেকটি কথা বাবাকে বলব তবে—

তবে বাবা যেটি হ্যাঁ বলবে সেটিকে না এবং বাবা যেটি না বলবে সেটিকে হ্যাঁ কবার পাঠশালায় পড়েছ তুমি,—আমি ভুলে গিয়েছিলাম; তা বেশ,—যাও, কিন্তু কি শিখতে বিলেতে যাচ্ছ?—দিশি মুরগীর বিলিতি বোল?

আজ্ঞে না; ফিলম—?

বাঃ বাঃ! বাপ শিখেছিলো ফুল তুলতে; এদেশেই শেখা গিয়েছিলো; তুমি যাচ্ছ ফিল্‌ম্ তুলতে; এদেশে সম্ভব হল না বুঝি?

আজ্ঞে না—

মালীর ছেলে বনমালি একে কি বলে জানো?

জানি, আপনার ভাষায় একে বলে: মাথায় চুল নেই বগলে বাবরি!

জিতা রহো বেটা! বহোৎ আচ্ছা। শোভনাল্লা।

বাপের সঙ্গে ব্যাটাব, সখারামের সঙ্গে এমন কোনও বিষয় ছিল না, সেক্স থেকে সেক্সপীয়াব পর্যন্ত, যা ছিলো আলোচনার অযোগ্য। এদেশে পিতা-পুত্রের এমন বন্ধুত্ব তুর্লভ আজও এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সত্ত্বেও সম্ভবত অবিশ্বাস্য। কিন্তু সখাবাম ছেলেকে একটি শিক্ষাই দিয়েছিলেন। লেখাপড়া না শিখতে ইচ্ছে হয় শিখো না; লেখাপড়া না শিখেও লোকে মানুষ হয় আবার লেখাপড়া শিখেও হয় অমানুষ। বিবাহ না করতে চাও কোব না; বিবাহ না কবেও লোকে চরিত্রবান হয়; একাধিক বিবাহের পরও আবার লোক অনায়াসে হয় তুশ্চরিত্র। কিন্তু মা-বাপকে বলা যায় না কোবনা এমন কোন কাজ কখনও। রতনলাল মুন্সী সখাবাম মুন্সীর পুত্র ছিলো না শুধু; সখারাম মুন্সী ছিলেন না রতনলাল মুন্সীব পিতা মাত্র। তুজনে তুজনের সখা; রতনে বতন চিনেছিলো; তুজন মুন্সীর মধ্যে কাব মুন্সীয়ানার প্রকাশ এতে বেশী তা বলা শক্ত হতো নিতান্ত আপনজনেরও।

একটু থেমে সখাবাম বললেন: তুমি তো বিলাত যাচ্ছ কেবল ফিল্‌ম্ তুলতে নয় বাবা—

রতনলাল: তবে?

তুমি গ্লোরিয়াকে বিবাহের চেষ্টায় বিলেত চলেছ—

কি করে জানলেন?

এইটা পড়লে তুমিও সব জানতে পাবতে—

সখারাম মুন্সীকে সব খুলে চিঠি দিয়েছিলেন স্যাব ম্যাকডোনাল্‌ড্।

সখারাম: ডালিয়াকে তাহলে তুমি বিয়ে করছ না?

রতনলাল : আমি তো বলছি আমার বিয়ের ব্যাপারে দিশি চলবে না—

সখা : তোমার বাপের দিব্যি চললো; তোমার ঠাকুর্দার আরও ভালো চলল; আর তোমার বেলাতেই চলল না কেন শুনতে পাই?

রতন : আপনাদের টাইম এখন পালটে গেছে যে—

সখা : কিছু পালটায় নি টাইম; চব্বিশঘণ্টার আধ সেকেণ্ড আগে দিন কাবার হয় না আজও! তখন ঘোড়ায় টানা ট্রাম ছিল। এখন মানুষে টানা রিক্সা এসেছে; তখনও দশ মাসে ছেলে হতো; এখনও তাই হয় শুনেছি; তখন জাহাজে লোকে বিদেশে যেত এখন উড়ো জাহাজে যায়! পৃথিবীটা কার জিজ্ঞেস করলে তখনও যেমন এখনও তেমনই উত্তর পাবে ওই প্রশ্নর মধ্যেই; পৃথিবী টাকার—

বতন : আমার একটু স্মার্ট মেয়ে পছন্দ—

সখা : ওই ওভাবস্মার্ট মেয়েই তোমার কাল হবে রতন; দিশি সব জিনিষকে গাল পাড়ো সইবো; কিন্তু এদেশের মেয়েদের সমালোচনা কোর না,- ধর্মে সইবে না। আমাদের ঘরের মেয়েরা না থাকলে ঘর ভেসে যেত কবে! বিবাহেব বেলায় ওরা বিশ্বাস করে তালাকে; আমবা Luckএ; আমরা বউ আনি বুড়ো বয়সে বাপ মাকে দেখবে বলে; ওরা বিয়ে কবে বুড়ো বয়সে বাপ-মাকে দেখতে না হয় বলে! ওরা বউকে আরম্ভে ডার্লিং বলে; তাবপর বলে ন্যাগিং; আমবা সুরুতে বলি ওগো; পরে ডাকি রতনেব মা শুনছো বলে; আমাদের স্ত্রী কিছুদিন পরেই সন্তানের জননী হয়; ওদের সন্তানের জননী কিছুদিন পর অপরের স্ত্রী হয় অক্লেশে!

দীর্ঘ বক্তৃতার পর বৃদ্ধ সখারাম হাঁপাতে থাকেন।

বতন মাথা নীচু করে বলে : আপনি এখনই অত উতলা হচ্ছেন কেন? ম্যাকডোনাল্‌ড্‌ রাজি হবেন না-

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন সখারাম মুন্সী : না হলেও রক্ষে নেই; ম্যাকডোনাল্‌ড্‌ গররাজি হলে কি হবে তুমি যে পাত না পাড়তেই রাজি হয়ে বসে আছ—

তিরিশ বছর বাদে গ্লোরিয়া মুন্সী একদিন রাস্তায় মাতাল হয়ে ঘুরবে উদ্দেশ্যহীন ট্যাক্সীতে সেদিন সখারাম এতখানি দেখতে পেয়েছিলেন দিব্য চক্ষে একথা বললে সখারামকে অবতারত্ব আরোপ করতে হয়; কিন্তু সখারাম মুন্সী দুটি জিনিষ ধ্রুব দেখতে পেয়েছিলেন রতনলালের বিলাত যাত্রার দুর্দিনে। এক,—রতন গ্লোরিয়াকে সুনিশ্চিত বিবাহ করবে: দুই—গ্লোরিয়া বিলিতি চারা,—এদেশের মাটিতে ফুলে ফলে পল্লবে বিকশিত হতে পারবে না কিছুতেই। কিন্তু গ্লোরিয়া এদেশের মাটিতে শুকিয়ে যাবার আগেই এত বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে সখারামের বংশে তাঁর সুদূরতম কল্পনা থেকেও তা অনেক দূরে ছিল। শুধু সেই দুরপনেয় কলঙ্কের ডালি যেদিন সত্যি সত্যি বহন করে আনলো গ্লোরিয়া ম্যাকডোনাল্ড মুন্সী-পরিবারে তখন সখারাম এবং মোহিনী কেউই তা অবলোকন করে ধরণী দ্বিধা হও বলবার জন্যে এ ধরণীতে বেঁচেছিলেন না। মুন্সী পরিবারের বিয়োগান্ত নাটকে সেইটুকু সেভিংগ্রেস, এই একটুখানি রিলিফ এই গ্রীম্ ড্রামায় কার পুণ্যে অর্জিত হয়েছিলো কে বলবে আজ সেকথা; এই নাটকের ওপর যেমন; এই নাটকের কুশীলবদের জীবনের ওপরও যবনিকা পড়ে গেছে অথবা পড়তে যাচ্ছে অনেক কাল থেকেই।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

বিগত পরিচ্ছেদে ডালিয়া বলে একটি মেয়ের নাম এসে পড়েছিলো সখারাম মুন্সীর মুখে রতনলালের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে, সতর্ক পাঠিকা নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করে থাকবেন। এই ডালিয়ার সঙ্গেই রতনলালের বিয়ে দেবাব আঁচ কবে রেখেছিলেন মুন্সী এবং ডালিয়াদেব দুপরিবারই। ডালিয়া এবং বতনলাল আমাদের সঙ্গে একই কলেজেব স্টুডেন্ট ছিলো উনিশ শো তিরিশ-একত্রিশের সেসানে। ডালিয়া সরকারের সঙ্গে রতনলালের আলাপ রাগ মল্লারে; ডালিয়া সবকারেব সেতার তখন কলকাতার ক্রেজ। পাঠ্যাবস্থায়ই ডালিয়া দিশি-বিদিশি মঞ্চে প্রকাশ্য এবং ঘবোয়া জলসায় সেতারবাদনে সাজ্যাতিক নাম কবেছিলো। আমাদেব কলেজে সে যখন আসতো তখন তার মাথা ঠেকে যেত আকাশে এবং নামেব গ্লামারে মাটিতে পড়ত না পা। ডালিয়াব চেহাবায় লাবণ্য কম এবং তাকে কোনও বকমেই রূপসী ডাকা চলে না; কিন্তু দারুণ আকর্ষণ ছিলো সর্বাঙ্গ জুড়ে। ফিগার এবং প্রচুব সেক্স এই দুই-ই ছিলো তাব কাবণ। কালো রং, নিটোল শরীর। চোখে, ঠোঁটে, ঠোঁটের ওপরে ডান দিকের ছোট্ট তিলে, সরু কোমবে এবং সর্বোপরি খুব দ্রুত হাঁটলে সামান্য দুলে ওঠা বুকে জড়িয়ে থাকত বাধা নিতান্ত উদাসীন পুরুষেব পায়ে পায়ে; ছাড়িয়ে যেতে চাইলে কোথায় বাজতো। কোনও কোনও দারুণ দুশ্চরিত্রবান যে মেয়েদের পায়ের দিকে তাকিয়ে ছাড়া কথা বলতে পারে না চোখ তুলে, তারও চোখ তাকিয়ে থাকত ডালিয়ার সুঠাম অঙ্গের বৃক্ষে শোভমান দুটি দ্রাক্ষা-ফলের দিকে হতাশ শৃগালের নাগালের বাইরেব 'দ্রাক্ষা ফল' অতি টক এই জ্ঞানাঞ্জনশলাকার কৃপায় সদ্য উন্মীলিত দৃষ্টির যষ্টিতে ভর করে।

আমার মনে আছে, রতনলাল মুন্সী সেসান সুরু হবার অনেক পরে এসেছিলো আমাদের কলেজে; সে আসবার আগে ডালিয়া কলেজসুদ্ধ

ছেলেদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো একটু একটু করে দিনের পর দিন। রতনলাল যে কলেজে পড়ত সে কলেজে ধর্মঘট হবার ফলেই ছাত্ররা এক-এক করে কলেজ ছেড়ে দেবার আগেই সে আমাদের কলেজে জয়েন করে প্রথম; এবং প্রথম দিনেই বাজিমাৎ করে কলেজের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই। সেকথা আমরা যারা রতনলালের প্রথম যৌবনের নানারঙের দিনের সর্বপ্রথম সাক্ষী,—তারা ভোলেনি আজও। ট্রামে করে আসছিলাম কলেজমুখো। সেদিন ট্রামে ধূমপান করতে দিতো সবাইকে; এখনকার মতো ধূমপান নিষিদ্ধ কিন্তু গাময় ধূমপানের বিজ্ঞাপন অবারিত ছিলো না ট্রামে। আমাদের কলেজেরই একটি ছেলে ত্বরন্ত হাওয়ার মধ্যে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছিলো কিন্তু পারছিলো না কিছুতেই; আর যত না পারে ততই রবার্ট ব্রুসের মত চেষ্টা বাড়ে তার; এমন সময় চোখে পড়লো ট্রামের সিলিংএ ঠেকে-ঠেকে মাথা একটি উঠে দাঁড়ালো,—তারপর মিলিটারী স্টেপিংএ এসে দাঁড়ালো ট্রাম থেকে বেরুবার আর উঠবার ফুটবোর্ডে; এবং এক ঝটকায় টেনে দিলো গাড়ীর ঘণ্টার দড়ি; থেমে গেল ট্রাম। অকারণে অজায়গায় ট্রাম থামাবার কৈফিয়ৎ চাইবার আগেই সেই সিক্স ফুটার এগিয়ে এল আমাদের সঙ্গের সেই পড়ুয়ার কাছে যে হাওয়ায় বসে মুখে আগুন দিতে পারছিলো না সিগারেটের: তাকে হেসে বলল: আমি জানি তুমি সাইক্লোনের মধ্যেও সিগারেট ধরাতে পারো কিন্তু এখন আর তার দরকার নেই; ট্রামটা থেমে আছে,—চট করে ধরিয়ে নাও তো ব্রাদার! এই বলে নিজে ট্রাউজারের পকেট থেকে ঝক্‌ঝকে সিগারেট লাইটারকে জ্বেলে দিল ফস করে। ট্রাম সুদ্ধ লোক তো বটেই আমাদের সুদ্ধ হতবাক করে দ্বিতীয়বারে ঘণ্টা বাজাতে রতনলাল ট্রাম আবার উত্তর-বাহিনী হলো ভীষণ মন্দমন্থরে। আমাদের বসে পড়ার যেটুক বাকী ছিলো সেটুকও কমপ্লিট হলো কলেজের সদরে! আমাদের চেয়ে অনেক দ্রুত প্রায় রণপা-য় দৌড়ে কলেজের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছে আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত, এ্যান এবসলুট স্ট্রেঞ্জার. সেই আকাশস্পর্শী ঔদ্ধত্য গটগট করে আমাদের কলেজের ছেলের মুখ সকলের সামনে

লাল করে দেবার পর এতটুকু বিরাম না দিয়েই সেই আমাদের কলেজেই।

আমাদের সকলের মনের মধ্যেই মুহূর্তে গুণগুণ করে উঠলো হাজার মৌমাছির একটি মিলিত জিজ্ঞাসার গুঞ্জরণঃ কে এই মূর্তিমান অবিনয়? এবং তার পরমুহূর্তেই অবশ্য যুক্ত হলো মেয়েদের দীর্ঘতম চিঠির শেষেও অবশ্যম্ভাবী পুনশ্চর মতই অনিবার্য প্রতিজ্ঞাঃ যেই হোক্,—দেখে নিতে হবে এক হাত!

ক্ষেণে-অক্ষেণে কথা পড়ে যায় বলে শুনে এসেছি বরাবর; প্রত্যক্ষ করলাম সেই প্রথম। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা রীতিমতো টের পেলাম আমাদের কলেজে নবাগত এই ছফিট দামপাণ্ডা কে? জানতে হলো না; পরপর এমন কয়েকটা বিস্ময়ের বোমা দিনের আলোয় কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যেই দুমদাম সে ফাটাল যে রীতিমতো জানান্ দিলো তার পরিচয় নিজে থেকেই। দিন হলে যেমন বলে দিতে হয় না সূর্য উঠেছে; গন্ধ ছুটলেই যেমন জানা যায় ফুলটা বেল, জুঁই না কামিনী; হিট-নাটকের বিজ্ঞাপনঃ অদ্যই শেষ রজনী কাগজে পড়া মাত্র যেমন বুঝতে দেরী হয় না যে পরের দিনই আবার নতুন বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যাবে যে সাধারণের আগ্রহাতিশয্যে আর মাত্র কয়েকদিনের জন্যে, ইত্যাদি; তেমনই কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেয়ারা, দারোয়ান এবং কেরাণী থেকে সুরু করে দেওয়ালের চুণবালি, চেয়ার বেঞ্চ টেবলের ছারপোকা প্রভৃতি পানবিড়ির দোকান, টি স্টল,—এক কথায় কলেজের চতুর্দিকের বাতাবরণ পর্যন্ত ইলেকট্রিফায়েড হলো এই নবাগতের কারণে; আকাশে বাতাসে কাউকে বলে দিতে হলো না যে, যে এসেছে এই দেড়শো বছরের পুরোণো কলেজে কেবলমাত্র সে আরেকজন ছাত্র মাত্র নয়; অনেক জনের মধ্যে সে একেবারেই একাকী; সম্পূর্ণ আলাদা আর 'একজন'। তার কার্যাবলীর কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে আমার এই সোচ্চার সবিস্ময় প্রশংসাপত্র কারুর কারুর তো বটেই, বিশেষ করে তাদের কাছে ব্যালিহু-র বাগাড়ম্বর বলে নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হবে যাদের কাছে

ভারতীয় যোগী পুরুষদের প্রত্যক্ষদর্শন হচ্ছে হ্যালুসিনেসনের সমার্থক; ক্লেয়ারভয়েন্স কর্ণবিভ্রম ছাড়া কিছু নয়। তাদের অবগতির জন্যেই আমাদের কলেজে সেদিন সদ্য আগত রতনলাল মুন্সীর কাণ্ডকারখানার দু এক খাবলা এখানে তুলে দিলে তা আর যাই হোক অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হ্যাঁ; আরেকটা কথা। হ্যালুসিনেসান কথার কোনও বাঙলা হয় না; বাঙলায় বোঝাতে গেলে যে বাক্য ব্যবহারযোগ্য তা হচ্ছে রজ্জুতে সর্পভ্রম। জনান্তিকে বলে রাখি, 'নবাগত'-প্রসঙ্গের প্রারম্ভেই যে রজ্জুতে সর্পভ্রম হাসির খোরাক হয়েছে অনেকবার কিন্তু সর্পে রজ্জুভ্রমের মতো মারাত্মক হয়নি বোধহয় একবারও। রতনলাল মুন্সী, যার নাম আমরা তখনও জানতাম না, তাঁর সম্পর্কে আমরা সর্পে রজ্জুভ্রমই করেছিলাম। লেজ নাড়ানো মাত্তর সে কলেজ সুদ্ধ সবাইকে মালুম দিয়েছিলো সে জাত সাপ। ঢোড়া নয়; কেউটের বাচ্চা। লেজ না নাড়াতে চাইলে বিপদে যার মতো বয়া আর নেই তার নাম কলেজে তার প্রবেশের অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেনেছিলাম: রতনলাল মুন্সী। রতনলাল নাম না হলেও সে যে রত্ন বিশেষ ইথে সন্দেহের অবকাশ অল্প অথবা একেবারেই ছিলো না সেদিন: আমরা তার মধ্যেই প্রথম উপলব্ধি করলাম, গোলাপকে যে নামে ডাকা যাক সে সমান গন্ধবহ, – এ শুধু সেক্সপীয়রের বাণী নয়; জীবনের বক্তব্যও হুবহু তা-ই।

॥ ২ ॥

মিস রবি বলে একজন সাঙ্ঘাতিক শ্বেতাঙ্গিনী আমাদের সেকালে পড়াতেন। তার কথা মনে পড়লে আজও আমাদের হৃৎকম্প হয়। মেয়ে আশু মুখুজ্জে বললে কম বলা হয় মিস রবিকে। স্যার আশুতোষের মুখজোড়া এক জোড়া গোঁফই তার কেবল বাদ গেছে; আর সব দিক দিয়েই শার্দ্দূল সদৃশ সেই ব্যক্তিত্বের মহিমায় সারাক্ষণ তটস্থ থাকত সেই

প্রাচীন কলকাতা-কলেজের কড়ি-বরগা থেকে সব কিছু। কোনও পুরুষ-প্রফেসর তার কাছে লাগে না। ছেলে-মেয়ে বলে ব্যবহারে, শাসনে অথবা নম্বর কার্পণ্যে কোনও ফারাক হতে দেবার পাত্র ছিলো না মিস্ রবি। দেখতে প্রায় পুরুষের মতো ; হাঁটার বদলে দৌড়নোয় ; কথার পরিবর্তে ধমকানোয় ; এবং পড়ানোর চেয়ে বিভীষিকা সৃষ্টিতে বেশী ; পরীক্ষার পরিবর্তে নম্বর কর্তনের বীভৎস আনন্দে আত্মহারা লেডিলেকচারার হিসেবে মিস রবি শিক্ষা জগতের কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছিলো সেকালেই। তারই ক্লাসে রতনলাল মুন্সী বলে যাকে জেনে ধন্য হয়েছিলাম ঢুকেছিলো ক্লাস আরম্ভ হবার দশ মিনিট পরে ; প্রকাণ্ড হিলতলা ফিতে বাঁধা শু-জুতোর খট খট আওয়াজ করে ঢুকতেই নির্মেঘ নীলাকাশ থেকে মিস রবির তিরস্কারের বজ্রপাতের আশঙ্কায় আমরা তখন মুহূর্ত গুণছি। মিস রবির চোখে বহ্ন্যুৎপাতের আলো জ্বলে উঠেছে অনেকক্ষণ কিন্তু যেহেতু আলোর চেয়ে শব্দের দৌড়শক্তি কম সেহেতু হুঙ্কার শ্রুত ত সময় নিলো।

Look here, young man, leave this class immediately and in future if you are to attend this lecture you are to keep in your mind that it begins at eleven fifteen and is punctually over by twelve. Do you make a note of it.

—I do. Now may I leave with your permission Madame ?

—You can !

কতক্ষণ বাদে মনে নেই আবার বন্ধ দরজায় ঘা পড়েঃ May I come in madame ? মিস রবির অত্যন্ত বিরক্তকর কণ্ঠস্বর কর্কশ প্রত্যুত্তর করেঃ come in। আমরা হতবাক হ'য়ে দেখি আবার সেই নবাগতই ফিরে এসেছে আমাদের ক্লাসে।

Yes ?--মিস রবি ফাটবার আগে সময় নেয়।

You said your lecture gets over punctually by twelve, Didnt you?

I did So what?

Its twenty minutes past twelve for your information please-

আমাদেরও নিদ্রাভঙ্গ হয় এতক্ষণে। সত্যিই তো,—ঘণ্টা পড়ে গেছে কিনা তা-ও খেয়াল করিনি। সকলেই সকলের মুখের দিকে তাকায়। ঘড়ির দিকেও কেউ কেউ। মিস ববির দিকে তাকায় তারপর। সেই প্রথম মিস ববিকে মেয়ে বলে মনে হয়। চোখ ছল-ছল করছে, ঠোট কাঁপছে। দৌড়ে বেরিয়ে যায় মেয়ে শার্দুল সটান প্রিন্সিপ্যালের কামরার দিকে উদ্ধশ্বাস উদ্বেগে। ততক্ষণে হই-হই পড়ে গেছে কলেজময়। আমরা ঘরের মধ্যে আটকা থাকায় টের পাইনি কেউ। বেয়ারা ঘণ্টা খুজে পাচ্ছে না কোথাও।

মনে আছে নবাগত ছাত্রটি এবারে ঢুকে শেষ বেঞ্চের শেষ সিটে এসে বসেছিলো এর আমরা ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। যেমন ঝড়ের মতো বেরিয়েছিলাম তার চেয়েও হুড়মুড় করে ফিরে আসতে হয়েছিলো অবশ্য আমাদের, কারণ প্রিন্সিপ্যাল এমার্জেন্ট আদেশ জারী করেছেন ততক্ষণে: সবলকে ক্লাসে গিয়ে বসতে হবে যাদার হুকুম না জারী হওয়া অব্দি। ক্লাসে বসবার একটু বাদেই প্রিন্সিপ্যাল মিস ববি এবং আরও অধ্যাপক ও বেয়ারারা এসে ঢুকলো সার্চওয়ারেন্ট সমেত পুলিশের লোকের মতো। সত্যি সত্যি সার্চ করতে হল না, কে একজন ছাত্র বললো: ঘণ্টাটা পড়ে আছে শেষ বেঞ্চের তলায়। ব্যস্। প্রিন্সিপালের অর্ডার হলো: কলেজ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ক্লাসে বন্দী থাকতে হবে সকলকে। এখনকার মতো এইটুকু; এরপর দীর্ঘস্থায়ী শাস্তির জন্যে তৈরী থাকতে বলে প্রিন্সিপ্যাল বেরিয়ে যাবেন এমন সময় নবাগত সেই ছাত্রের পুনর্প্রবেশে আমরা চমকে উঠেছি। সে যে ক্লাসে বইপত্তর রেখে কখন্ বেরিয়ে গেছে নিঃশব্দে খেয়াল করেনি কেউ। সে ঢুকতেই প্রিন্সিপ্যালের জিজ্ঞাসা:

What do you want ?

My books sir—

You are to sit here for the whole day, your class has been found guilty and that's your punishment for the time being—

I was not in the class when it happened Sir—

বই-খাতা নিয়ে গট গট করে বেরিয়ে যায় যে তার খাতার ওপর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা পড়তে ভুল হয় না কারুর : রতনলাল মুন্সী। দরজা দিয়ে বেরুবার মুহূর্তে পেছন ফেরে : বাঁকা হাসি দেখা দেয় ঠোঁটের কোণে। সেই হাসি স্পষ্ট করেই বলে, ঘণ্টা কে সরিয়েছে। এছাড়া আরও যা উহ্য সেই হাসিতে, ইংরেজ লেখক সমারসেট মমের নামের মধ্যে জি. আর. এইচ-এরমতো যা অনুচ্চার্য, তা হচ্ছে সে যে এখন বাঁকা হাসি হাসছে আমাদের দেখে সে কেবল তাকে যখন মিস ববি ক্লাস ছেড়ে যেতে বলে তখন আমরা যে বাঁকা হাসি হেসেছিলাম তারই প্রত্যুত্তর মাত্র। কালটা আজকের হলে বলা যেত আমরা পয়সায় যা দিতে পেরেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী যে প্রত্যর্পণ করল এইমাত্র নয়া পয়সায়,—রতন তার ক্ষেত্রে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন নয়।

ভূমিকম্প হলে কোথাও দেখা যায় একবার হয়েই থামে না বাসুকীর মাথা নাড়া ; থেকে থেকেই শির সঞ্চালন করে সে আর কেঁপে ওঠে বসুন্ধরার বুক ; আশপাশ জুড়ে বারেবারেই সঙ্ঘটিত হয় আমরা যাকে বলি ভূকম্পন,-তাই। সেদিনকার সেই নবাগত যার নাম দাবানলের চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো কলেজময় রতনলাল মুন্সী বলে তার ঘণ্টা কাণ্ডেই কীর্ত্তির পরিচয় দানের প্রবৃত্তির শেষ হলো না কিন্তু। কয়েকদিনের মধ্যেই পরপর এমন কয়েকটি ঘটন-দুর্ঘটনের একক নেতৃত্ব গ্রহণ করল সে যে অবিসম্বাদী তাকেই আমরা মেনে নিতে বাধ্য হলাম ডালিয়ার যোগ্য প্রত্যুত্তর বলে। রতনলালের কাঁটা দিয়েই ডালিয়ার দন্তের কাঁটা উপড়ে ফেলতে পাবার সম্ভাবনায় আমরা উৎফুল্ল হয়ে

উঠলাম রীতিমতো ; ঘরদোর চুণকাম করার সঙ্গে সঙ্গে তেলাপোকা ইত্যাদি শিকার নির্গত হবার নির্ভুল ক্যালকুলেসানে যেমন ফুলে ওঠে বেড়ালের গোঁফ,-তেমনি আর কি।

কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় যে দুর্ঘটনার বোমা বিদীর্ণ করলো ইতোমধ্যেই কীর্ত্তিমান রতনলাল মুন্সী, চমকে এবং কৌতূহল উদ্দীপনে সর্বোপরি নভেলটির বিচারে তা-ই আসলে অদ্বিতীয় বলে স্বিকৃতি-লাভের যে নিদারুন যোগ্য বিবৃত করলে তাতে সায় দিতে আপত্তিহবার কথা নয় বাঙালী উপন্যসের একমাত্র পাঠক যারা সেই পাঠিকাদের। ঘটনাটি অনেকটা এই। মাসের পনের তারিখের মধ্যে মাইনে দিতে না পারলে ফাইন দিতে হবে কলেজে। ফাইন দিতে না পারলে প্রিন্সিপালকে দিয়ে এক্সকুজ করাতে হতো জরিমানা। প্রথমটি অনেকেব পক্ষেই যেমন ব্যায়সাধ্য ব্যাপার তেমনই দ্বিতীয় কার্য্যটিও অনায়াসসাধ্য ছিলো না মোটেই। ফাইন মাফ করবার দুঃসময়ে একদিন প্রিন্সিপালের ঘরে একটি বড় লোকের ছেলে, তার নাম এখানে সম্পূর্ণ সুপারফ্লুয়াস, একটি গরীব ছেলের হয়ে ফাইনের টাকাটা দিয়ে দিতে প্রশংসায় ট্রাউজারের বাঁধন আলগা হয়ে গলে যাওয়া প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন এই আদর্শ প্রত্যেকের অনুসরণ যোগ্য। ঠিক সেই সময়ে নাটকের প্রথম পাত্র রতনলাল মুন্সীর অভাবিত প্রবেশ ফাইন-নাটোর অভিনয় মঞ্চে। এবং তাকে লক্ষ্য করে প্রিন্সিপ্যালের সহর্ষ ঘোষনা : মুন্সী, এই দেখ,—একটি ছেলে তার নিজের গাঁট থেকে আরেকজন বন্ধুর ফাইনের টাকা দিচ্ছে,—এ আদর্শ কি সকলেবই অনুসরণ যোগ্য নয়? হোয়ট ডু য়ু স্যে মাই বয়?

রতন মুন্সী পকেট থেকে ফস করে মাইনের খাতাটা প্রিন্সিপ্যালের নাকের সামনে ধরে বলল : আই ওয়াণ্ট য়্যু টু ফলো দিস ফাইন একসাম্প্‌ল ফার্স্ট স্যার! এক মিনিট পূর্ণ নীরবতা পালনের পর দেড়শো বছরের ওপর পুরোনো সেই অতিবৃদ্ধ কলেজের ব্যক্তিত্বের গৌরীশৃঙ্গ অধ্যক্ষ পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে বলেছিলেন :

হিয়ার য়্যু আর মাই বয়! য়্যু বিট মি,—কমপ্লিটালি বিট মি আউ অভ দিস ওয়াল্ড্‌!

এহ বাহ্য, এরপরেও আছে। প্রাজ্ঞজনেরা বলে থাকেন মেঘনাদ-বধ মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গটিই মেঘনাদ-বধের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ, ভাববস্তু, আঙ্গিক এবং কাব্যপ্রাণতার কারণে; এবিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত নয়, কিন্তু রতনলাল মুন্সীর কলেজ-কাব্যে তার তৃতীয় যে কীর্তির পরিচয় পেলাম আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের অনতিবিলম্বিত বিবৃতির পর তা যে সে চরিত্রের ইতোপূর্বে দৃষ্টিঅগোচর একটি দিকের আবরণ সম্পূর্ণ উন্মোচনে সাহায্য করেছে সব চেয়ে বেশী তা রতনের এ্যাডমায়ার অথবা নিন্দুক কোনও পক্ষই অস্বীকার করতে পারেনি সেদিন। উর্বরতম মস্তিষ্কের পক্ষেও সেরকম একটা কাণ্ডঘটানোর দুর্বুদ্ধি রীতিমত আয়াসসাধ্য। প্রতিভার পরিচয় যদি নবনব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি হয় তবে রতনলাল মুন্সী যে প্রতিভাবান পুরুষ এঘটনা জানবার পর তা সকলের চোখেই প্রতিভাত হবে; 'আর প্রতিভা যদি যা কিছু স্পর্শ করে তাই সোনা করে দেবার' জাদু হয় তাহলেও রতনলাল জাদুকর যে এতে কে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' না বলবে?

ঘটানাটি, না কি তাকে দুর্ঘটনা বলাই যুক্তিযুক্ত জানি না, ঘটে গেল ক্রিকেট ম্যাচ উপলক্ষে। আমাদের কলেজ আর আরেকটি মিশনারী কলেজের মধ্যে ক্রিকেট রেষারেষি সে সময় টালা ট্যু ট্যালিগঞ্জ কলকতার জোর খবর ছিলো ডিসেম্বরের শেষ কদিন ছাত্র জগতে। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের দাঁড়ের লড়ায়ের মতো তার জন্যে প্রতীক্ষা করত ক্রিকেটপ্রিয় ছাত্রশিক্ষক সবাই। আর কারুর কাছে হারলে জিতলে অগৌরবের অথবা গৌরবের ছিলো বটে কিন্তু হাল্লার বিষয় ছিলো কেবল এই দু'কলেজের মধ্যে কে হারে কে জেতে,—ক্রিকেটের এক জীবনমরণ বার্ষিক ট্যগঅভওয়ারে। প্রত্যেকবারই। প্রত্যেক খেলার ফলাফল নিয়েই যদিচ সুপ্রবল হতো এই উত্তেজনা তবু রতনলাল মুন্সীর আমাদের কলেজে প্রবেশবর্ষে দ্বিগুণ চাঞ্চল্যের স্মৃতি এখনও আমাদের

অনেকেরই মনের পটে অবিস্মরণীয় জ্বলজ্বল করে। কারণ সেবারের খেলা সুরু হবার আগে পর্যন্ত বার্ষিক হারজিতের তালিকায় আমাদের কলঙ্কের হারের সংখ্যা এক বেশী; এবং সেবছরের খেলা শেষ হলে এক বছর বন্ধ থাকবে বার্ষিক এই ক্রীড়াদ্বন্দ্ব এই ছিলো বরাবরের নিয়ম: চার বছর পরপর খেলার পর এক বছর বাদ। অতএব সেবছরের ম্যাচটি প্রতিপক্ষের গ্রাভস থেকে ছিনিয়ে নিতে না পারা তক আত্মসম্মান ফিরে পাবার উপায় ছিলো আরও সাতশো দিবস রজনী অপক্ষা করা। রতন মুন্সী আমাদের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হ'লো নির্দ্বন্দ্বে। একমাত্র তার বুদ্ধির ওপর ভরসা করেই বালীগঞ্জের নির্মাস্ত্রত মাঠে ইস্তু ক্লিঞ্চ করবার আমাদের আশাভরসা সব কিছু সেদিন। কারণ কাগজকলমে নয় কেবল: খেলার মধ্যেও প্রতিপক্ষ কলেজের অংশগ্রহণকারীরা আমাদের চোখে একটু বেশ বেশী রকম জোরদারই ছিলো।

আমাদের ছিলো সবেধন নীলমণি,—একটি নয়,—একজোড়া; ননীগোপাল দে এবং খৈনীগোপাল দে: –যমজ ভাই। মুশকিল ছিলো এই যে, এই একজোড়ার মধ্যে ননী ছিলো ব্যাটিং এবং খৈনী বোলিংএ জোরালো। রতনলাল অবশ্য অলরাউণ্ডার ছিলো; কিন্তু আর একজন ব্যাট অথবা বোলার না হলে ননী ভাল ব্যাট এবং খৈনী ভাল বল করলেও আরেক প্রান্তে সাপোর্ট না থাকলে যা হয় তারই সম্ভাবনা এব সমারোহময় আশঙ্কা নিয়ে মাঠে নামলাম আমরা; আশঙ্কা আশঙ্কাতীত প্রমাণ হলো যখন রতনলালের সঙ্গে ব্যাটে ঠ্যাকা দেবার লোকের অভাব হলো সাতজন আউট হবার পর। ননীগোপাল প্রথমে নিজে ভালুয়েবেল চুয়ান্ন করে বিদায় নিয়েছে সবেমাত্র।

কিন্তু মাঝের সবাই কেউ দুই; কেউ শূন্যি। সাতজনে মিলে মোট রাণ সংখ্যা হয়েছে পঁচাত্তর। অন্ততঃ একশো রাণও যদি না হয় দশ জনে আউট হবার পর তাহলে আমাদের কলেজের ইতিহাসে কলঙ্কের নতুন পরিচ্ছেদ যুক্ত হবার সুনিশ্চিত সম্ভাবনাই জয়যুক্ত হবার মুহূর্ত যখন অত্যাসন্ন সেই সময়ে যার নামার কথা তাকে বসিয়ে রেখে প্যাভিলিয়ন থেকে রতন যাকে ডেকে নিয়ে যায় তাকে দেখে

আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসি ; খৈনীগোপাল,—যে আজ পর্যন্ত এক রাণ পেরোয়নি কোনও খেলায়। খৈনীগোপাল বরাবরের Last Man ; এবং ফাষ্ট বোলার আমাদের দলের। তাকে আগিয়ে আনাব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তিম মুহূর্ত সন্নিকটতর হয় যে একথা বোঝবার মতও মানসিক শক্তিও হারিয়েছি যখন তখন খৈনীগোপাল প্রথম বলে ছ' রাণ, তার পরের বলে,—ওভারের শেষ বল সেটা,—এক রাণ করে। এবং কেন সে শেষ বলে রাণ না নিয়ে রতনকে ফেস করতে দিল না ওদের বেষ্ট বোলারকে ভাবছি,—তখন পর পর তিন বলে তিনটে চার মেরে সবশুদ্ধ সব্বাইকে হতবাক্ করবার সূচনা করেছে মাত্র ; মঙ্গলাচরণই কেবলমাত্র,—তখনও আমরা ভাবতে পারিনি তা। ভাবতে পারলাম যখন ননীগোপালের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অর্ধ শত রাণের পর রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে তাঁবুতে ফিরছে তখন ননীর যমজভাই খৈনীগোপাল ; এবং দলের মোট রাণ সংখ্যা ছুঁয়েছে দেড়শো মার্ক।

কিন্তু ফাঁড়া কাটল না তাতেই। প্রতিপক্ষ কলেজও ভাল ব্যাট করলে খৈনী অত্যন্ত ভালো বল করা সত্ত্বেও। দিনের শেষে অবস্থা দাঁড়ালো এইরকম ঃ ওদের একজন আউট হলেই যখন খেলা শেষ হয়, তখন আর ছ' রাণ করতে পারলেই আমাদের রাণ সংখ্যা হয় অতিক্রান্ত। লাষ্ট ওভারেও খৈনী একটা উইকেট নিয়েছে ; কিন্তু এখন খৈনী ছাড়া আর যে কেউ বল করলেই ভয় হয় ওরা মেরে দেবে আমাদেব টোট্যাল। এমনই সময় রতন খৈনী এবং ননী তুজনকেই কাছে ডেকে কি পরামর্শ করল এবং তারপর ননীকে দিল বল করতে। আমাদের তখন মূর্ছা যাবার উপক্রম। ননী জীবনে আণ্ডার হ্যাণ্ড বলও এক ওভার পুরো করেছে কিনা সন্দেহ ; যদিও ব্যাটের বেলায় কপাল জোরে লেগে গেছে রতনের এক্সপেরিমেণ্ট তবুও শেষ মুহূর্তে বল নিয়ে এই ছেলে খেলা আমাদের কাছে too muchই মনে হল বরং। তবুও আমরা মেনে নিলাম নির্দেশ কারণ সেদিন খেলার মাঠে খেলার চেয়ে বড় ছিল খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র কঠিন হলে হল ছেড়ে; আম্পায়ার অথবা দলপতির নির্দেশ

মনোমত না হলে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসার দুঃসময় সেদিন অতি সুদূর পরাহত দুর্ঘটনা ছিল যে।

ননীর প্রথম বলেই আমরা যা আশঙ্কা করেছিলাম তা-ই হলো। তিন রাণ দিলে ওরা। দ্বিতীয় বলেই আমাদের খেলা শেষ বলে যখন দুর্গা নাম জপছি তখনই সমবেত উলুধ্বনিতে বিদীর্ণ হলো ডিসেম্বর রিমঝিম করা কলকাতার আকাশ। ওদের খেলা শেষ; তেকাঠি ছিটকে দিয়েছে ননী।

ননীকে নিয়ে হলুস্থুল পড়ে গেছে তখন মাঠময়।

তখনও আমরা কিছুই বুঝিনি। বুঝলাম পরের দিন। রতনলাল মুখগোমড়া করে বসে আছে কমনরুমে। কি ব্যাপার? কি হয়েছে? আমাদের জিজ্ঞাসাব উত্তরে রতনলাল মুন্সী জানায় যে প্রতিপক্ষ কলেজ প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছে। কেন? —আবার আমাদের সমবেত প্রশ্নের জবাবে জানায় আমাদের দলপতি রতনলাল মুন্সী যে, প্রতিপক্ষ দল লিখছে তাদেব প্রতিবাদপত্রে যে ভবিষ্যতে আমাদের কলেজদলে যদি যমজ খেলোয়াড় নামানো হয় তাহলে খেলবে না তারা; যদি বা খেলে তাহলে যমজদের একজনকে দাড়ি রেখে গালে তবে নামতে হবে যাতে তাদের একই লোক দুবার ব্যাট করতে না নামতে অথবা একই বোলার এপ্রান্ত থেকে বল করেই আবার ওপ্রান্ত থেকে বল করতে না পাবে সকলেব চোখে ধূলো দিয়ে।

রতনলাল মুন্সীর দিকে তাকালাম সবাই, শিশুর সারল্য রতনলাল মুন্সীর দুচোখে কাজলের মত মাখানো; দেখে মনে হয় যেন প্রতিবাদের অর্থই তার বোধগম্য হয় নি এখনও; আমরা সবাই সাষ্টাঙ্গ হয়ে যখন তার পায়ের ধূলো নিতে হাত বাড়াই গুরুদেব বলে তখনও সে রীতিমত অবাক হয়ে প্রশ্ন করে কি হয়েছে কি? তোমরা এমন করছ কেন?

অতএব রতনের কাছে আমাদের শেষ আর্জি পেশ করা গেল নিঃশঙ্কচিত্তে। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মেছিল যে পারলে রতনই পারবে। হ্যাঁ; ডালিয়াকে কলেজ ফাংশানে সেতার বাজানোয় বাধ্য

করতে। আর তবেই শান্তি পাবে আমাদের বিক্ষুব্ধ সর্বজনীন অন্তরাত্মা। রতনলাল মুন্সী বলল : পারব কিনা বলতে পারি না ; তবে চেষ্টা করব নিশ্চয়ই। রতনের কথা বলার মধ্যে আজকের স্বাধীনতা পরবর্তী কলকাতাব ট্রাম ধর্মঘট প্রত্যাহার করানোর জন্যে পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি যে সুরে, চেস্টা করব নিশ্চয়ই, বলেন,—সেই সুরেব আভাস পাওয়া গেছিল সেদিন যে তা এতকাল পরেও আমবা একবাক্যে শপথ কবে বলতে পারি। আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম গুরুদেবেব তথাস্তুতে।

আমবা হলেও রতন মুন্সী হয় নি যে তা বোঝা গেল তার দুশ্চিন্তা এবং দাড়ি আক্রান্ত মুখ দেখে তারপবেব বেশ কয়েকদিন পর পর।

কয়েকদিন পরপরই রতন মুন্সীব মুখের চেহারা হাওয়া-অফিসের পরিভাষায় যাকে বলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তা ঘটলো না। তারপর দীর্ঘদিন গুমোট আকাশেব মুখ দেখে দেখে যখন বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন হার মেনে থকে গেছে তখন যেমন বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় আসে করুণাধারায় ; ভেসে যায় ধরণী,—তেমনই কলেজের এন্যুয়াল ডিবেটের আসবে ঠোকাঠুকি লাগল, প্রকৃতির নিজের কর্মশালায় আপন হাতে প্রস্তুত প্রথম দেশালাই,— চকমকি পাথরে পাথরে। ঠোকাঠুকি মাত্তরই জ্বলে উঠল সেই আগুনে যে দুটি মুখ তার একটি ডালিয়ার ; আরেকটি রতনলাল মুন্সীর। ব্যাপারটা প্রায় এবকম ঘটলো। বিতর্কেব বিষয় ছিলো, হাউসেব মতে ভারতবর্ষে ওভার পপুলেশানই সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা। ডালিয়া ইম্প্রেস করল সবচেয়ে বেশী যতটা না যুক্তির জোবে তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী কণ্ঠস্বর আব পিকুলার ইংরেজী উচ্চারণের জাদুতে। তার মতে অবশ্যই ঘটেছে ওভার পপুলেশান এবং কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণের অতীব প্রয়োজন সন্তান-জন্মের। একদম শেষে উঠলো রতনলাল মুন্সী। জবাব দিলো বাঙলায়। মাঝের কজনকে টপকে ; একদম স্বরু যাকে দিয়ে সেই ডালিয়াকে নিয়ে পড়লো। বলল : আমি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করতাম গতকাল সকাল পর্যন্ত। কিন্তু কাল রাত্তির থেকে আমি আর মানি না

যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া আমরা গত্যন্তরবিহীন। আমি জানি। জানি কেন, আপনাদের সকলের মুখে স্পষ্টই পড়তে পাচ্ছি যে একটিমাত্র জিজ্ঞাসা তা হচ্ছে আমার এবম্বিধ হঠাৎ কেন 'বদলে গেল মতটা; ছেড়ে দিলাম পথটা'? তার উত্তরে জানাই যে আমার অবস্থায় পড়লে আপনাদের কনভিকশন হোক যত সুদৃঢ় অনেক দৃঢ়তর হতো তার আমূল পরিবর্তন। এখন বলি কাল রাতে কি হয়েছিলো?

কাল রাতে চোর এসেছিলো আমার পাশের বাড়ীতে। যে বাড়ীতে এসেছিলো সে বাড়ীতে ওভার পপুলেশান। বড়ো আর খুচরোয় মিলিয়ে সংখ্যাতীত সে বাড়ীর লোকজনের সংখ্যা। ফলে রাতে খাটের ওপর শোয় যে ক'জন তাছাড়াও শোয় আরও বেশ ক'জন খাটের নীচে একতলায়। চোর এল রাতে এবং নির্বিবাদে ঢুকে হাতাল যা যা নেবার সব। 'ভিনি ভিডি ভিসি' করেই চলে যেত; কিন্তু বেরুবার নিঃশব্দ পথ খুঁজে পেলো না আর। ঘরের যেখানেই পা দেয় সেখানেই ট্যাঁ; এবং তাদের ঘুমভাঙা সম্মিলিত ট্যাঁএ প্রথমে বাড়ী পরে জেগে উঠল পাড়া। ফলে যেপথ দিয়ে পাঠান এসেছিল সেপথ দিয়ে ফিরলো নাকো তারা।

এরপর আশা করি উপস্থিত সবাইকে তো বটেই,—মিস ডালিয়াকেও নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না আর টীকা করে যেখানেই পা সেখানেই ট্যাঁর ব্যুৎপত্তিগত মর্মার্থ।

সত্যিই বুঝিয়ে বলতে হলো না এরপর। সাতদিন ধরে কলেজের যেখানে ডালিয়ার দেখা যায় শাড়ী সেখানেই ভেসে আসে ঐকতানে: পা দিলেই ট্যাঁ। পাগল হয়ে উঠল ডালিয়া; ডাক পড়লো রতনলাল মুন্সীর। কম্প্রমাইসের সর্ত হলো,— ছেলেরা বন্ধ করবে যেখানে পা সেখানেই ট্যাঁ এর অর্কেষ্ট্রা; এবং ডালিয়া বাজাবে কলেজের বার্ষিক উৎসবে তার বিখ্যাত সেতার!

দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যেয় কলেজের বার্ষিক উৎসবে রতনলাল মুন্সীর সঙ্গে আলাপ হলো ডালিয়ার রাগমল্লারে!

সে রাতে আকাশপারের খেয়া যখন একলা চালাচ্ছে বহুদূর সিন্ধুর

ওপরে ওঠা নিদ্রাহারা পূর্ণশশী তখন হষ্টেলের ছাদে পায়চারী করছে জীবনে প্রথম বিনিদ্র রতনলাল মুন্সী। নিস্তব্ধ নিশীথ নগরীর সীমাহীন ঊর্দ্ধে থেকে আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে তারা দেখতে না পাওয়া আকাশ, ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে সামনের একটা গাছ। মাঝে মাঝে রাতজাগা কোন্ পাখী স্বরের ঢিল ছুড়ে দিচ্ছে নিঃশব্দের পুষ্করিণীতে। শব্দের ঘূর্ণী নিজেকে ছড়াতে ছড়াতে বাড়াতে বাড়াতে শব্দের তটস্পর্শ করতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, ফেটে যাচ্ছে বুদবুদের মতো। হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকেই; ফাল্গুনের রোদনভরা বসন্তের প্রথম সমীরণ। জাহাজের বাঁশীব বিষণ্ন গম্ভীর ডাক আসছে দূর থেকে; ট্রেনে হুইশিল! জীবনে এমন বাত রূপকথার পাতাতেই কেবল এসেছে এতকাল। জীবনেও কখনও এমন আরব্যোপন্যাসেব এক হাজারের একরাত আসবে কে জানতো। আজ পৃথিবীব সব কিছুকেই, তুচ্ছতম ধূলিকণাকেও মনে হচ্ছে না তুচ্ছ; ভালবাসতে ইচ্ছে করছে; ভরে দিতে ইচ্ছে করছে গানে গানে আরেকটু বাদের ভোরেব আকাশকে। কোনও বাড়ীতেই প্রায় জেগে নেই কেউ; কোনও কোনও বাড়ীর পর্দা ভেদ করে নীলাভ বিচ্ছুবণ বহস্যমদির করেছে রতনলাল মুন্সীর প্রথম ভালবাসার ঘুম না আসা রমনীয় রাতকে।

এরপর পরপর কয়েকদিনের মধ্যেই ক্লাসে ক্লাসে 'রটি গেল সেই বার্তা।' ডালিয়া আব রতনলাল; রতনলাল আর ডালিয়া। ক্লাস পালিয়ে কখনও বোটানিকসে; কলেজ ফাঁকি দিয়ে কখনও চিড়িয়াখানায়। সন্ধ্যের পব কার্জন পার্কেব নির্জন অন্ধকারে রতনের জীবনে ডালিয়া ফুটতে সুরু করেছে সেই মাত্র। আমরা যারা রতনকে লেলিয়ে দিয়েছিলাম ডালিয়ার পেছনে আঙুল কামড়াচ্ছি তখন। রতন খেলার মাঠে নেই; নেই বিতর্কবাসরে। হেরে যেতে লাগল সব বিষয়ে আমাদের কলেজ যাচ্ছেতাই ভাবে। ঠিক এই সময়ে কে প্রথম রটালে এখন আর সেকথা মনে করে বলা শক্ত যে ডালিয়ার সঙ্গে রতনের নাকি বিচ্ছেদের পিরিয়ড চলছে। প্রথমে আমরা তেমন কান দিইনি সেই অবিশ্বাস্য কথায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস না করে উপায় রইল

কই। ডালিয়া কলেজে আসে তো রতনলাল আসে না; রতনলাল আসে যদি ডালিয়া এবসেন্ট হয় সেদিন। যেদিন দুজনেই আসে সেদিন দৈবাৎ করিডরে চলতে দেখা হয়ে গেলে শুক্ল এবং কৃষ্ণ দুইপক্ষের দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় বামে ডাইনে; পূবে পশ্চিমে। আমরা নিঃসংশয় হতেই স্থির করলাম লেলিয়ে দিয়েছিলাম যেমন ডালিয়ার ব্যাপারে রতনলালকে আমরা তেমনই ডাইনীর কবল থেকে মুক্ত করে আনবও সেই আমরাই; এবং এক মুহূর্ত দেরী করব না আর। কারণ গ্রহণ লেগেছে বটে ভালবাসার চাঁদে কিন্তু গ্রহণ-ই তো ক্ষণিকের; চাঁদ সে চিরকালের। রতনকে আমরা আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকে এক সুরে কিছু সত্য অনেকটা অসত্য; আবার কখনও পুরোটাই কল্পনার সাহায্যে ডালিয়ার বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে-উদ্ব্যস্ত করে তুললাম। আমরা যখন রতনকে ছাড়াবার চেষ্টা করছি ডালিয়ার হিপ্নটিক স্পেল থেকে আমরা জানতাম না মেয়েদের মধ্যেও তখন আরম্ভ হয়ে গেছে রতনের টব থেকে ডালিয়া উপড়ে আনার। আমাদের কোনও কোনও বন্ধুর বোন পড়ত আমাদেরই সঙ্গে সেই সময়ে। তাদের করুণাতে যা জানা গেল তাতে আমরা সবাই স্থিরপ্রত্যয় হলাম যে সুবাতাস বইছে এবং বিধি সুপ্রসন্ন: ডালিয়া-রতন নাট্যের বিয়োগান্ত শেষ দৃশ্য অত্যাসন্ন।

সুরজিৎ মল্লিকের ফাস্ট কাজিন পামেলা মল্লিক আমাদের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য চর ছিলো লেডিস কমনরুমে। তার মুখেই আমরা খবর পেলাম যে আমাদেব মধ্যে যেমন মেয়েদের মহলেও তেমন দীর্ঘকাল ধরে ধিকি ধিকি করে অসন্তোষের বহ্নি জ্বলছিলই। আমরা যেমন রতনলালের পেটিকোট ইনফ্লুয়েন্সের অধঃপতনে মর্মাহত ছিলাম মেয়েরাও ডালিয়ার উচুনাক এমন রটন্ উকোয় ক্ষয়ে এত চ্যাপ্টা হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি। রতন যেমন আমাদের বিপদে-আপদে বুদ্ধির টাগঅভওয়াবে ব্যালান্স অফ পাওয়ার ছিলো ডালিয়া ছিলো মেয়েদের সব চেয়ে বড় প্রত্যুত্তর ছেলেদের। সর্বপ্রকার বজ্জাতির। সেই ডালিয়া রতনের প্রেমের সাগরে এমন হাবুডুবু খাওয়ায় তাদের

প্রেস্টিজ চ্যাংড়াদের রকের অথবা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে দেশ বিদেশের রম্যরচনাকারদের ভাষায় নিদারুণ পাংচার্ড হয়েছিল এবার্তা আমাদের এতকাল অজানা ছিল; আরও যা জানা ছিল না তা হচ্ছে তারাও আমাদের মতই তৎপর হয়েছে তখন ডালিয়া-রতনের মধ্যে বিচ্ছেদের অল্প ফারাককে যোজন পরিমাণ এমন বিস্তৃত করতে যাতে আর জোড় না লাগে। লেডিস কমন রুমে বিক্ষোভ বেশী হবার কারণ আর কিছু নয় কেবল মেয়েদের ভ্যানিটি হার্ট হলে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে হার্টলেস হয় অনেক বেশী এই প্রকৃতি-সত্য কারণ ছাড়া। ছেলেরা প্রথমটা গর্জায় বেশী; কিন্তু বর্ষায় সে পরিমাণে অনেক কম। প্রায়ই ভুলে যায় এবং মুখ দেখতে না চাওয়া শত্রুর সঙ্গে জীবনের মতো ঝগড়া হয়ে যাবার কয়েক দিনের মধ্যে তো সুনির্ঘাৎ, কখনও কখনও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবাব হ্যা-হ্যা করতে দেখা যায় সমান গলায় যেমন তারস্বরে বিবাদোন্মত্ত হতে শোনা গিয়ে থাকবে কিছুদিন অথবা কিছুক্ষণ আগেই। মেয়েরা কিন্তু ভোলে না; তারা মনে রাখে। গর্ভে সন্তানের মতো, অন্তরে প্রতিশোধ-স্পৃহাকে তারা লালন করে। সন্তানকে ম্যাক্সিমাম দশমাস দশদিন। [গাইনোকোলাজিষ্টের হিসেবে অবশ্য ন'মাস দশ দিন]; কিন্তু প্রতিহিংসাকে নারিস করে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। এবং নিজেব যে হাল হলে পুরুষ বলেঃ শত্রুর যেন এমন না হয়, মেয়েবা তেমন হলেও প্রার্থনা করে আমার একটা চোখ নিয়ে নাও কিন্তু শত্রুকে সম্পূর্ণ অন্ধ কর দুঃখীর ভগবান।

রতনলাল মুন্সীর সঙ্গে ডালিয়াব এই সান্নিধ্যের উত্তাপ সহ্য করতে পারেনি লেডিস কমন রুম। মনে মনে তাদের প্রত্যেকেরই রুডল্‌ফ্ ভ্যালেন্টিনো ছিলো ওই এক রতনলাল। বতনলালেব সঙ্গে ডালিয়ার সজ্মর্ষই তারা কেউ ভালো চোখে দেখেনি। কাবণ তাবা জানতো রাগ হলেই অনিবার্য হবে পরাজয়: রাগ থেকে গড়াবে সাজ্যাতিক অনুরাগে দুজনেই। এবং তাদের হাইপথেসিস মিথ্যে নয় যে কয়েকদিনের মধ্যেই ে া বাঙলা বইতে ছাপার ভুল থাকতেই হবেব মতোই সুনিশ্চিত

প্রমাণ হয়ে গেলো। মেয়েরা কেউ কাউকে মুখে সে কথা বলল না বটে তবে মনে মনে জ্বলতে লাগলো হু হু করে। তাদের সমবেত নিকুম্ভিলা যজ্ঞে ফল ফলতে দেরী হল না। ডালিয়া রতনলালের মধ্যে ঝড়, বজ্রপাত, এবং ধারাবর্ষণের আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘদূতের বদলে তারা দেখা দিলো শয়তানের দূতরূপে। ছেলেদের সঙ্গে প্রথম আন্তরিক ঐকতানে সরব হলো তারা নারদ-নারদ ডাকে।

বেশীবার ডাকতে হলো না অবশ্যই; মেঘ না ডাকতেই পৃথিবীর ছপ্পড় ফুঁড়ে জল নামল চাতকের হাঁ-এ। রতনলালের মতো আলট্রাস্মার্ট বালকের পেটথেকে যে একটুখানি টোকা দিতেই ফেটে যাওয়া ফোড়ার পুঁজের মতো গলগল করে সব অভিযোগ, পুঞ্জীভূত অভিমান বহুদিনের জমানো ব্যথার কথারা বেরিয়ে আসবে সকালের আলো এসে পৌঁছতে না পৌঁছতে খোপের মধ্যে থেকে ঝাঁকের পর ঝাঁক পায়রার মতো কে জানতো। এবং একটা নতুন অভিজ্ঞতারও সঞ্চয় হলো; লোকে বলে মেয়েদের পেটেই কথা থাকে না,– কথাটা ঠিক নয়। ঠিক জায়গায় ধাক্কা দিতে জানলে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী উদ্ধার করে। মেয়েরা এখনও একসঙ্গে পাঁচটার বেশী সন্তান বিইয়েছে বলে শোনা যায় নি; তাও তার মধ্যে প্রায়ই সব কটি জ্যান্ত যে তা নয়। রতনলাল ডে টু ডে বিশ্বাসঘাতকার ডিটেলড্ রিপোর্ট দিল; সুদক্ষ নার্সের তৈরী জ্বরের চার্টের চেয়েও কারেক্ট গ্রাফ এঁকে দিলো মুহূর্তে; ডালিয়ার ঘৃণ্য কারেক্টারের। আমাদের অবস্থা হলো কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়লে যেমন হয় তার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী মর্মান্তিকই বটে।

একচুয়ালি এতটা আমরা নিশ্চয়ই কেউ আশা করিনি তো বটেই; চাইওনি সম্ভবত। আমি এ্যাটলিষ্ট জেনুইনলি বলতে পারি যে এই হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে খেলাখেলা করে যার আরম্ভ তার এমন কাদা ছোড়াছুড়ির নোংরা এবং অশ্রুসজল পরিণতি ওয়াস ফার্দেষ্ট ফ্রম মাই থটস। আমি বস্তুত একটু লজ্জা পাচ্ছিলাম। বানানো গল্প বলে দুটি ছেলে মেয়ের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছেদ ঘটাতে গিয়ে এমন বিয়োগান্ত নাটাসূত্রে জড়ালাম নিজেকে যে এখন যত জট খুলতে যাব ততই জটিল

করে ভুলব যে গ্রন্থি এতে সন্দেহের অবকাশ আর অল্পই ছিলো অথবা একেবারেই ছিলো না। এখন আর মাথায় এটুকু পর্যন্ত আসছে না আমি কেন এই বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে নিজেকে কতগুলো অর্বাচীনের হাতে শানানো অস্ত্রের মতো তুলে দিলাম।

আমার মতো আরেকজনও আন্তরিক দুঃখ পাচ্ছিলো; পামেলা মল্লিক। ডালিয়াও, তার কাছে জানা গেল, রতনলাল সম্পর্কে এমন সব রিভিলেশন করে চলেছে যা লেডিস কমন রুমে মেয়েদের মধ্যেও আলোচনার আযোগ্য, কিন্তু ততক্ষণে পুরাণো হাওড়ার ব্রীজের তলা দিয়ে অনেক জল বয়ে এবং অনেক বেশী ঘোলা হয়ে গেছে। পামেলার সঙ্গে রতনের ছবি তোলা হয়েছে রতনের অজান্তে এবং সেছবির একগাদা প্রিন্ট চাঁদার পয়সায় তুলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কলেজময় অন্যপক্ষে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পামেলার ফার্স্ট কাজনকে ডালিয়ার সঙ্গে, ডালিয়াকে লেখা তার রঙীন চিঠি রতনের বইয়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে ঢুকিয়ে।

ঠিক এমনই সময়ে পামেলা আমার কাছে এল, এসে বলল: "ার নয়। আমিও ডিটো দিলাম It's high time that we should intervene! পামেলা যা খবর এনেছে তা ভয়াবহ। ডালিয়া এবং রতনের ভবিষ্যৎ বিবাহের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনায় তখন দুবাড়ীর অন্দর মহল আনাগোনা করছে। এদিকে রতন আর ডালিয়ার পরস্পরে স্ক্যাণ্ডালমংগারিংএ কান পাতা যায় না আর। এবং ইমিডিয়েটলি বন্ধ করতে না পারলে এই অনপ্লট শেষ পর্যন্ত দুটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্মান ধূলোয় লুটোবে ত বটেই, কোর্ট কাছারী পর্যন্ত গড়াতে যে না পারে এমন নয়। পামেলা আরও বলল: But boys seem to be still adamant। আমি রিটর্ট করলাম এই বলে যে: Why blame boys alone, fair sex too are not behaving as yet? are they? চুপ করে রইল পামেলা। আমরা ঠিক করলাম কাউকে না জানিয়ে আমরা দুজনেই যাব, প্রথমে রতনের কাছে তারপর ডালিয়ার কাছে।

ডালিয়ার কাছে শেষ পর্যন্ত অবশ্য যেতে হয়নি আমাদের কাউকেই ; তার আগেই, রতনের ওখানেই এ নাট্যের যবনিকা পতন সুনিশ্চিত ঘটে গেছিলো। রতনের বাড়ীতে পামেলা এবং আমার গতিবিধি সর্বত্রই অবাধ ছিলো সেদিন। নীচের তলায় রতনের মা বললেন : রতন তিনতলায় তার নিজের ঘরে,—চলে যাও ; চা পাঠিয়ে দিচ্ছি—। তেতলায় লাল মখমলের পর্দা ফেলা রতনের ঘরে ঢুকতে গিয়ে ঠেকে গেলাম আমরা ; ল্যাভাটরীর মধ্যে, কেউ দেখেনি মনে করে, প্রশ্নের উত্তরটা বই দেখে ভাল করে ঝালিয়ে নিয়ে বেরুবার মুহূর্তে গার্ডকে দরজার বাইরে দেখে যেমন চমকে থেমে যায় পরীক্ষার্থীর পদ যুগল তেমনই, তার চেয়েও বেশী থমকে দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হলাম চলচ্ছক্তিরহিত আমরা দুজন ; পামেলা আর আমি।

ভলকে ভলকে ঘরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হাসি হাসছে রতনলাল মুন্সী ; হাসির বেগ সম্পূর্ণ দমন করতে পারার আগেই রতনের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে শুনতে পেলাম : এখন যদি কলেজের কেউ আমাদের দুজনকে দেখতে পায় এমন জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি তাহলে তোমাকে কি করবে জানিনা.

—আমার একখানা হাড়ও আর আস্ত রাখবে না, জানি—

রতনের কথার উত্তরে যে মেয়েলী গলা শুনলাম আমাদের কলেজে তার চেয়ে চেনা গলা ছিলো না সেদিন আর ; ডালিয়া কিন্তু সেদিন রতনের মতো সাজ্ঘাতিক ফানি কিছুর সন্ধান পায়নি তাদের দুজনের এই আপোষে ঝগড়ার অভিনয় করার ইনজিনিয়াস আইডিয়ার মধ্যে। ঈষৎ নিরাসক্ত ডালিয়া জিজ্ঞেস করে : কিন্তু এই কাণ্ডটা এতদিন ধরে ঘটিয়ে লাভ কি হলো,—সেইটেই আমি বুঝতে পারছি না—

বলো কি ? লাভ হলো না ?—রতন লাফিয়ে ওঠে বাঘের মতো ডালিয়ার নীরিহ প্রশ্নের মেষশাবকের ওপর : বন্ধু চেনা গেল—

মানে ?

সোজা! এর জন্যে তোমার মানে বই দরকার হচ্ছে না ; প্রায় প্রত্যেকেই যারা আমাদের দুজনেরই জন্যে প্রাণ দিতে পারার পোজ করত এতকাল তাদের পারপোজ বোঝা গেল এই প্যাঁচ কষতেই ;

তারা সবাই তোমার কাছে আমার নামে এবং আমার কাছে তোমার নামে বলে আমাদের কিছু করতে না পারলেও, নিজেদের যথেষ্ট এক্সপোজ করে ফেলেছে, ভালর মধ্যে এই যে বেচারারা এখনও জানে না বেচারা কি করেছে ; ভগবান যেন বেচারাদের ক্ষমা করেন— ফিরবার জন্যে সিঁড়ি মুখো ঘুরেছি পামেলা আর আমি, সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছেন ততক্ষণে রতনের মা। আমাদের দেখে সস্নেহ তিরস্কারে বলেন : একি তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে যাও ; ওমা,—ঘরে তো ডালিয়া,—তোমরা ভেবেছ বুঝি মাণ্যিগণ্যি কেউ ?

এরপর আমরা সেদিন সেই প্রথম এবং সেই শেষ রতনের মায়ের কথা অগ্রাহ্য করে হুড়মুড় করে নেমে সরে পড়েছিলাম সীন থেকে না মায়ের চীৎকারে ঘর থেকে সহসা-নিষ্ক্রান্ত রতনের হাতে ব্যাশ ধরা পড়ে গিয়েছিলাম এখন আর তা একবিন্দু মনে নেই। পামেলা এখন কোথায় জানি না ; তবে এতদিনে সে মা হয়ে নয় শুধু, ঠাকুমা হয়েও একপাল নাতি-নাতনী সমভিব্যাহারে সুখে ঘর করছে কোথাও নিশ্চয়ই। আর আমার সরকারী দাসত্ব চলছে বর্তমানে দ্বিতীয় এক্সটেনশানের ভঙ্গুর চাকায় ভর দিয়ে। অতএব সেসব কথা আজ, আরেকবার মনে করে নিজের মনে হাসা ছাড়া আব কি কাজে লাগবে জানি না।

কলেজের সেই সব নানা রঙের দিন মিলিয়ে গেছে সে অনেককাল ; তারই সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছিলো সবচেয়ে চেনা মুখ দুজনের : রতন আর ডালিয়ার। আমরা সবাই কেউ চাকরীর চাকার তলায় পড়ে অথবা ব্যবসার রজতচক্রের ওপরে বসে বিস্মৃত হয়েছিলাম পরস্পরকে বতনলাল মুন্সী প্রথম যুগের ভারতীয় চিত্র পরিচালক যারা তাদেরই একজন হিসেবে নাম করেছিল ; তবে সেদিন আজকের মতো 'মা'-ডাকার পরেই সিনেমা ডাকত না ; তাই রতনলাল নিয়ে মাতামাতি করার মতো সময় অথবা সখ ছিলো না আমাদেরও ; তার কলেজ সতীর্থদের কারুরই। তবে তার দুএকখানা ছবি আমরা

দেখেছিলাম এবং কাগজেও কখনও সখনও তার কাজকর্মের বিজ্ঞাপন নিশ্চয়ই দেখে থাকব কেউ কেউ। ব্যস ; ওই পর্যন্তই ! Thus far এণ্ড No further ছিলো সেই সম্পর্ক।

এই সময়ের কয়েক বছরের মধ্যেই নির্মেঘ নীলাকাশ থেকে বজ্রপাত হলো আলীপুরের আবহাওয়া বিশারদদের বিনা অনুমতিতেই। রতনলাল মুন্সীর নাম আবার দেখা দিলো প্রায় বিস্মৃতির গহ্বর থেকে, মাটির তল থেকে মহেঞ্জোদারোর সূর্য্যালোকে আত্মপ্রকাশ করার খবরের চেয়েও দগদগে কালো কাঠের টাইপে খবর কাগজের এককোণে নয়, প্রথম পাতার প্রথমেই। চিত্র পরিচালক হিসেবে নয় ; হত্যার দায়ে অভিযুক্ত আসামীর ভূমিকায়। প্রথম খবরটা কতবার পড়েছিলাম ; রতনের ছবির দিকে তাকিয়ে কতবার চোখ রগড়ে ভালো করে মেলাবার করেছিলাম চেষ্টা,—আজ আর তা মনে থাকার কথা নয়।

হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলো চারটে নাম। রতনলাল মুন্সী ছিলো আসামীর ভূমিকায়, হত্যা করবার উত্তেজনা জুগিয়েছিলো যে তার নাম গ্লোরিয়া মুন্সী [বিবাহের পূর্বে ম্যাকডোনাল্‌ড্‌] ; প্রধান সাক্ষী : ডালিয়া, এবং নিহত ব্যক্তির নাম : রঞ্জন ওরফে নিরঞ্জন রায়।

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের এই মামলার দুঃখকর স্মৃতি নিশ্চয়ই ধূসর পাণ্ডুলিপিতে পরিণত হয়েছে অনেককাল। এখন নিশ্চয়ই প্রায় সকলের কাছেই তা হয় মৃত নয় বিস্মৃত। সেই পাণ্ডুলিপি আজ আবার নতুন করে ওলটাতে বসার কারণ হচ্ছে একটুখানি ঝালিয়ে না নিলে সেই মুন্সী-মামলা নেপথ্য ঘটনা অনুধাবন করা শক্ত হবে সকলের পক্ষেই। অবশ্য একথা ঠিক যে প্রকাশ্য আদালতে দিনের আলো দেখতে পেয়েছিল যা তার চেয়ে আসল ঘটনার অনেকখানিই শেষ পর্যন্ত রহস্যের বিবর থেকে বেরোয়ই নি আর কোনও দিন। সেই অন্তরালবর্তী ঘটনা যা এই চরম দুর্ঘটনার সত্যিকারের জনক তাকে অবারিত করা ছাড়া আমার এই পুরাণো কাহিনী পুনরাবৃত্তির আর কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। রতনলালের

মামলার ওপর যবনিকা পড়বার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত, অন্তরঙ্গ কারুর মৃত্যুর পর তার ফেলে যাওয়া ব্যবহৃত জিনিষপত্তর, তার হাসি, ঠাট্টা, রাগ, মান-অভিমানেব অতি সামান্য টুকরো নিয়েও অসামান্য উৎসাহের সঙ্গে আমরা যেমন মনে মনে খেলা করি, তেমনই সুদীর্ঘকাল মামলায় রতনের বিপক্ষে দাঁড় করিয়েছি যে রতনলালকে একদা নিঃশ্বাসের চেয়েও নিশ্চয় করে জানতাম তাকেই ; দাঁড় করিয়ে মনে মনে মাপবার চেষ্টা কবেছি, কোনটা আসল আর কোনটা সাজানো।

মামলা চলতে চলতেই মামলার নেপথ্যের নাটকের একেবারে মধ্যস্থলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ; রতনের মেম-বউ গ্লোরিয়ার এবং নিহত রঞ্জনের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেছি প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যেমন পাগলের মতো ভূগর্ভ খনন করে বিস্ময়কর নতুন কোনও আবিষ্কারের নেশায়, ডালিয়ার সঙ্গে সুর কেটে যাওয়া বন্ধুত্বের বেহালায় নতুন করে যোজনা করেছি ঘনিষ্ঠতার ছিন্ন তার। দিনে দিনে স্পষ্ট হয়েছে এই মামলায় যার অতি অল্পই শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হতে পেরেছে মহামান্য আদালতে, যার অনেকখানিই এখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত রয়ে গেছে জগৎ সংসারেই সকলের কাছেই। অনেকদিন অব্দি, এই মামলা খতম হয়ে, লোকের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যাবারও অনেকদিন পর, আসল সত্য জানার গুরুভার বহন করেছি একা একা ; কিন্তু আর নয়। আর তাকে, আমার একার পক্ষে, সেই দুঃসহ, দুরন্ত যন্ত্রনাকে, সহ্য করা ক্ষমতাব বাইবে ; আমি সেই ক্ষতস্থানকে উন্মুক্ত করে রেহাই পেতে চাই চিরকালের জন্যে রতন, গ্লোরিয়া, ডালিয়া এবং রঞ্জনের গোপন কথা জানার পাপের শাস্তির হাত থেকে ; প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই সব কথা সকলের কাছে বলে।

রতনলালের নেপথ্য জীবনের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করতে গিয়েই একটি বহু পুরাতন সত্য আমি নতুন করে আবিষ্কার কবেছি। আমি জেনেছি যে আদালতের জটিলতম মামলার চেয়েও জীবনের সামান্য মামলার ভটেও অনেক বেশী গ্রন্থি। আমি আরও জেনেছি যে নিজেকে ছাড়া অন্য আর যে কাউকে অভিযুক্ত করা যেমন সহজ তেমনই সবচেয়ে

জঘণ্য অপরাধ-প্রমাণিত-আসামারও দৃঢ় বিশ্বাস যে অনুরূপ অবস্থায় পড়লে, সে যা করেছে আর যে কেউ তা তো করতোই ; সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই আরও জঘণ্যতর পৈশাচিক ক্রিয়ায় কলঙ্কিত করতে পারত নিজের এবং সমাজের সর্বাঙ্গ। সব ক্রাইমেরই সব দেশে সব সময়েই সব চেয়ে সুবিধের যে এলিবাই, ক্রিচার অফ সার্কামস্ট্যান্সেস,—সেও প্রত্যেক লোকেই নিজের ক্ষেত্রে যেমন স্পষ্ট দেখতে পায়, অন্যের ক্ষেত্রে ঠিক ততখানিই অগ্রাহ্য করে।

রতনলালের মামলা চলা কালীনই আমি শুনেছি ; চায়ের দোকান থেকে লেজারাসে´ সাজানো ড্রয়িংরুম তক সর্বত্র। শুনেছি যে রতনলাল মুন্সী রঞ্জনকে মেরে মানুষের কাজ করেছে ; শুনেছি যে রতনের মেমসাহেব বিয়েই এর কারণ,—কারণ ওদের দেশের মেয়েরা এক পুরুষ নিয়ে বেশীদিন কাটাতে অভ্যস্ত নয় ; এও শুনেছি যে রতনের রঞ্জনের সঙ্গে এক সঙ্গেই গ্লোরিয়াকেও গুলি করা উচিত ছিলো ; অসতী সেই পিশাচীকে। শুধু এই সমস্ত ঘটনার কলকাঠি যে আড়াল থেকে আগাগোড়া স্বহস্তে চেলেছে, তার না কেভাবে, না এগেন্সেটে শুনেছি একটি কথাও। এই মামলায় কাটা সৈনিকের চেয়ে বড় রোল পায়নি ডালিয়া।

অথচ রঞ্জন, রতনের সংসার ভেঙ্গেছে বলে নিহত হওয়াই যার নির্মম একমাত্র যোগ্যতা, সেই রঞ্জনের জীবনের নেপথ্যইতিহাস অবগত হবার পর রঞ্জনকে দায়ী করা সমস্ত দুর্ঘটনার জন্যে, আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। রঞ্জন রায় তার আদি এবং অকৃত্রিম নাম নয় ; আসল নাম ছিলো,—নিরঞ্জন রায়। নিজের হাতে অথবা বন্ধুদের হাতে ছাঁটা গেছিল এই 'নি' সে তথ্য এখানে অপ্রয়োজনীয় ; তার নিহত হবার সুদূর অতীতেই নিরঞ্জন রায় রঞ্জন রায় হয় যেমন তেমনই তার যৌবনের আদিপর্বে এমন একটা নাটক ঘটে যায় যে এই বিয়োগান্ত অন্তিম যে অনিবার্য দেখা দেবে দেওয়ালের লেখা পড়তে পারলে কোনও বিচক্ষণ চোখ সেদিনই তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত যে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প অথবা একেবারেই নেই।

রতনলালের মামলায় প্রধান যে চারজন তারা সকলেই হ্যাণ্ডসাম চেহারা; রঞ্জন রায়ও। রতনের মতো অত লম্বা না হলেও প্রায় ছ'ফিট,—সে-ও; মুখটা মামলার কিছু আগে থেকে একটু মেদের কারণে গোলাকৃতি ধারণ করতে চলেছিল বটে তবুও খাড়া নাক, বড চোখ, প্রায় পাখীর ডানাব মতো এক জোড়া ভুরু, কুঞ্চিত ঘন কালো কেশদামে বেশ মজবুত একটা মনোহাবিত্ব দিয়েছিল যা চোখে পড়া মাত্রবই মেয়েবা না মজুক, অগ্রাহ্য কবা অসম্ভব ছিলো তাকে। অসম্ভব স্মার্ট বয বঞ্জন বায় অবশ্য নাবী মৃগযায় কেবলমাত্র চেহাবাকে কোনও সময়েই সব চেযে বড মূলধন মনে করতে পাবে নি। টাকা, চাতুবী এবং, 'There is nothing unfair in love and war',—এই অমোচনীয প্রত্যয, মেযেদেব সঙ্গে বজ্জাতিতে তাব মববাব আগে পর্যন্ত একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিলো। বস্তুত মামলা চলা কালীন খববকাগজে গসিপ থেকে জানা যায এই হ্যাণ্ডসাম ড্যাশিং দিবনেয়াবেব জীবনই ছিলো তাব বাণী। সে বাণী হচ্ছে সমাজের পক্ষে ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী, বঞ্জন বায় প্রায় ওপনলিই নাকি বলতো যে এমন কোনও মেযে নেই, মাতা, বধূ, কন্যা নয এমন উর্বশী থেকে মাতা বধূ কন্যা পর্যন্ত এমন কেউ নেই যাকে না কবায়ত্ত করা যায় বেগ, ববো অথবা স্টিল,—প্রিন্সিপলে। এই বিকৃত, অসুস্থ অসামাজিক মনোবৃত্তিব পেছনে যে কাঁকনপরা হাতের প্রত্যাখ্যানেব ইতিহাস আছে এখানে তাব পুনরুদ্ধার ছাডা এই মামলাব জটিলতাব চেযেও অনেক জটিলতব চবিত্রদেব একটিকে অন্তত অনুধাবন কবা অসম্ভব হবে, কবলেও যে হবে এমন কথা অবশ্য হলফ করে বলা আবও সম্ভব নয়, তবুও।

যখনকার কথা বলতে যাচ্ছি তখনও নিবঞ্জন বায় রঞ্জন বায় হয়নি।

ইনকামট্যাক্সে কাজ কবত সেদিন নিবঞ্জন, মাস গেলে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা হাতে পেত। সেদিনকাব হিসেবে এক মুঠো টাকা; মামাব হোটেলে ফ্রি লজিং এবং ফুডিং-এব সৌভাগ্য অবিবাহিত নিবঞ্জনেব হিসেবে একরাশ টাকা। ফুর্তিব প্রাণ, গড়ের মাঠ। আজকে

যেসব দিনের কথা রূপকথার মতো মনে হয় সেই কলকাতায় নিরঞ্জন রায় অতগুলো টাকা নিয়ে কি করবে ভেবে পেত না। মামী বলতেন, জমাতে; মামা বলতেন, খরচা করে ফেলতে। সিনেমা, রেস্তোরাঁয় খাওয়া এবং সিগারেট খাওয়া একশো পঁয়তাল্লিশ টাকার পক্ষে এতই অল্প ব্যয়সাপেক্ষ ছিলো যে নিরঞ্জনেব কাছ থেকে তার বন্ধুরা, সময়ে-অসময়ে ধার নিয়ে ফেরৎ দিতে ভুলে না গেলে মাসের শেষে উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়ে রীতিমতো বিপদে পড়তে হতো মেজর বোসের একমাত্র ভাগনে নিরঞ্জন রায়কে। কিন্তু ধার নিয়ে উদ্ধার করার ব্যাপারে সবচেয়ে সাহায্য কবেছিলেন যিনি তিনি মাস গেলে মাইনে পেতেন সাতশো টাকা. নিবঞ্জনেব কর্মস্থলেই অনেক ওপরে, প্রায় মাথা ববাবব কাজ কবতেন। নিরঞ্জনের কাছে চাইবার সময়ে প্রত্যেক-বারই মনে বাখতেন যে নিবঞ্জন একশো পঁয়তাল্লিশ টাকার ইনস্পেক্টার: তাই হাত পাততে হলেই নিরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করতেন: 'কিছু খুচরো হবে?' ভদ্রলোক নেটিভ খ্রীস্টান. এ্যাংলো বললে মারাত্মক রেগে যেতেন: ইণ্ডিয়ান বললে এত খুশী যে আপনার কাছে, কিছু খুচরো হবে কি না, বিস্মৃত হতেন জিজ্ঞেস করতে নিদারুণ প্রয়োজনের দুঃসময়েও। ভদ্রলোকেব নাম, স্যামুয়েল শ্রীরাম ড্যাটন। দত্ত থেকে ডাটা; ডাটা থেকে ডাটন। দু'পুরুষ আগেই এর বংশে এমন একজন প্রতিভাবান পুরুষ এসেছিলেন যাঁর প্রাতঃস্মরণীয় নাম বৎসরান্তে একবার নিতে আজও ভঙ্গবঙ্গ জোড়া লাগে। স্যামুয়েল শ্রীরাম ড্যাটন তাঁর যোগ্য অধস্তন পুরুষ না হয়ে সাধারণ ভদ্রলোক হিসেবেও যদি চলে যেতে পাবতেন তাহলেও সেই কীর্তিমান পূর্বপুরুষের নাম এখানে নিতে আপত্তি ছিলো না; কিন্তু চাকরী ছেড়ে যাবার আগে স্যামুয়েল শ্রীরাম নিজেও এক কীর্তি করে বসলেন; পেনসনের যখন আর এক বছর বাকী তখন সরকারী গেজেটেড চেয়ার থেকে রিমুভ্‌ড্‌ হলেন ভদ্রলোক; ঘুঁস নেবার অপরাধে।

স্যামুয়েল ড্যাটন ঘুঁস নিতেন চাকরীর একটু উঁচু ধাপে পাকা হয়ে বসবার অনতিবিলম্বেই; পাণ্ডা যেমন ভাবে প্রণামী নেয় প্রায় সেইরকম

খোলাখুলি ভাবেই। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশের খানা ঘরেই যেমন বিল তৎক্ষণাৎ না দিলেও চলে যায় কিন্তু প্লেটপরিবেষককে টিপ্‌স দিতেই হয়, তেমনই ড্যাটনকে দিয়ে কিছু করাতে হলে কিছু ছাড়তে হবে এছিলো ইউক্লিডের হাইপথেসিস। খোলাখুলি নিতেন বলে কারবাবে লোকেদের সাঙ্ঘাতিক প্রিয় ছিলেন স্যামুয়েল শ্রীরাম, অফিসেও অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন কারণ অন্যদেরও ভাগ দিতেন ডাকাতিব। তাঁব চেয়ে যাঁরা জুনিয়ার তাঁদের কাজে ত্রুটি ধরতেন কদাচ। বরং তাঁব নিজেব কাজ তাদের করতে দিতেন এই বলে যে জুনিয়াবদের স্বাধীনতা না দিলে তাবা বড় অফিসার হবে কি করে। সব অফিসেই অফিসাররা সই মারার জন্যে যে টাকা নেন তার সিকির সিকি টাকায় কেরানীদেব করে দিতে হয় স্বাক্ষরের উপযুক্ত কাগজ-পত্তব তৈবী করাব দুঃসহ পবিশ্রমেব কাজ; ফলে বড়রা ফাইল চাপালে না বলতে পারে না বটে 'মাছিমাবা-বা', তবে মনে মনে খুশী হয় না যে মোটেই, তা বলা বাহুল্য। ওই একই উদ্দেশ্যে চালান করে নিজের করণীয় পরেব কবে শ্রীযুক্ত স্যামুয়েল শ্রীরাম, শুধু তার প্রসেসটা এতই আলাদা ধবণেব যে ধূর্ত শৃগালকে খরগোষেবা পবিবাবেব অকৃত্রিম সুহৃদজ্ঞানে সুড়সুড় কবে বেরিয়ে আসে; পাইডপাইপারের বাঁশীতে যেমন সাড়া দিতে পিলপিল করে নির্গত হয় মূষিকেরা। ফাইলটা দেবাব সময় স্যামুয়েল ওই যে জুড়ে দেন· ইনটাবফেয়ারেন্স পছন্দ করি না যেমন তেমনই পছন্দ কবি যে তোমরা কাজেব এবং অভিজ্ঞতাব সুযোগ পাবে; স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের পথ না পেলে সাবাজীবন কেবানীই থেকে যেতে হবে তোমাদের; কিন্তু তা হবে কেন? কাজ দেখিয়ে বড় হতে পারো না যে তোমরা সে তো আমাদের দোষ; কাজ না পেলে কাজ দেখাবে কি? তারপর স্যামুয়েল আরও ঘনিষ্ঠ হন মেষশাবকেবও: এই যে প্লে কর তোমরা ক্লাবে,—রোল না পেলে এমন কেউ আছ যে পরিচয় দিতে পার নিজের মেরিটের? বল আছ কেউ এমন?

যাকে কথাগুলো বলা তার হয়ে গেছে ততক্ষণে ; সেইবারই অফিস প্লেতে তার যে রোলটি করার ইচ্ছে সে রোলটি তাকে দেওয়া যায়নি ; তার বদলে রোলটি যে করে বাড়তি সমস্ত খরচা দিতে সে রাজি হওয়ায় টুঁশব্দ করা পর্য্যন্ত সম্ভব হয়নি আর কারুর পক্ষেই। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিল স্যামুয়েল শ্রীরাম ; একেবারে আঁতে ঘা দিয়েছিলো স্যামুয়েলের কোপ।

নিরঞ্জন রায় অফিসে ঢুকবার অল্প কয়েকদিন পরেই স্যামুয়েল শ্রীরাম ডাটন চাকরী থেকে রিমুভড হয়। নিরঞ্জনের সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয়ই হয়েছিলো ডাটনের সঙ্গে। একদিন গেলো স্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা করতে এলিয়ট রোডে। গলির মধ্যে পুরানো কলকাতার মহল বাড়ী। ভেতরের মহল আর সদরের মধ্যে রীতিমতো বড়ো উঠোন ; দ্বিতীয় মহলের ড্রয়িংরুমে বসে স্যামুয়েলের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে নিরঞ্জন ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুবিয়ে দেখতে লাগলো ঘরখানাকে ; ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করতে এসে মেয়েকে যেমন খুঁটিয়ে দেখে পাত্রপক্ষ। ঘর-জোড়া কার্পেট কিন্তু ধুলোয় ধুলো। পুবাণো গোল শ্বেতপাথরের টেবল। ইজিচেয়ার ; এমনই সাধাবণ কাঠের চেয়ার ; বেঞ্চি। বড় দেওয়াল ঘড়ি ; সাড়ে চারটের সময়ে নটা বাজলো। ফ্লাওয়ার ভাসে শুকনো ব্ল্যাক প্রিন্স। ঘরের মধ্যে প্রায় মুছে আসা ডাটনের ইতিহাস বিখ্যাত পিতামহের তৈলচিত্র ; অন্ধকার ঘরে নিরীক্ষণ করে না দেখলে সেই অতিপরিচিত মুখও চেনা শক্ত ; শুধু সোনালী ফ্রেমটায় বোঝা যায় কোনও এককালে ক্যানভাসের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিলেন যিনি তিনি বাঙলা দেশের ইতিহাসে যেমন এই ক্যানভ্যাসেও তেমনই এমন ছাপ রেখে গেছেন দিনে দিনে তা অনুজ্জ্বল হতে হতেও এখনও পুরো মুছে যায়নি ; বেলা বড় দিনের সূর্য যেমন সন্ধ্যে অনেক্ষণ উত্তীর্ণ হবার পরও, যাই-যাই করেও, তখনও যেতে চায় না, তেমনই।

নিরঞ্জন যতটা অভ্যর্থনা পাবে ভেবেছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী খাতির পেলো স্যামুয়েলের কাছে। স্যামুয়েল সত্যি খুশী হয়েছিলেন। অফিস থেকে রিম্যুভড হবার পর আর একজন সহকর্মীও, নীচের অথবা

ওপরের তার সঙ্গে দেখা করতে আসে না। একজন অন্তত যে বাড়ী বয়ে কুশল বিনিময় করতে এসেছে এর জন্যে একটু আবেগই অনুভব করলো স্যামুয়েল শ্রীরাম ডাটন। করমর্দন, কুশল বিনিময়ের পর চায়ের অর্ডার করে এসে হুইস্কির বোতল নিয়ে বসলো স্যামুয়েল। বরাবরই খোলামেলা লোক সে। সেদিন এপ্রিলের শেষ রবিবারের পড়ন্ত সূর্য্যালোকে মালের মুখে নিজের অতীত জীবনের মুখআঁটা বইয়ের আদ্যন্ত মেলে ধরলো নিরঞ্জনের সামনে উপযাচক হয়ে। মেঘ না চাইতে জল হলে যে তৃষ্ণার্ত্ত চাতক কৃতজ্ঞ হয় বরুণদেবের ওপর সে-ও রীতিমতো সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে জল যদি প্লাবনে গড়ায়। নিরঞ্জন রায়ও ভাবী বিপর্যস্ত হলো ; সে বুঝলো স্যামুয়েল কি বলছে স্যামুয়েল জানে না। যদিও নিরঞ্জনের মুখ থেকে প্রদোষালোকে পানোন্মত্ত এই কনফেশান দ্বিতীয় কাণ পর্যন্ত গড়াবেনা, তাই রক্ষে, তবুও একেক সময়ে এতদূব পেট আলগা হতে আবন্ত করলো বেসামাল বক্তা, যে মনে মনে স্থানত্যাগ কবতে পারলে বেঁচে যেত যে নিরঞ্জন একথা যতবার উচ্চাবণ কবলো ততবারই যেন টের পেয়ে গেল স্যামুয়েল ; আর ততবাবই টেনে টেনে বসালো নিরঞ্জনকে চায়ের পর চায়ে। সে যে পিপের পর পিপে হুইস্কি ওড়ালেও বেসামাল হয়না কখনও একগাদা স্ল্যাং শপথেব উপব তারই সুনিশ্চিত প্রমাণ ঘোষণা কবলো। এবং সে যে এখনও একটি কথাও বেসামাল হয়ে অতিরঞ্জন করছে না শেষ পর্যন্ত নিরঞ্জনকে তার মৌখিক স্বীকৃতি জানিয়ে তবেই আপাত নিরস্ত করা সম্ভব হলো ডাটনকে। মুখে নিরস্ত কবতে অবশ্য অসুবিধে হলো না বিশেষ কাবণ নিরঞ্জন ততক্ষণে স্থিরনিশ্চয় হয়েছে যে স্যামুয়েল যতদিন যত পরিমাণ মালই খাক স্যামুয়েল তাদেবই একজন, বোতলের ছিপি খোলার আগে থেকেই মনের ছিপি যাদের ছিটকে যায়, অজান্তে নয়, জান্তেই।

স্যামুয়েলকে যে তাড়িয়েছে সে যে তদানীন্তন সবকারের প্রায় মাথার কাছ বরাবব একজনের অবৈধ সন্তান এই কথা স্যামুয়েলের মুখে উচ্চারিত হবার অপরাধেই এমনটা করেছে, সেকথা যেমন তেমনই

একথা জানাতেও তেমনই ভুললো না স্যামুয়েল শ্রীরাম যে চাকরী থেকে রিমুাভড হলেও সেই 'বেজন্মা' তার পেনশন বন্ধ করতে পারেনি পুরো ; টুথার্ড দিতে হয়েছে স্যাংকসন সরকারকে। তা থেকে অবশ্য ব্রেডেরই কেবল সংস্থান হয় অপুত্রক বিপত্নীক এই অভাগা স্যামুয়েলের ; বাটারের চাহিদা তাকে এখন নিজের চেষ্টায় অন্য জায়গা থেকে মেটাতে হয়। নিরঞ্জনের একটা বিষয় জানবার নিদারুণ কৌতূহল ছিলো ; কি ভাবে স্যামুয়েলের ওপর রিমুভ্যালের অর্ডার সার্ভড হয়। স্যামুয়েলকে সে বিষয়ে টোকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফোড়ায় ছুরি বসানো মাত্তর গলগল করে পুঁজ বেরিয়ে আসার মতো এককাড়ি কথা বেরিয়ে এলো হুড়মুড় করে।

স্যামুয়েলকে টেলিফোন ক'রে অন্য অফিস থেকে বড়োসাহেব। তাকে অফিসের পর সবাই চলে গেলে ঘরে থাকতে বলা হয়। স্যামু-য়েল বড় সাহেবকে জানায় যে সে সব জানে ; অতএব দেরী করার প্রয়োজন নেই : অশুভস্য শীঘ্রম। বড় সাহেব তাঁর জুনিয়ার দুজনকে সঙ্গে নিয়ে স্যামুয়েলের অফিসে আসেন অ-ঃপর গাড়ীতে বসে থাকেন বড়ো সাহেব ; ঘরে আসে দুই এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার। তারা রিমুভ্যাল অর্ডার সার্ভ করবার পর স্যামুয়েল তাদের নিজের সিগারেট কেস থেকে নেশা বাড়িয়ে দিতে ভোলেনি যে সেদিনও যেমন আজও তেমনই সেকথা নিরঞ্জনকে জানাতেও ভুল হয় না স্যামুয়েলের।

কথায় কথায় কত রাত হয়েছিলো খেয়াল ছিলো না নিরঞ্জনের। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই লাফিয়ে উঠলো সে ; কোনও অনুবোধ-উপরোধেই আর থাকতে রাজি হলো না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরুতে যাবে এমন সময় পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো যে তাকে দেখে আটকে গেল নিরঞ্জনের পা ; চিনির রসে আটকে যাওয়া মাছির মতো যতই তুলতে চেষ্টা করে পদযুগল ততই সেঁটে যায় আরও রসের আঠায় যেন। এক অঙ্গে এত রূপ নিয়ে কোনও মেয়ে এর আগে আর এত কাছে এসে দাঁড়ায়নি কখনও। ছাদ থেকে হাত বাড়াতেই যেমন মনে হয় পূর্ণিমার গোল চাঁদকে ছোঁওয়া যাবে অথচ যার দূরত্ব ঘোঁচেনা কিছুতেই তেমনই

স্যামুয়েলের ঘরের পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো যে সেই বিউটি, যত কাছে ততই দূরে যে একথাও অস্পষ্ট বিদ্যুতের মতো মাথায় খেলে গেলেও যাবার জন্যে তাড়ার কথা মনে রইল না নিরঞ্জনের। মনে করতে পারল না কিছুতেই সে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকার ইন্‌স্পেকটার; তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করলো এক মোহ; পরাস্ত করল তার সেই বুদ্ধিকে যে বুদ্ধির দিনের আলোয় তবু বোঝা শক্ত হতনা যে আকাশের চাঁদের চেয়েও আরও সুদূরপরাহত এর সান্নিধ্য তার মতো প্রায় কেরাণীর মাইনের চেয়ে একটু বেশির পক্ষে।

আত্মবিস্মৃত নিরঞ্জন রায় সেই আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইল গুপ্তধনের সামনে হঠাৎ উপস্থিত হবার দুঃসহ সৌভাগ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষুধাতুর দৃষ্টিতে। মৃত্যুঞ্জয়ের সারা জীবনের দুঃস্বপ্ন গুপ্তধনের তাল তাল সোনা; কিন্তু সন্ন্যাসীর অকৃপার যষ্ঠীতে ভর করে শেষ পর্যন্ত যখন মৃত্যুঞ্জয় গিয়ে উপস্থিত হলো সেই যক্ষপুরীতে; যখন তার সামনে অবারিত হলো এক অপরিমেয় ঐশ্বর্যের যক্ষভূমি তখন তার যে হাহাকার তার কারণ উপলব্ধি করা অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন না হলে নিতান্তই অসম্ভব। নিরঞ্জন রায় তার জীবনের সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে তীক্ষ্ণ, সব চেয়ে তীব্র, সবচেয়ে করুণ, সবচেয়ে আনন্দের, সবচেয়ে বেদনার এই মুহূর্তটির জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। মানুষের চোখ দুটো কেবল দেখবার জন্যে নয়; মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণার দুরন্ত প্রকাশের দুচোখ দিয়ে নিরঞ্জন লেহন করতে লাগল আগন্তুকের অপাঙ্গ। সরু একমুঠো কোমর, এক ফালি গঙ্গা যেমন ডায়মণ্ড হারবারের দরজায় পৌঁছে হঠাৎ পারাপার দেখতে না পাওয়া সমুদ্রব্যাপ্তিতে সুবিস্তৃত তেমনই সরু কটি থেকে উঠতে উঠতে নিরঞ্জনের চোখ বুকের কাছে এসে আর থৈ পেলো না; প্রশস্ত করিডরের মতো চওড়া কাঁধ; মরাল গ্রীবা। গলা আর বুকের মাঝখানে দুলছে নিঃশ্বাসের তালে তালে বুকের উঠা-পড়ার ছন্দে লালে সাদায় মেশানো দুর্মূল্য পাথরের হার। মরাল গ্রীবার ওপর বসানো তুলনাবিহীন ভাস্কর্যে তৈরী এক মেয়ের প্রোফিল। সেই মুখ বিশ্লেষণের বস্তু নয়; সে সৌন্দর্য বর্ণনার অতীত।

মুখের আর গায়ের রঙ লালে সাদায় মেশা গলার একছড়া মালার সঙ্গে ম্যাচ করা। হাঁমুখ বাচ্চার মতো একটুকু; পাতলা লাল ঠোঁট। চোখের দৃষ্টি সুদূরে ফিক্‌স্‌ড্‌; তার ওপর একজোড়া ধনুক হচ্ছে দুটি ভুরু। মাথার চুল সোনালী বব্‌ করা। সমস্ত শরীর থেকে উঠে আসছে এক আশ্চর্য সৌরভ। মৃগনাভির গন্ধে মাতাল সেই ঘরে বসন্তের এলোমেলো বাতাস পর্যন্ত যেন বেভুল বকছে। স্বপ্নের ঘোরে কতক্ষণ ছিলো নিরঞ্জন রায় বলা শক্ত; স্বপ্নের স্বর্গ থেকে ঘুম ভাঙার মর্ত্যে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল সে স্যামুয়েলের কথায়ঃ তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই,--আমার বন্ধু এবং কোলিগ, নিরঞ্জন রয়; আর রয়, She is my only niece, Dorothy। ডরোথী করমর্দন না করে দুহাত তুলে নমস্কার করল যখন তখনও ঘুম ভেঙ্গে গেলেও তন্দ্রাচ্ছন্ন নিরঞ্জন খেয়াল করল যে অভিবাদন জানাবার সুকর্তব্য প্রথম পালন করার প্রথা পুরুষের। তারপর ফিরে আসতে লাগলো সম্বিৎ; একটু একটু করে লজ্জা করতে লাগলো তার। কাঙালের বুভুক্ষার দৃষ্টিতে একজন মেয়ের দিকে জগৎসংসার ভুলে তাকাবার দুর্ণিবার অসহায়তা ফুটে উঠলো দুচোখে। এবং একসময়ে যখন গেলাসের মুখ ছাড়িয়ে উপচে পড়া ফেনার মতো কৌতুক উদ্‌বৃত্ত কণ্ঠস্বর স্যামুয়েলের প্রশ্ন করলঃ ওয়েল রয়, ইউ ওন্‌ট্‌ মাইণ্ড ওয়ান মোর কাপ অফ টি? উইলু? তখন নিরঞ্জন রায় যেন কুঁকড়ে গেল। বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে প্রস্তাবের মর্মার্থ নিশ্চয়ই ডরোথীর কাছেও দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

হ্যাঁ বলবে, না, না বলবে ঠিক করে উঠতে সময় নিলো নিরঞ্জন। হ্যাঁ বললে, আরেকটু দেখা যায় সমুদ্রতীরে সূর্যাস্ত; ডরোথীর সর্বাঙ্গের সুবাস সর্বাঙ্গ দিয়ে গ্রহণ করার সময় পাওয়া যায় আরও কিছুক্ষণ; তাতে কিন্তু যা এখন আর উহ্য নয়, তা-ই অবভিয়স হয় সুনির্ঘাৎ। না, বললেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে যথেষ্ট ক্ষিদে নিয়েই মুখে লজ্জা আনার চেষ্টা; ফলে কাটাকাটি খেলার ফাঁদে পা দিয়েছে বুঝতে পেরে নিরঞ্জন কি করবে ঠিক করতে না পেরে ফস করে 'না' বলেই উঠে

দাঁড়ালো এবং অশালীন দ্রুততার সঙ্গে বিদায়াভিবাদনের পালা শেষ করে নিষ্ক্রান্ত হলো ঘর থেকে। গেট ছাড়াবার আগেই স্যামুয়েলের কড়িবরগা নামানো অট্টহাসিতে মুখচোখ লাল হয়ে গেলো নিরঞ্জনের। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো সাঙ্ঘাতিক। মোড়ের দোকানে পৌঁছে; লেমনেড পর্যন্ত বলে হাঁফাতে লাগল স্যামুয়েলের বন্ধু এবং কোলিগ নিরঞ্জন রায়; হাঁফাতে লাগলো প্রায় হাঙ্গরের মতো আওয়াজ করে। হিন্দুস্থানী পানওলা একটু অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে; খুন হয়ে যাবার পর খবর দিতে আসা লোকের মুখের ওপর সন্দিগ্ধ পুলিশের টর্চলাইট দৃষ্টিতে।

সে রাতে তখনই বাড়ী ফিরে যাবার কোনও মানে খুঁজে না পেয়ে নিরঞ্জন রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ালো। কয়েকঘণ্টা আগেও এই মাটির ঢেলা যার আরেক নাম বসুন্ধরা তার গায়ে এত রঙ আছে তা জানতো না। মামার বাড়ীতে থেকে খেয়ে, মাসের শেষে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা হাতে পেয়ে, বন্ধুদের ধার দিয়ে ফেরৎ না পেয়ে, ঠকানোর চেয়ে ঠকে যাওয়ায় যে অতিরিক্ত আনন্দ তাই নিয়েই মশগুল হয়েছিলো সে এতকাল। বেশ ছিলো। এর চেয়ে বেশী কিছুর এতটুকু দরকার আছে মনে হয়নি তার কখনও। আজ এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে যোগ্যতায় সে নেহাৎই বামন। আর পূর্ণচন্দ্র অনেক বড়ো; সে নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। একটা আশ্চর্য আনন্দ, আর তারও চেয়ে আশ্চর্যতর এক বেদনায় ভরে আছে যে মাথার উপরের নক্ষত্রখচিত ওই নীল আকাশ, একথা তার আজই প্রথম হৃদয়ঙ্গম হলো। তাকিয়ে দেখলো সেই অন্তহীন নিলাম্বুরাশি; এত চেনা,-- তবু এত অচেনা; এত দূরে, তবু এত কাছে। রাত যত বাড়তে লাগল ততই ছলাৎ ছলাৎ করতে লাগল শিরার শিরায় রক্তের জোয়ার। বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা দ্রুততর হলো।

রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগলো ডরোথীর জন্যে। যদি একবার, আরেকবার অবারিত হয় অতল বিস্ময়ের সেই সীমাহীন সমুদ্র। যদি একবার, আরব্যোপন্যাসের এক হাজারের একটি রাত এসে

দাঁড়ায় বাতি ধরে হৃদয়ের অন্তহীন অন্ধকার মূর্তিহীন আলো করে, যদি একবার, আরেকবার ধূলিধূসর এই পারিপার্শ্বিক থেকে বিস্মৃত হবার দুর্লভতম অবসর নিয়ে বিচিত্রবেশে মৃদু হেসে দাঁড়ায়,—এই কালটুকু যদি চিরকাল হয়; যদি একবার, আরেকবার শরীরের অতল থেকে উঠে আসে সেই সৌরভ যার গন্ধে বনের মৃগ পাগল, যদি দুলে উঠে এ্যাম্বারে হোয়াইটে মেশানো একছড়া মালা,—রাতের অন্ধকারে জ্বলে ওঠে রজনী গন্ধার সাদা; যদি একবার, আরেকবার সেই লঘুপদসঞ্চারিণী নিস্তব্ধ পদসঞ্চারে এসে উপস্থিত হয় একঘেয়ে জীবনের আকাশ বৃষ্টিতে রোদে দেখা দেওয়া রামধনুর মতো আলো করে; যদি একবার আরেকবার হেসে জীবনপাত্রে উচ্ছলিত মাধুরী দান করে; যার মূল্যের পরিমাণ জানে না সেই নিরুপম নারী।

কিন্তু রাত বাড়লো; কেবল শুক্লা একাদশীর চাঁদ রয়ে গেল মেঘের আড়ালে। ডরোথী অনেক রাত পর্যন্ত নির্গত হলোনা তার 'কাকা' স্যামুয়েল শ্রীরাম ডাটনের গৃহাভ্যন্তর থেকে। একটু নিরাশ হলো নিরঞ্জন।

প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা আত্মরক্ষা করলো কোনও রকমে নিরঞ্জন; দাঁতে দাঁত দিয়ে। মানুষ যেমন করে যন্ত্রণা চাপে। তারপর আর পারলো না। উদগ্র অধৈর্যে গিয়ে হাজির হলো স্যামুয়েল শ্রীরামের বাড়ী। তখন কলকাতায় জাস্ট সন্ধ্যে হচ্ছে। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে; দক্ষিণের হাওয়া। গ্যাসপোষ্টের এক চোখে কোনওটার আলো জ্বলছে কোনওটার জ্বলেনি তখনও। ফাল্গুনের দিনের পক্ষে মধ্যাহ্ন একটু বেশী প্রতাপশালী হয়েছিল সেদিন; স্বাভাবিক উত্তাপমাত্রার চেয়ে পারা উঠে গিয়েছিলো কয়েক ডিগ্রি। সেই দহনকারী দিবাকরের প্রস্থান মুহূর্তে সন্ধ্যেবেলার শহরে মিঠে দক্ষিণ সমীরণ প্রবল জ্বরে জলপটির আরাম দিচ্ছে। রাস্তায়, বাড়ির গায়ে, জানালায়, ঘরের ভেতর ছাদের আলসেয় কণে দেখা আলোর আভায় চলে যাওয়া দিবসের মুখকে ভারি নরম, ভারি করুণ, ভারি আশ্চর্য লাগছে। যে শাশুড়ী সমস্ত জীবনধরে বউএর যৌবনকে ছিন্নভিন্ন করেছে তাজা ফুলকে বোটানিষ্টের কেটে

কুচকুচি করার চেয়েও অনেক বেশি নির্মমতায় আর হৃদয়হীনতায়, সেই শাশুড়ীর মুখেও শেষ গঙ্গাজল দেবার সময় আসন্ন হলেও যখন অসহায়-তার প্রতিচ্ছবিতে সে মুখ প্রতিহিংসার চেয়ে সমবেদনার উদ্রেক করে অনেক বেশি—উত্তপ্ত এই দিনাবসানের মূর্তি তেমনই বিষণ্ন গম্ভীর করে করে তোলে তাপদগ্ধ আবালবৃদ্ধবনিতাকে। গানের কলি, কথার টুকরো, চুড়ির আওয়াজ। পার্কে পার্কে খেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎদের। টিপকলে পা ধুয়ে, ঘাম মুছতে মুছতে জামার হাতে তাদের এবার ফেরার পালা। আরেকটুকু বাদেই তারা পড়তে বসবে মাস্টারের কাছে কেউ ; কেউ দাদাদের কাছে। কারুর কারুর নিশ্চয়ই পড়া দেখে দেবার লোক থাকবে না ; তারা একা একাই তৈরী করবে পড়া। একটু বাদেই বুজে আসতে চাইবে চোখ।

স্যামুয়েল শ্রীরাম বাড়ি ছিল না। সমস্ত বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে ; হা হা করছে পাখীশূন্য খাঁচার মতো। বসবে কি বসবে না করতে করতে স্যামুয়েল হৈ হৈ করতে এসে ঢুকলো ; এক ঝলক দমকা বাতাস এসে যেন ঢুকলো গুহার অবারিত অভ্যন্তরে।

হাল্‌লো? রয়? হাও লঙ?

এইমাত্তর –

বেয়ারা চা দেয়নি কেন?

দিচ্ছিলো ; আমিই না করেছি—

কেন?

বসব কি উঠবো, কুডন্‌ট্‌ ডিসাইড, দ্যাটস হোয়াই—

ডোণ্ট বি সিলি রয়,—না বসার কি আছে আমার এখানে? ওঃ ইয়েস, শোনও য়ু মাস্ট কাম এগেন,—ডরোথা দারুণ ওফেণ্ডেড হয়েছে ; য়ু ডিডন্‌ট্‌ টক ট্যু হা'র দ্যাট ইভনিং! অফকোর্স আই প্লিডেড, আমি বলেছি তোমার হয়ে,—আমি বলেছি রয় টেকস টাইম ট্যু ওয়র্ম আপ্‌,—ওয়েল, -

স্রাগ করে স্যামুয়েল কথা শেষ করেঃ আই ডোণ্ট নো হাও সি টুক ইট,—বাট ডরোথী ওয়াণ্টস য়ু ট্‌ মিট হা' ; আই থিঙ্ক,—

আবার করে স্রাগ সামুয়েল ঃ আই থিঙ্ক, ইট মাস্ট্‌ন্ট্‌ বি ওফ্‌নার স্থান ইস গুড্‌ ফো' হা'—

ধড়াস করে উঠলো নিরঞ্জন রায়ের বুক ; মুখে ছড়িয়ে গেল ক্রিমসন রেড ; ঘর অন্ধকার, তাই রক্ষে—মনে মনে কপালকে ধন্যবাদ দিলো সে। কিন্তু একটি কথাও বলল না মুখে; সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে যেতে লাগল একমনে,—মেয়েরা যেমন দারুণ আশায় অথবা নিদারুণ আশঙ্কায় নির্বাক ঘরের পর ঘর তুলে যায় উলবোনার কাঁটায়।

না, না, আমি স্যামুয়েলেব ভাইঝি নই ; আমি তার কেউ নই,—মুখ নীচু করে ফেলে ডরোথী।

তাহলে স্যামুয়েলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি ?

শুনলে তুমি দুঃখিত হবে রঞ্জন,—

No , I must Know--

পয়সা না থাকলে সব দেশেই মেয়েদের যে তুচ্ছ সম্পর্ক পাতাতে হয়,--স্যামুয়েলের সঙ্গে আমার রিলেসন তার চেয়ে এতটুকু বেটার নয়,

No, no, this Cant be true --

Its true,- ডরোথী ফোঁপায় ঃ আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না রঞ্জন; আমাব বাবা ভদ্রলোকই ছিলেন ; কিন্তু আমার মা --

টেবিলের ওপব সোনালী চুলের অরণ্যে মুখ ঢাকে শবরী ; আর বেরুবাব বাস্তা খুঁজে না পেয়ে ছটফট করা চড়ুয়ের মতো ডরোথার শেষ কথাগুলো তখনও ধড়ফড় করতে থাকে ঘরের মধ্যে।

থিয়েটার বোডেব এই একছিটে বাথএটাচ্‌ড্‌ সিঙ্গলরুম ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রবেশ করলে নিরঞ্জনের প্রতিবারই অত্যন্ত স্বস্তি মেলে ; ঘরখানা যেন পৃথিবী ছাড়া। এত নির্জন, এত শব্দশূন্য, এতই আশ্চর্য একাকী ! ডরোথার প্রতি তার আসক্তি এরকম দুর্নীবার দ্রুতগতি হবার সব চেয়ে সহায় যে এই ফ্ল্যাটের পরিবেশ এবিষয়ে সন্দেহ কি। এই ঘরে বসেই সেই কথাগুলো কবিতা থাকে না কেবল ; সত্য হয়ে ওঠে ঃ ধন নয়, মান

নয়। এতটুকু বাসার মধ্যে যে এত আশার, আর এত রোমাঞ্চের এত নিরবছিন্ন ভালবাসার স্রোত বয় কে জানত, আর যেই জানুক,—নিরঞ্জন রায় ডরোথীর হাত ধরে তার নির্বাসনালয়ে এসে না পৌঁছলে কোনদিনই পেত না জানবার অবসর।

স্যামুয়েল শ্রীরামের ওখানে ডরোথীর সঙ্গে প্রথমালাপের পর হাওড়া ব্রিজের তলায় এমন কিছু জল বয়নি ; কিন্তু ডরোথী এবং রঞ্জন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল কেমন করে এত সেকথা নিরঞ্জনকে প্রশ্ন করলেও যেমন, ডরোথীকে জিজ্ঞেস করলেও তেমনই তুজনের কারুব পক্ষেই এক্সপ্লেন করা সহজ হবে না। আগুন আর ঘি পাশাপাশি রাখলে একসময়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হবে, একথা সত্যই স্বতঃসিদ্ধ একজন তরুণ এবং আরেকজন তরুণী পরপর মিশবার সুযোগ পেলে অতি দ্রুত এমন সময় খুঁজবেই যখন সবার চোখ এড়িয়ে তারা নিবিড় হবে ; তারপর জীবনের পরম বমণীয় মুহূর্ত রাতের পর দিনের মতো দেখা দেবে যখন তারা তুজনে মিলে হবে একলা ; তুই হবে এক। ডরোথী নিরঞ্জন পর্বের এত দূর এত দ্রুত পরিণতির জন্যে ভাগ্য ছাড়া আর যাকে হাতভরে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, তুহাত ভরে, তাব নাম স্যামুয়েল শ্রীরাম ডাটন। অথচ সেই স্যামুয়েল সম্পর্কে ডরোথী এইমাত্র যা উচ্চাবণ করল তারপর নিরঞ্জনের পক্ষে তো বটেই যে কোনও দলছাড়া ব্যক্তিব পক্ষেও ভাবা শক্ত কেন তাহলে নিজেব মেয়েমানুষকে সেচ্ছায় নিবঞ্জনের বা যে কারুর হাতে তুলে দেবে সে। নিরঞ্জনেব মাথার মধ্যে এই জটিল জিজ্ঞাসার পোকাটা থেকে থেকেই ফরফর্ ফর্রর্ করে পাখা ঝাপটাতে লাগলো। ঘড়ীতে সাতটার ঘণ্টা অসংখ্যবার হাতুড়ি পিটল নিরঞ্জনের মাথায়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডরোথীকে যা জিজ্ঞেস করল নিরঞ্জন তা তার মাথায় যা তোলপাড় করছিলো তাব ধার কাছ দিয়েও গেল না ; সে জানতে চাইল স্যামুয়েল শ্রীবামের অতীত।

নিবঞ্জন : স্যামুয়েলের কে আছে ?

ডরোথী : এক ছেলে ছিলো,—সে এখন কোথায় কেউ জানে না।

নি ঃ বউ ?

ড ঃ সে এক ইতিহাস—

ইতিহাসই বটে। তেবশ টাকাব মাইনেতে পা দেবাব আগে এক সময়ে স্যামুয়েল শ্রীবামেব অত্যন্ত দুর্দিন গেছে। এত দুর্দিন যে তাব ইতিহাস লিপিবদ্ধ কবা যায় বটে কিন্তু সেই আশীবিষে যাকে দংশেনি একবারও তাব পক্ষে উপলব্ধি কবা সম্ভব হয়নি একেবাবেই। এ-ভ্যালান্সের ছবি থেকে এভ্যালান্স প্রত্যক্ষ কবা যত দূবে তাব চেয়ে অনেক বেশী ফাবাক এই দুযেব মধ্যে অবশ্যম্ভবী এমন কি স্যামুয়েল শ্রীরামেব নিজেব পক্ষেই তা পুবোপুবি অনুভব কবা আব সম্ভব নয় কাবণ তা তাব জীবনেব অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও তা তাব জীবনেব এতই সুদূব অতীত, এত ধূসব তাব স্মৃতিব পাণ্ডুলিপি।

স্যামুযেল তখন নিবঞ্জন এখন যা হাতে পায় তাব চেয়েও কম পেত মাস গেলে। মাইনে সম্ভবত নিবঞ্জনেব চেয়ে কিছু বেশিই ছিল, তবে হাতে পেত তাব অনেকাংশ ধাবেব কিস্তি দিতে কাটাব পব, অফিস ছাড়াও দাবোয়ান, সিগাবেটওলাকেও দেবাব ছিল এই পয়লা তারিখেই ; ফলে মাইনেব খাম বাড়ী পৌঁছতই স্থুলাঙ্গী কেউ একটা বড অসুখে যেমনহঠাৎ চুপসেযায তেমনই পাতলাকগ্ন অতিকাহিল চেহাবায কোনও রকমে। স্যামুযেলেব সেদিন মদ এবং বেস দুই মাবাত্মক ব্যাধিই ছিলো, গ্লাস জুয়োব ত্রহস্পর্শ যোগে দুএকবাব যদিবা একটু চেকনাই দেখা দিতো মাঝমধ্যিতে তা মিলিযে যেতে বুদ্বুদ ফেটে যেতে যতটুকু সময নেয তাব চেযে বেশিক্ষণ নিতো না কেন এই হিসেবটা স্যামুযেল কিছুতেই বুঝে উঠতে পাবত না। কিন্তু আগুনে না জেনে হাত দিলেও যেমন হাত পোড়ে, তেমনই জেনে অথবা না জেনে বেহিসেবী হলে মাসেব শেষে প্রথমে, পবে মাসেব পয়লা মাইনে পাবাব মহূর্ত থেকেই মাইনে না পাবাব দুববস্থা অপ্রতিবোধ্য হযে পড়ে। স্যামুয়েলেব ক্ষেত্রেও তাব ব্যতিক্রম হবে কেন ? প্রকৃতিব মতই সংসাবেবও অপবিবর্তনীয় একটা আইন আছে যে : ল অফ গ্রেভিটেশানে গাছ থেকে কেবল ফল নয। মাইনেব স্বর্গ থেকে ধার শোধেব নবকে মানুষের fall-ও একসময়ে আব

ঠেকানো সম্ভব হয় না; স্যামুয়েল শ্রীরাম ডাটনের ক্ষেত্রে তা কর্মস্থলে যাতায়াতের কয়েক বছরের মধ্যেই অসম্ভব হলো।

স্যামুয়েলের বাইরে যতই শনি আর রাহুর সুপ্রবল হোক প্রতাপ, তার জন্ম মুহূর্তে সপ্তম স্থানে ছিল ভাগ্যের আশীর্বাদ। পাঁকে যে পদ্মফুল ফোটে, কয়লার কালোয় আত্মগোপন করে থাকে হীরের টুকরো, বজ্জাত লোকের বউ যে সতী হয়, তার আরেক প্রমাণ স্যামুয়েলের সংসারে তার একমাত্র পুত্র এবং দুটি কন্যার জননী মিসেস পার্ল স্যামুয়েল। এইখানে এসে একটু সময়ের জন্যে পাঠিকার মার্জনা ভিক্ষে করব; করব তার কারণ গল্পের দ্রুত লয়কে বিলম্বিতয় নিয়ে গিয়ে একটা ছোট বক্তৃতা দেবার লোভ সামলাতে পারছি না কিছুতেই। পুরাকালে আমরা জানতাম না যে গল্পের এগোবার জন্যে বা চরিত্র পরি-স্ফুটনের কারণে অপরিহার্য নয় এমন একটি কথাও উপন্যাসের চরিত্রবিরুদ্ধ; কিন্তু ডাক্তাররা যেমন একসময়ে টাইফয়েডে জল দিতেও ভয় পেতেন এখন লুচি পথ্য দিতেও বেপরোয়া, বর্তমানে 'লিটারারি পাণ্ডিট' যারা তারাও তেমনই তাকেই একমাত্র উপন্যাস বলতে রাজি যার গল্প এক পা-ও এগোয় না এবং যার চরিত্র বলতে লেখক ছাড়া আর একজনের কাছেও স্পষ্ট নয়। উপন্যাসে এখন গল্প ছাড়া আর যা কিছুই এলাউড; মন্তেসেরি ট্রেনিং বিষয়ে অথবা সাম্যতন্ত্রের ম্যানিফেস্তো; ফ্রয়েড, ডারুইন, থেকে স্বরু করে বিনাবা ভাবে পর্যন্ত যা-কিছুরই বিন্দুবিসর্গ যোগ নেই আলোচ্য উপন্যাসের সঙ্গে তাবৎ কিছু সংযোগ করতেই ভাবে না এখনকার যারা বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসিক তাঁরা প্রায় কেউই। তাদের মতে গল্পে গল্প থাকলেই গল্পের জাত গেল; অতএব উপন্যাস মর্ডান এবং আঁতলেকতুয়াল হতে হলে প্রবন্ধ, নাটক, প্যামফ্লেট, ম্যানিফেস্তো, প্রেসক্রিপসন, ক্যাশমেমো, পাঁজির বিজ্ঞাপন, পঞ্চবার্ষিকীর দলিলচিত্র, যা ইচ্ছে লেখকের তাই হতে পারে; কেবল গল্প যদি গল্প হয় তাহলেই আর গল্প হলো না; মানুষ যদি আজকের দুনিয়ায় কম্যু অথবা স্তোশাল, বা ক্যাপিটল কিম্বা হিউম্যান আর নয় এ্যাক্সিটেনসিয়াল, কোনও রকম একটা 'Ist' না হয়ে

কেবল মানুষই হয় সে যেমন মানুষ নয়, অনেকটা তেমনই আর কি!

স্যামুয়েলের স্ত্রীর প্রসঙ্গে এসে এমনই একটা এই কাহিনীর সঙ্গে একেবারেই যার কোনও রিলেশন নেই তেমনই ইররেলিভেন্ট কি আঁতলেকতুয়াল বলার চূড়ামনিযোগ এখন; অতএব আপনাকে এস্যাইডে নিয়ে সেকথা না বলতে পারা পর্যন্ত আমার চান্স কোথায় এক কপি বই বিক্রী-না-হওয়া-জাতলেখক হবার? টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট যাদের সাহিত্য চেতনার সবেধন নীলমণি সেই খবরের কাগজে রিভুয়ারদের এক মত বা দ্বিতীয় মতে।

এসাইডে সেই বলবার কথাটা হচ্ছে এই: আমি বলেছি যে বজ্জাত লোকের স্ত্রী সতী হয়, এমন একটা কথা আবহমানকাল ধরে চালু আছে যে তার বিরুদ্ধে কেউ কেউ একথা বলতে পারে যে স্যামুয়েলের বউ সম্ভবত দেহশ্রীর অভাবে যারা সতী হতে বাধ্য হয় তাদেরই একজন। স্যামুয়েলের স্ত্রীর দেহবর্ণনায় প্রসঙ্গে পরে আসছি তার আগে জনান্তিকে বলি যে দেহশ্রীর অভাবে কেউ সতী হয় না; ও ধারণাটা মারাত্মক অনভিজ্ঞতা-প্রসূত। যত কুৎসিত হোক রমণী অসতী হতে চাইলে তাকে আটকাতে পারে এমন কয়েদ এখনও অনাবিষ্কৃত। আমরা প্রায়ই কুরূপা কারুর অসামাজিক কীর্তির কথা শুনলে নাক সিঁটকোবার চেষ্টা করি; ভাবখানা দাঁড়ায় এই যে এমন মেয়ে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেও আমরা মুখ ফিরিয়ে চলে যেতাম। আমাদের এই বক্তব্য যদি দ্রাক্ষাফল-অনায়ত্ত শৃগালের আঙুর ফল অতি টক না হতো তাহলে পৃথিবীতে ঘরে অপরূপ রূপসী থাকা সত্ত্বেও লোকে কদর্য পরিবেশে পাবলিক উওম্যানের মধ্যে চাইতোনা পার্ভাসানের জোঁকের মুখে বিকৃত উপায়ে কামনা চরিতার্থতার লবন ছিটোতে। লোকে জানে না; স্ত্রীলোকে জানে। স্ত্রীলোকেরা জানে যে ডক্টর জেকিল এবং মিস্টার হাইডের মতোই ইন্দ্রিয়জয়ের এবং পার্ভার্সানের বাস মনুষ্য রক্তে পাশাপাশি। ঘরে উরশীর ঈর্ষযোগ্য স্ত্রী থাকতেও বাজারের কুৎসিৎত। স্ত্রীলোকের কাছে লোক গেলে লোকে যখন অবাক হয় তখন একটা

ওবভিয়াস যে ফ্যাক্টর মিস করে অবধারিত তা হচ্ছে আর যার জন্যেই লোক বাজারের স্ত্রীলোকের কাছে যাক ঘরে যার উর্বশীর ঈর্ষাযোগ্য রমণী আছে সে নিশ্চয়ই রূপের কাঙাল বলে যাবে না; সে যদি যায় তবে এমন কিছুর জন্যে যাবে যার শান্তির জল রূপে নেই। রূপহীনতার মধ্যেই আছে যার বিকৃত কামনার অপরূপ উত্তর।

স্যামুয়েলের বউ সতী ছিলো বাধ্য হয়ে নয়; ডরোথী,—যার যৌবনের আগুণে নিরঞ্জনের মতো একাধিক সবুজ পোকা পুড়ে মরবার জন্যে এভারেডি ব্যাটারির চেয়েও অনেক বেশি এলার্ট,--সেই ডরোথা যদি আজ স্যামুয়েলের বউ বেঁচে থাকতো তাহলে তার পাশে এসে দাঁড়ালে আজকের এয়ারকাণ্ডিশান্‌ড্‌ স্ট্রিমলাইণ্ড লুমিশাইনের গা ঘেঁষে হেনরী ফোর্ডের প্রায় নিজের হাতে তৈরী প্রথম অটোর মতোই দুঃসহ রকমের ম্যাড়মেড়ে দেখাবে। এমা ডাটনের শুধু চেহারা ছিলো না; চরিত্র ছিলো। সে চরিত্র কোনও মহীয়সী পৌরাণিক পুরনারীর চেয়ে এতটুকু অনুজ্জ্বল নয়। জুয়া, রেস, মদ সবেতেই স্যামুয়েলকে মেনে নিয়েছিলো সে; মেনে নেবার কারণ ছিল। হাজার ফুটোওলা স্যামুয়েলের চরিত্রেব নৌকায় তীরে পৌঁছাবার মত হাল ছিলো, তার স্ত্রীর প্রতি, কি বলব, অবিচল বিশ্বাস, আশ্চর্য প্রেম না কি তার সংজ্ঞা আর কোনও মহত্তর বৃত্তির।

শুধু চোখ ধাঁধানো চেহারার জৌলষে যে কোনও সোনার তরীত উঠতে পাবতো এমা; না উঠে সে স্যামুয়েলের ফুটো না ভরসা করে-ছিলো তার কারণ স্যামুয়েলেব চোখে বিশ্বাসের ছায়া আকাশের ফ্রেমে রামধনুর মত ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হয় নি। আর যে কাউকে বিয়ে করলেই যৌবন বিদায় নেবার আগেই অস্ত যেত ভালবাসার পূর্ণিমা; স্যামুয়েলের চোখে তাই এক চৈত্র মাসের তারায় ভরা আকাশের নীচে এমা তার সর্বনাশ দেখা মাত্র প্রস্তুত হয়েছিলো পানি গ্রহণে। এমা যদি এমার মতো পরমাশ্চর্য রূপবতী না থাকে কোনওদিন অখণ্ডনযোগ্য নিয়তির নির্মোহে তবুও এই একটি লোক স্যামুয়েল সেদিনও থাকবে যে ফেরাবে না তার মুখ; কোথায় যে এই জোর পেয়েছিলো স্যামুয়েলের

বউ স্যামুয়েলকে বিবাহ করবার আগে আর যেই তা বিশ্লেষণ করে বলবার প্রয়াস পাক এমা তার চেষ্টা করে নি কোনওদিন; করলেও অন্যলোকের চেয়ে কিছু কম অসম্ভব চেষ্টা হতো না তা; কারণ যা ইনটুইশানের এক্তিয়ার, বিশ্লেষণের 'তা আউট অফ বাউণ্ডস'।

বিবাহের পরপরই স্যামুয়েলের সব গুণই বেরিয়ে পড়লো; একটি তুটি গুটি টিপেই ধন্বন্তরী যেমন বলে দিতে পারে মায়ের দয়া দেখা দিল বলে, এমা কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝলো অসংখ্য জট দিনে দিনে পড়তে বাধ্য জীবনের গ্রন্থিতে। স্যামুয়েল যে তার গুণের কোনও আভাস দেয় নি প্রাক্ বৈবাহিক পিরিয়ডে অথবা সতর্ক করেনি শুভানুধ্যায়ীরা এই অসম বিবাহের অনতিবিলম্ব ব্যর্থতার অবশ্যম্ভাবিতা বিষয়ে এমন নয়; কিন্তু বৃষ্টিতে বেশীক্ষণ ভিজলে পরের দিন অসুখ হতে বাধ্য একথা জানবার জন্যে কোনও সাসেপটিবল টু কোল্‌ড্‌কে কি ডাক্তারের কাছে যেতে অথবা রিডার্স ডাইজেস্টের গ্রাহক হতে হয়? তবুও যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে আসন্ন হয়ে আসে বহুযুগের ওপার থেকে উজ্জয়িনীর আষাঢ়; গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়ায় ঈষাণের পুঞ্জ মেঘ যখন অন্ধ বেগে ধেয়ে আসে; পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সয়াহ্নের পিঙ্গল আভাস যখন আঁখি রাঙাচ্ছে, বিদ্যুৎ বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যাচ্ছে যখন উৎকণ্ঠিত পাখীরা; যখন এসেছে নববর্ষার নূতন সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করে পুঞ্জে পুঞ্জে, ব্যপ্ত করে, লুপ্ত করে, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে ঘনঘোর স্তূপে। স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর সঘন অন্ধকার যখন আচম্বিতে মুহূর্তে দিগদিগন্তর অন্তরাল করে এসে দাঁড়ায় তখন কে আছে, যে বজ্রের আলোতে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে না চায় জীবনে একবার?

স্যামুয়েলের চোখে নিজের সর্বনাশ দেখেও তারায় ভরা চৈত্রান্ধকারে নিজেকে বাঁচাতে চায়নি এমা। পুরুষের চোখে নারীর মৃত্যুপত্রে নিজের হাতে নারীর সই করে দেবার ইতিহাস যুগযুগান্তরের; তবুও যেদিন এমা সেই পথ অনুসরণ করে স্বখাত সলিলের সূচনা করেছিলো সেদিন সে নিশ্চয়ই ভেবেছিলো আর যেই মরুক পুরুষের চোখে চোখ রেখে;

সে বাঁচবে। কিন্তু বাঁচেনি শেষ পর্যন্ত এমা; অথবা বলি বেঁচেছেই বটে; মরে বেঁচে গেছে স্যামুয়েল শ্রীরাম ডাটনের বউ এমা ডাটন্।

সংসারের অভাব অভিযোগে কাতর হয়ে নয়; যথাসর্বস্ব বিক্রী হয়ে যাবার দুঃখেও নয়। স্বামীর পরিবর্তন লক্ষ্য করেই চমকে উঠলো একদিন এমা। শরীরে ক্ষত হয়; আবার সেরে যায়। যে মুহূর্তে আব সারতে চায় না সেই মুহূর্তে যেমন আতঙ্কিত হয় ডাক্তার; বুঝতে পারে এ ক্ষত আর সারবার নয়; দুরারোগ্য কার্সিনোমার প্রথম আবির্ভাবেই আলটিমেটাম দেয় অনতিক্রুত কিন্তু অনস্বীকার্য অন্তিম মুহূর্তের; তেমনই স্যামুয়েল শ্রীরামের ব্যবহারে চরিত্র-বিরুদ্ধ অবনতি লক্ষ্য করে চমকে উঠল এমা; বুঝলো দেরী হলেও আর ঠেকানো যাবে না সংসারের শ্রীকে; ফুটো নৌকা এবারে আর ফিরে আসবে না ঘাটে; মাঝ নদীতে ভরা ডুবির জন্যে সেই মুহূর্ত থেকেই তৈরী হলো স্যামুয়েলের বউ। এমার মনের সেই চেহারা কেবল নিজেব সুনিশ্চিত মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষারতর মুখেই পড়া সম্ভব।

দেনার দায়ে স্যামুয়েলের যখন বিক্রীর মতো চুলও আর বেশী নেই মাথায় সেই সময়েই অসুখে পড়লো সে। প্লুরিসি। ডাক্তারের কাছে ওষুধের জন্যে যাতায়াত করতে করতে ডাক্তারের ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষ্য করলো বুদ্ধিমতী এমা; মুখ টিপে হাসলো; কিছু বললো না। বহু বাকী পড়ে যাবার জন্যে যে ডাক্তারের পায়ে পড়লেও বাড়ীতে আসতে রাজি ছিলো না যে সে যখন যেচে বাড়ী বয়ে এলো কেবল যে তাই নয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে লাগলো; ওষুধ পাল্টাতে লাগলো—তখনও অবাক হলেও ভয় পায়নি এমা। কিন্তু যেদিন সঙ্গে আরেকজনকে নিয়ে ফল সমেত হাজির হলো লোকটা সেদিন ভয় না পাবার আর এতটুকু কারণও অবশিষ্ট রইলো না; এবং কয়েকদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হলো এই ব্যবহারের আস্তিনে আত্মগোপন করে ছিলো যে এতকাল সেই উদ্দেশ্য। স্যামুয়েলের অফিসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যে সেই পাঠিয়েছে এই দূতকে। একদিন কথায় কথায় তার কাছে

একবার যাবার জন্যে প্রস্তাব করতেই ফোঁস করে উঠল এমা বাচ্চার গায়ে হাত পড়লে মার্জার জননী যেমন রুখে দাঁড়ায়। সাঙ্ঘাতিক তিরস্কারের পর যখন ডাক্তারকে বেরিয়ে যেতে বলার কয়েকদিন পরেই লোক সমেত ফলমূল নিয়ে আবার এসে দাঁড়াতে দেখলো তাকেই তখন ডাক্তারের বেহায়া দুঃসাহসে ভেবে পেল না কি করবে? করতে অবশ্য কিছুই হলো না এমাকে।

স্যামুয়েল ডাক্তার এবং তার সঙ্গীর সামনেই যখন যাচ্ছেতাই ভাষায় তাকে তিরস্কার করল তখন এমা বুঝল অভাবে, অসুখে, মাথার ঠিক নেই তার স্বামীর। এ পর্যন্ত স্থির ছিলো এমা; কিন্তু বিচলিত হলো সেও যখন ডাক্তারের সঙ্গে অফিসের বড় সাহেবের কাছে যেতে রাজি না হলে এমা,—স্যামুয়েল চলে যাবে বাড়ী ছেড়ে এই অবস্থাতেই, জানালো।

দাঁতে দাঁত দিয়ে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে এরপর কয়েক মুহূর্ত সময় এমা নিলো অথবা তা-ও নিলো না। ভারতীয় নারী না হয়েও সে বেহুলার ইতিহাস অবগত ছিলো; সে যা করতে যাচ্ছে তা বেহুলার চেয়ে কিছু বেশী নয়। স্বামীকে বাঁচাবাব জন্যে ইন্দ্রসভায় নৃত্য করতে গিয়েছিলো লখিন্দর-বমনী। আর স্যামুয়েলকে সারাবার জন্যে স্বামীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তাব কাছে একবার যাওয়া,—এমন বেশী নয় কিছু। কিন্তু বেহুলার চেয়ে কিছু বেশীই করতে হলো এমাকে। বেহুলা বেঁচেছিল; এমা বাঁচতে চায়নি। কিন্তু মরবার আগে যার জন্যে এতদূর এগুবে সে তাকে বাকী জীবনের মতো বাঁচাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলো।

পরের দিন সকালেই ডাক্তারকে সম্মতি দিলো সে। সর্ত হলো দুটো: দশহাজার টাকা নগদ এবং স্বামীর গেজেটেড র‍্যাঙ্কে পদোন্নতির কনফার্মেশন পত্র।

যেদিন এলো সর্তানুযায়ী দুই প্রয়োজনীয় বস্তুই সেদিনই রাত দশটার পর এমা বড় কর্তার ফ্ল্যাটে যাবে বলে কথা দিলো। সেই রাতেই অসুস্থ স্বামীর বালিশের তলায় টাকা এবং নিয়োগপত্রের সঙ্গে একটি চিঠিতে এমা লিখল:

খামের মধ্যে টাকা এবং তোমার উন্নতপদের নিয়োগপত্র রইল; তার সঙ্গে রইল তোমার পরম সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর প্রার্থনা: তুমি এবার বড় হও। ছেলেমেয়েদের বলো আবার দেখা হবে।

—তোমার এমা

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যাবার আগে ছেলে আর মেয়েদের কপোল চুম্বন করলো এমা।

স্যামুয়েলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তার আলাদা ফ্ল্যাট নেওয়া ছিলো সারা-দিনের খাটুনীর পর ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে এই কক্ষ; এখানে সুন্দরী রমনীসঙ্গে মেজাজ ফেরাতেন তিনি। গ্রামোফোন রেকর্ডে যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে নাচবার আহ্বান জানাতে এমা ড্রিঙ্ক চাইলো একটা; অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বেয়ারাকে ড্রিঙ্কের অর্ডার করলেন। ড্রিঙ্কের পর এমা বাথরুমে গেল। রঙীন পাত্রের সামনে বসে একটি অত্যাসন্ন রমণীয় রাতের রঙীনতর স্বপ্নের প্রস্তুতিতে চোখ ছলছল করতে লাগল বড় কর্তার। নীল আলো জ্বালা ঘরের এক কোণে রেকর্ড বাজছে:

I'm glad I waited for you
But then what else could I do?

তালে তালে পা পড়ে কার্পেটে:

Yes there were one or two
I used to date with
But they always knew

উঠে দাঁড়ান বড় কর্তা; একপাক ঘুরে যান বাজনার ঘূর্ণীঝড়ে:

I used them to wait with
I'm glad I waited for you
I'm glad my heart waited, too

কোন সময়ে তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো,—ধড়মড় করে উঠলেন। এমা এখনও আসে না কেন? বাথরুমের দরজায় টোকা দিতেই হাঁ হয়ে গেল দরজা; সেটা খোলাই ছিলো। বাথরুমের ফ্লোরে পড়ে আছে

এমার অনিন্দ্যসুন্দর মৃতদেহ। বিষ খেয়েছে স্যামুয়েলের বউ। ঘরের মধ্যে রেকর্ড বেজে যাচ্ছে নিজের মনে :

That favourite dream of mine has just come true
I'm glad I waited for you.

ডরোথীর মুখে স্যামুয়েলের বউয়ের আত্মহত্যার কাহিনী শুনতে শুনতেই যেমনভাবে এমার ছবি ভেসে ওঠে নিবঞ্জনের মনে সেই ভাবেই ধবে দেওয়া গেল এখানে। ডবোথীকে এই পাষণ্ডের হাত থেকে না বাঁচাতে পাবলে আবেকটি হত্যাও সংঘটিত হবে খুব শিগ্‌গির; সে হত্যাব অপবাধ আইনের চোখে স্যামুয়েল নিরপরাধ প্রমাণিত হবে কাবণ কবোনাবেব বিপোর্টে তা বর্ণিত হবে আত্মহত্যা বলে। কিন্তু ডরোথীকে শাইলকের কবলমুক্ত করতে চাই যা সেটাকা জোগাড় করার চেয়ে কয়েক পাউণ্ড মাংস দেহের থেকে খুবলে তুলে দেওয়া একশো পঁয়তাল্লিশ টাকাব মাহিনেব চাকরেব পক্ষে অনেক সহজ। এখন যে ডরোথী স্যামুয়েলের অসামাজিক আচবণ এবং আইনের চোখে অপরাধী কার্যকলাপ মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে তার কারণ এক-সময়ে সে বেশ এক খাবলা টাকা ধাব নিতে বাধ্য হয়েছিল স্যামুয়েলের কাছ থেকে। স্যামুয়েল পৃথিবীসুদ্ধ লোকের কাছে ধাবে, সেই ধাব শোধ করতে না পেবে অপমাণিত, বিপদগ্রস্ত কি না হয়; তবু ধাব শোধ না করে সে যে আবার একসময়ে মোটা ধাব দেয় ডরোথীকে তার কাবণ ওই কয়েক পাউণ্ড লালে সাদায় অপরূপ নারীমাংস; আর কোনও কাবণে নয়। মহাজন যেমন টাকা শোধ করুক দেনদার চায় না; তার বদলে সুদ চায় অনন্তকাল ধরে তেমনই ডবোথীকে টাকা ফেরৎ দেবাব তাগাদা দেয় না একবারও। তাব বদলে ডবোথী যা দেয় ডরোথীব চাকবি যাবাব ভয় না থাকলে অথবা বুড়িমা এবং একগাদা ভাইবোনকে বিলেতে টাকা পাঠাতে না হলে মেয়েমানুষেব পক্ষে তা দেবার পর বেঁচে থাকাব আর কোনও মানে হয় না। তবুও মানে হয়। এরই একমাত্র মানে হয়; তার কারণ স্যামুয়েলের বউ বাচ্চা তিনটে এবং স্বামীকে বাঁচাবার জন্যেই মরতে পেরেছিল। তাই

মরেও মরেনি এমা ; মরে বেঁচেছিল। ডরোথী বেঁচে মরে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

ডরোথীকে বাঁচাবার জন্যে টাকার কথা ভাবতে গিয়ে যার ছবি তার স্মৃতিপটে এসে দাঁড়ালো তার নাম ঘোষাল। উজ্জ্বলকান্তি ঘোষালের কথা প্রথম মনে পড়ার একটা ইতিহাস আছে। চাকরিতে ঢোকবার প্রথম দিকেই ঘোষালের প্রাইভেট চেম্বারে খাতাপত্তর খানাতল্লাস করবার জন্যে নিরঞ্জনকে যেতে হয়। যেখানে যায় নিরঞ্জন গোপন অনুসন্ধানের তুচাকায় ভর করে সেটা ঘোষালের অফিস অথবা বাড়ী কোনটাই নয়। একটা চেম্বারের মতো ; ঘোষালেব অত্যন্ত ব্যক্তিগত একটা কনফিডেনসিয়াল কাজকর্ম চলে যেখানে রাত নটার পর। কখনও কখনও রাতে সেখানে থেকেও যায় উজ্জ্বলকান্তি। চারখানা ঘরের একখানা সুইট সেটা আসলে ; মোজেক মেঝেয় ঝকঝকে অষ্টপ্রহর বাথরুম এটাচড্ এই সুইটের বাইরের দিকেব ঘরখানাই প্রাইভেট চেম্বার বাইরের লোকের কাছে। কিন্তু আর তিনখানা ঘরও যে এর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকলেও আসলে ইম্পর্টান্সে সবার আগে এসমস্ত ইনফর্মেশান-ইকুইপড হয়েই সেখানে হাজির হয়েছিল নিরঞ্জন রায়। যেতেই দারুণ আন্তরিকতার সঙ্গে একগাল হেসে এমন অভিবাদন জানোলো ঘোষাল, নিরঞ্জনের মনে হলো যেন আরেকটু হলেই ফস করে উজ্জ্বলকান্তি রবীন্দ্রসঙ্গীতই না ধরে বসে ঃ বসেছিলাম পথ চেয়ে আর কাল গুণে, দেখা পেলেম ফাল্গুনে [বাঙলা মাস যার কোনওকালে মনে থাকে না সেই বাঙালী ; নিবঞ্জনও ইংরেজি মাসের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা বাঙালা কোন্ মাস বিচার করবার চেষ্টা করে পারলো না বটে তবে ফাল্গুনের যে অনেক দেরী তা অনুধাবন করতে কপালের ঘাম মুছলো রুমাল দিয়ে। মনে মনে ধন্যবাদ দিলো কালের দেবতাকে]।

কি আবার? Hot না Cold? আবও স্ট্রং কিছুর দরকার হয়, তাও স্টক করা আছে—, ঘোষালের কাছে লাখটাকাব চোরা ব্যবসার প্রপোসাল নিয়ে নতুন কোনও শিকার নিজে থেকে পায়ে হেঁটে এসেছে প্রসন্ন হয়ে বর দিতে এমন কৃতকৃতার্থ ভাব দেখে অবাক হলো নিরঞ্জন।

অবাক হবারই কথা ; চাকরি জীবনে পুরানো নয় ; ঘোষালের মতো ঝুনো নারকেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ এই প্রথম। তবুও বিস্ময়েব ভাব যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে ঘোষালেব শকুনচোখে তাব জন্যে যতদূর সম্ভব আত্মবক্ষা কববাব চেষ্টায় অতিবিক্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আওয়াজ দিলো : আমি ইমকাম ট্যাক্স থেকে আসছি ,

ঘোষাল ৹ আপনি কি ভেবেছিলেন আমাব ধাবণা আপনি আমার সঙ্গে বারুঃ বিবাহেব প্রস্তাব কবতে এসেছিলেন ? বাই দি ওযে আয়াম উইডোয়াব, যু নো মিস্টাব বয ?

মিস্টাব বয ডাক শুনে চমকে উঠলো নিবঞ্জন। চোখ এড়ালো না উজ্জ্বলকান্তি ঘোষালেব , চোখেব কোণ নামিযে বলে : ভুল বললে কারেক্ট করে দেবেন অফকোস ? আন্'ট যু নিরঞ্জন বয ?

এবাবে আত্মবক্ষা কবা আব সম্ভব হলো না নিবঞ্জনেব পক্ষে। ধবা পড়ে চুপসে গেল , দেশে প্রচুব জমি জাযগা আছে বলে গুল দিতে উদ্যত কেউ যেমন মুহূর্তে হাওয়া বেবিযে যাওযা বেলুনেব মতো টুসকে যায স্বগ্রামেব অবাঞ্ছিত জনৈকেব অনভিপ্রেত আবির্ভাব ঘটলে অসময়ে, তেমনই বাক্যস্ফূর্তি হলো না অনেক্ষণ আর নিবঞ্জনেব।

উজ্জ্বলকান্তি ঘোষালকে এবপর খুলেই বললো নিবঞ্জন। রুটিন ডিউটিতে এসেছে সে ঘোষালেব সদ্য বিতাড়িত কোনও অধস্তন কর্মচাবীর গোপন ইনফর্মেশানেব নামে ব্যক্তিগত আক্রোশেব নিমিত্ত হযে। ঘোষাল বলল : একটি লোককে গত মাসে নোটিশ দিযেছি , সম্ভবত সে-ই হবে , দেখি চিঠিখানা, হাতেব লেখা দেখলেই ধবতে পাববো—

ততক্ষণে সামলে নিযেছে কিন্তু নিবঞ্জন বায় অনেকটাই। উত্তব কবল : ওবিজিনল লেটাব তো আমাদেব হাতে দেয না , ট্রু কপি আছে , সে দেখে আপনাব লাভ নেই—

কথা শেষ কবে তাকাতে পাবে না ভালো কবে ঘোষালের মুখেব দিকে , ঘোষাল চোখেব কোণ দিযে হাসছে , অন্ধকার বাস্তায পবলিক নুইসেন্স কমিট কবাব পব ধবা পড়ে দুটো টাকা বাব কবে দেবাব পর যখন আসামী, আব নেই, বলে পকেট উলটে দেখায়, তখন বুকেব

সব কটি চুল পেকে গেছে যার সাত বছর আগেই সেই কলকাতা পুলিশের সবচেয়ে পাকা মাথা লাল পাগড়িব তলায় যেমন হেসে বলতে চায়ঃ বার করো, বাব কব, কাছা থেকে আবও আটটা টাকা, নইলে—, তেমনই হাসি দিলো উজ্জ্বলকান্তি। পার্থক্যেব মধ্যে কেবল ওরিজিনলের জন্যে পীড়াপীড়ি কবলে না আর। ক্যাশবাক্সেব চাবি যাব ট্যাঁকে, ক্যাশবাক্স তাব অন্যকে দিযে বিশ্বাস কবতে কবে কাব আব আপত্তি হয়েছে এতটুকুও?

উজ্জ্বলকান্তি ঘোষালও নিজে থেকেই ঘুবে ঘুরে নিবঞ্জন বাযকে সব কখানা ঘবই দেখালো যত্ন কবে, বেশী বাড়ী ভাড়া দিতে বাজি ক্লাযেণ্টকে যেমন যত্নেব সঙ্গে ঝানু, ল্যাণ্ডলর্ড নিজে সঙ্গে নিযে তন্নতন্ন করে বাড়ীব পোকামাকড পর্যন্ত দেখায় কন্যা দেখাবাব কালে পাত্রী পক্ষেব মাযেব মতো খুঁটিযে খুঁটিযে নিবঞ্জনকে তেমনই অবাবিত কবে দিল স্যুইটেব সব কিছুই।

তাতেই নিবস্ত হলে সে হতো না উজ্জ্বলকান্তি ঘোষাল। নিবঞ্জন আলতো আলতো ভাবে ঘবগুলোব ওপর চোখ বুলিযে বেবিযে যাচ্ছিলো, বাধা দিলো যাব বিরুদ্ধে অভিযোগ সে-ই। এ ঘবখানায ঢুকবেন না?

নিবঞ্জন হুড়বড় কবে ঢুকেই দারুণ ধাক্কা খেলো বুদ্ধিব প্রতি কটাক্ষে। ঘব বটে তবে বাথরুম। মুখ লাল হযে গেল দোলেব দিনেব মতো। কোনওরকমে গলা দিযে বাব কবলো, এটা তো বাথরুম? সদ্যোজাত শিশুব সাবল্য মাখানো মুখ ঘোষালেব, ভাজা মাছ উল্টে খেতে না জানা গলা জিজ্ঞেস কবলো তাব: তাই বুঝি। অনেকক্ষণ কুঁকড়ে ছিলো নিরঞ্জন, এবাবে সে ওবা যাকে বলে ওযার্মড আপ, তা-ই হলো। বলল: আপনি এত ননচ্যালেণ্ট এটিচুড নিযেছেন কেন বলুন তো? আলটিমেটলি আপনাব কিছু না হলেও আপাতঃ হ্যারাস কববাব ক্ষমতা আমারও আছে, don't forget that—

হাঁফাতে থাকে উত্তেজনায একশো পঁযতাল্লিশ টাকাব ইন্‌স্‌পেকটাব, আব হাসতে থাকে তখনও জালেব পক্ষে অতিবিক্ত বড় রাঘব বোয়াল:

এক্সট্রিমলি সরি টু ওফেণ্ড য়ু্য, মাই ফ্রেণ্ড; আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন মিস্টাব রয়, আই ডিড্‌ন্‌ট মিন টু হার্ট ইয়োব ফিলিংগস্‌,—বিলিভ মি। আমি বলতে চেয়েছিলাম আপনারা তো চোরাই খাতা-পত্রের জন্যে বেডরুমের চেয়ে বাথরুমেব ওপরই ভরসা বাখেন বেশি? ইস্‌ন্‌ট ইট ট্রু? টেল মি ফ্র্যাঙ্কলি—

নিবঞ্জন: বাখি, সো হোয়াট?

ঘোষাল: এবস্লুলিটলি নাথিং, আপনি এবাবে সত্যিই রেগেছেন বায় সাহেব, চা খান—

নিরঞ্জন: নো, থ্যাঙ্কস-

ঘোষাল: চা বড ভালো জিনিষ মশাই, আমাদেব দেশেব একজন চা-খোব মহাজন ব্যক্তি বলেছেন: 'চা হাতে গবম ঠেকে বটে কিন্তু খেলে মাথা ঠাণ্ডা হয।'

কথাব জবাব না দিযে বাগে গবগব কবতে কবতে সাচ ওয়াবেণ্টটায কিছু পাওয়া যাযনি যে তাবই বিপোর্ট লিপিবদ্ধ কবে যেতে লাগল একমনে। একটু পবে চোখ না তুলেই বুঝতে পাবলো ঘোষাল সামনেব ঘবে ঢুকলো একবাব, সেখান থেকে বেরিযে প্রবেশ কবল বাথরুমে। যে ঘব থেকে বেরুলো সে ঘবেব একমাত্র ফার্নিচার ড্রেসিং টেবলেব সামনে কযেকখানা খাতা দেখে লাফিয়ে উঠলো, খাতাব প্রথম পাতা উল্টোতেই তাব মনেব অবস্থা সেই চাতক পাখীর মতো, যা বোঝাতে একটি অতি চেনা বাকধাবাব সাহায্য দেওয়া ছাডা গত্যন্তব নেই: মেঘ না চাইতেই জল। যেকটি খাতা, এক্স্যাক্টলি সেই কখানাই কুডিযে পেযে যখন নিজেব চেযাবে এসে বসেছে সবে মাত্র, বাথরুম থেকে বেরুলো ঘোষাল।

এইতো, এই খাতাগুলো তো এখানে, ওই টেবলেব ওপর পডেছিলো—, না বলে পারলো না নিবঞ্জনেব উত্তপ্তকণ্ঠ।

তাই বুঝি,—সেই একই প্রথম শ্রেণীব সাহিত্যশিল্পী জনোচিত নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ত গলা উজ্জ্বলকান্তিব।

এবাবে আব যথোচিত বাগ কবে উঠতে পাবলো না সঙ্গততর

যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও; নিরঞ্জন বুঝলো যে 'তাই বুঝি'-টা ঘোষালের কথার মাত্রা।

তাই বুঝি মানে কি? আপনি কি বলতে চান এই খাতাগুলো পাবার ফলে আপনার কি ক্ষতি হতে পারে, আপনি জানেন না?

ঘোষাল: জানি; জেল হয় না; সম্ভবত কেসও হয় না। না হলে ট্যু হাণ্ড্রেড রুপিস দিস সাইড; হলে ট্যু হাণ্ড্রেড রুপিস দ্যাট সাইড—দ্যাটস অল।

ঘোষালের কথাই আজ মনে পড়লো নিরঞ্জনের। ঘোষালের কাছে আর যাবার দরকার হয়নি তার। কিন্তু আজও সেখানে যাবার দরকাব পড়ছে যখন তার তখন ঘোষালেরও তাকে আবও বেশী দরকার পড়বে নিশ্চয়ই, কারণ সেদিনকার পর এতদিন আরও খেয়েদেয়ে আরও ক্ষিদে বেড়েছে রাঘব বোয়ালের। ভবিষ্যতে কাজে লাগাবার কাবণেও নিরঞ্জনকে হাতে মোটা কিছু গুঁজে দিতে আর যারই আপত্তি হোক; উজ্জ্বলকান্তির হবার কথা নয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘোষালের কাছে যেতে হয়নি নিরঞ্জনকে। কেন যেতে হয়নি তা-ই হচ্ছে কাহিনীর ইমিডিয়েট পরের কথা। সে কথা না লিখতে হলেই হয়ত ভালো ছিলো।

ঘোষালের কাছে যাবাব আগে অনেকবারই যখন মনে মনে একবার হ্যাঁ, একবার না, করছিলো নিবঞ্জন সেই সময়েই একদিন অফিস ক্যান্টিনে চায়ের কাপে মুখ দিতে ভুলে গিয়ে সিগারেট জ্বালাবার জন্যে যখন এপকেট ওপকেট হাতড়াচ্ছে সেই সময়ে একখানা হাত পাশ থেকে দেশলাইটা এগিয়ে দিতে চমকে উঠছে সে। চমকে উঠতেই ম্লান হাসি ছড়িয়ে গেল একটা দেশলাই এগিয়ে দিয়েছিল যে তার মুখে; বিনয়। কি ব্যাপার তুমি এখনও এখানে বসে? রিহার্সাল নেই, নতুন নাটকের? —নিরঞ্জন সিগারেট ধরাতে ধরাতে আজ অনেকদিন বাদে কোনও সহকর্মীর সাথে কথা বললো। ডরোথীর সঙ্গে আলাপ হবার, স্যামুয়েলের অতীত এবং বর্তমান সম্পর্ক ডরোথীর সঙ্গে, জানবার পর থেকে এখনও পর্যন্ত দিন কি ভাবে আসছে আর কখন যাচ্ছে কিছুই

জানে না বলতে গেলে। একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা আগে ধার দিয়ে সিগারেট পুড়িয়ে, সিনেমা দেখে রেস্তরাঁয় গিয়ে উড়োতে পারতো না নিরঞ্জন; তাব আগেই পরে মাসের আবার একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা আবার নিজে থেকে এসে দাঁড়াতো যখন তখন রীতিমতো অপদার্থ মনে হতো নিজেকে তার। আর এখন মাসের গোড়া আর শেষে পার্থক্য বোঝার সময় পর্যন্ত চলে গেছে অনেকদিন। বাড়িতে, পাড়ায়, অফিসে তাব নিজেরই শেষ নেই ঋণের। অফিসের ষ্টাফ তো রীতিমত অবাক হয়েছে; ব্যাপাব কি। তাদের নিজেদেব ভরসা হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে বলে নয়, তাদের ওপব ভরসা কবতে হচ্ছে নিরঞ্জনকে কোন ফুটো চৌবাচ্চা ভবাট করবার কারণে ভেবে বেশ দুশ্চিন্তিত হয়েছে তাবা ইদানীং।

মামাব ওখানেও বেশ বুঝতে পারে নিরঞ্জন All not so quite in th: wastern front. মামীব কাছে কখনও হাত পাততে হয়নি তার এব আগে: ববং মামাতো ভাই-বোনেদেব জন্যে মামাব কানে যেন না যায় এমনভাবে দামী দামী প্রেজেণ্টেশান দিয়েছে এতকাল কখনও জন্মদিন উপলক্ষ্যে, কখনও কখনও কোনও উপলক্ষ্য ছাড়াই। মামীর কাছে প্রথম দুচাব বাব কিছু চাইতে খুশীও হয়েছিলেন তিনি; এই ভাগ্নেটিকে বড় ভালবাসতেন, মামা এবং মামী দুজনেই। কোথায় একটা অপত্য স্নেহে জড়িয়ে গিয়েছিলেন তাবা, সত্যি কথা বলতে, নিজের ছেলের চেয়ে এতটুকু ফাবাক সৃষ্টি করেননি বোনের ছেলের প্রতি। কিন্তু ঘন ঘন নিবঞ্জনেব টাকার জন্যে হাত পাতায় এক নম্বর, দুই—মামীব কাছে নিবঞ্জনেব দীর্ঘসময় কোনও টাকা জমা না পড়ায়; লাষ্ট বাট নট দি লিস্ট, সমস্ত সময় চিন্তা এবং ঘুমের ঘোবে কোনও নারীর বিদেশী নাম উচ্চাবণে আতঙ্কিত হলেন তিনি। একদিন জিজ্ঞেসও কবেছিলেন নিবঞ্জনকে। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেননি অবশ্য; নিরঞ্জনও সোজাসুজি জবাব দেয়নি। তবুও মামী বুঝেছিলেন বেশ যে নিবঞ্জনের মনোরাজ্যে কোথাও কিছু গড়বড় হয়ে গেছে ডেফিনিটলি।

বিনয় নিরঞ্জনের চোখে চোখ রেখে বললো: বিশ্বাস করো তোমাকে

একটা কথা বলবার জন্যে আজ সাতদিন ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। অন্য লোককে বললে সে স্রেফ গুল বলে উড়িয়ে দেবে জানি; বলবে আমার চেষ্টা আন্তরিক হলে অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যে তোমার সঙ্গে কথা কইবার ফুর্সৎ পাই নি,—এ হতেই পারে না, যখন আমরা একই জায়গায় কাজ করবার জন্যে সপ্তাহে ছ'দিন পাশাপাশি টেবিলে বসতে বাধ্য হই। নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করবে না। নিরঞ্জন কিছু বললো না, হাসলো।

না হাসলে চলবে না নিরঞ্জনদা, Everything is not all right in the state of Denmark?—কি হয়েছে তোমার বলোত?

নিরঞ্জন—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই—

বিনয়—বুঝেছি, নারীঘটিত ব্যাপার নিশ্চয়ই?

নি—নারী ছাড়া পুরুষের এমন সর্বনাশের পাত্র আর কে কবে হয়েছে।

বি—নিরঞ্জনদা আমার সর্বনাশ তোমার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে গেছে—

নি—তুমি বুঝি একসঙ্গে দুজনের প্রেমে পড়েছ—

বি—না, ঠাট্টা নয়। আমার রাজকন্যা বাঁধা আছে যে রাক্ষসের কাছে,—তাকে উদ্ধার করতে যা প্রয়োজন আমার কোনও দিন তা জুটবে না জানি, কিন্তু সেজন্যে বিশ্বাস করো আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই—আমার দুঃখ—

এই পর্যন্ত বলে অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হলো বিনয়। তার চোখ নিরঞ্জনের চোখে পড়তেই দেখল নিরঞ্জনের চোখ তাকিয়ে আছে বটে তার দিকে কিন্তু তার দৃষ্টি যোজন দূরে কোথাও নিবদ্ধ। বিনয়ের কথা শুনতে শুনতেই ধ্বক করে উঠেছে নিরঞ্জনের ভেতরটা। হতভাগা জানে না যে নিরঞ্জনের প্রিয়াও অনুরূপ বন্দী। তার মনে পড়তেই তার মন চলে গেছে ডরোথীর পাশে। স্যামুয়েলের কলুষস্পর্শ থেকে আজও মুক্ত করতে পারেনি ডরোথীকে, ভাবতেই নিজেকে এত ছোট মনে হয়েছে

তার যে ঘোষালের কাছে যাবার চাপা ইচ্ছে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ; টের পাচ্ছে সে। ঘোষালের কাছে গেলে শেষ পর্যন্ত এর তুলনায় আর কিই বা ছোট হতে পারে সে। নিজেকে একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে ফিরিয়ে আনলো নিরঞ্জন মুহূর্তে অতীতের অসীম সমুদ্র থেকে বর্তমানের কঠিন ভূমিতে। ঘুমের মধ্যে পাখা বন্ধ হয়ে গেলে দারুণ ঘামে অসম্ভব গরমে যেমন ঘুম ভেঙে গেলে খেয়াল হয় পাখাটা চলছে না, তেমনই ঠোকর খাওয়া মাত্তর খেয়াল হলো কথা বন্ধ করে বিনয় তাকিয়ে আছে তার দিকে। লজ্জা পেয়ে নিরঞ্জন লজ্জা না পাবার ভান করতে গিয়ে একটু বেশী একসিলাবেট করে ফেললো সপ্রতিভতার ওপর ; যেন সবই মন দিয়ে শুনছিলো এমন ভাবে ফস করে বলে বসলো : কি হে থামলে কেন ? বলো বলো –

বিনয় রিস্টওয়াচের ওপব নজর বুলিয়ে নিলো : কথা বন্ধ করেছি প্রায় তিন মিনিট, এতক্ষণ তুমি তো এখানে ছিলে না নিবঞ্জন দা।--

নিরঞ্জন : সবি ; একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম ! বলো,—এবাব মন দিয়ে শুনছি—

বিনয় : মেয়েটিকে একটি রাক্ষসেব কবল থেকে মুক্ত করে আনবাব মতো টাকা আমার নেই ; না থাক, দুঃখও নেই, তার জন্যে : বহু রকম স্বপ্নই তো আমরা দেখি ; কটা আর সত্য হয় শেষ পর্যন্ত : দুঃখ এই যে আরেকজন রাইভ্যাল জুটে গেছে শুনছি,—সেই শেষ পর্যন্ত বাজি মেরে দেবে হয়তো—

এইটুকু বলবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এমন কিছু আমল দেয়নি বিনয়ের সিলি কথাবার্তাকে নিরঞ্জন। ক্যাসুয়ালি নিচ্ছিলো খুব। সে যে নিজে প্রেমে পড়েছে এটা জাষ্ট বলতে হয় বলে বলেছিল ; সত্যি সত্যি নিজের কথা কিছু বলতে যাচ্ছিলো না সে আর। প্রথম একটু ইনটারেষ্ট হয়েছিল বিনয়ের অবস্থা তারই দুরবস্থাব অনুরূপ জেনে। কিন্তু আরও মারাত্মক গুরুত্ব কিছু দেয়নি নিরঞ্জন। দিলে, বিনয়ের কথার ভেলায় চেপে সে এত চট করে চলে যেতে পারতো না ডবোথীর কাছে।

এখন ছেঁড়া তার কথার বেহালায় জুড়তে গিয়ে যে সুর আলাপ করছে বিনয় তাতে আর অনবহিত থাকতে পারলো না সে। কান্টিনের গুমোট আবহাওয়া আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠলো।

নিরঞ্জন ঃ আরেকটু এক্সপ্লিসিট হতে বাধা আছে না কি ?

বিনয় ঃ তুমি জানতে চাইলে মেয়েটির নামধাম ছাড়া আর কিছুই বলতে বাধা নেই ঃ নামটাও তোমার কাছে বলতে আপত্তি শুধু তুমি অসম্ভব পেট আলগা তাই ; নাহলে তাও -

নি ঃ নাহে। নামধাম জানবার মতো ফেমিলিন কুরোসিটি কিছু ফিল করছি না আপাতত ; বাকিটা বলো,—কোয়ায়েট ইনটারেষ্টিং মনে হচ্ছে ; দাঁড়াও, আরেক কাপ চা বলি ; এটা জুড়িয়ে গেছে—

বি ঃ তোমার যা হাল তাতে আরও দুশোকাপ বললেও দুশোকাপই জুড়োবে ;

even then, চা না নিয়ে বসাটা বড্ড ইনফ্রিঞ্জমেণ্ট অফ আদার্স বাইট হয়ে যাবে—

চায়ের ধূমায়িত কাপেব ওপর বিনয় যে কাহিনী বিবৃত করলো তার পাত্রপাত্রী নিরঞ্জনেব কাছে অতি পরিচিত , গল্প শুনতে শুনতে রং পাল্টাতেই লাগলো নিরঞ্জনের মুখের ওপর দীর্ঘকাল ধরে যা একটু একটু কবে জমছিলো সেই মেঘের। গল্প যেখানে গিয়ে থামলো সেখানে সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হলো নিরঞ্জনের গ্রহণ লাগা মুখ। বিনয়ের দৃষ্টি এড়ালো না। অবাক হয়ে গেল সে ; একটা ঘটনা বিবৃত করবার সময়ের মধ্যে কেমন ভাবে এত বড় দুর্যোগের রেখা উঠে গিয়ে নিরঞ্জনদা আবার প্রায় আগের মতো ঝকমক করতে লেগেছে, ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার বলতো ? তোমার যেন জ্বর ছেড়ে গেল বহুদিনের বলে মনে হচ্ছে—

নিরঞ্জন সেকথার উত্তর না দিয়ে বরং একটা প্রশ্নই করে বসল ; সে প্রশ্ন নিরঞ্জন করতে পারে জানলে বিনয় তার প্রেমেব ইতিহাস আদৌ বলত কি না সন্দেহ। নিরঞ্জন একদম আচমকা বিস্ময়েব বোমা ফাটালো বিনয়ের মুখের ওপরই ; তুমি যাকে বাঁচাতে চাইছ

কিন্তু বাঁচাতে পারছ না, তার নাম কি ডরোথী? এই ডরোথী কি স্যামুয়েল শ্রীরাম ডাটনের সেই তথাকথিত নিস?

বিনয়ঃ তুমি কি করে জানলে?

নিরঞ্জন: হাতগুণে

বিনয়ঃ নো, নো,— তোমার পায়ে পড়ি,—বি সিয়েরিয়াস,—টেল মি হাও অন আর্থ কুড য়ু নো?

নিরঞ্জন কথা না বলে একটি বয়কে বিল আনতে বলল অঙ্গুলি সঙ্কেত করে; এবং বিলের পয়সা নিঃশব্দে গুণে গুণে কাগজের ওপর রেখে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো।

এবং ঝড়ের মতো গিয়ে পৌঁছল স্যামুয়েলের ওখানে। স্যামুয়েলের বেয়ারা না না করতে করতে বন্ধ দরজার নব ঘুরিয়ে ঢুকলোও উন্মাদের মতো। স্যামুয়েলের কোলের ওপর বসেছিল ডরোথী; চারশো চল্লিশ ভোল্ট ডি সির ধাক্কা খেলেও যা সময় নিতো তার চেয়েও দ্রুত ছিটকে পড়লো স্যামুয়েলের কোল থেকে ডরোথী। স্যামুয়েল এরকম এনটিক্ল্যাইম্যাক্সের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। ডরোথীকে কোলে বসিয়ে তালিম দিচ্ছিলো স্যামুয়েল। ওই একই গল্প যা বলে নিরঞ্জন আর বিনয়কে ফাঁসাবার চেষ্টা চালিয়েছে একসঙ্গে তখন,— সেই এক ঢিলে তৃতীয় আর কোনও পাখীকে মারা যায় কি না পরামর্শ চলছিলো। সেই মোমেণ্টাস ডিসিসন নেবার সময়ই এমন মূর্তি ধরে এসে দাঁড়াবে নিরঞ্জন তা কেমন করে উদ্দামতম কল্পনাতেও আঁচ করবে স্যামুয়েল। সে কোনও রকমে জিজ্ঞেস করলো: What's wrong Roy?

Keep quite,— দারুণ এক স্নাবিংএ খচি নড়িয়ে নিলো নিরঞ্জন স্যামুয়েলের, তারপর আঙুল আকসির মত করে বললো, ডরোথীঃ Your game is up! I met Benoy just now—

তারপর একটু দম দিয়ে বললে— be a good gal and give me my things back now, quick!

স্যামুয়েল রুখে দাঁড়াবার ভান করে: হোয়াট ডু য়ু মিন?

নিরঞ্জন, গায়ে উচ্চিংড়ে উড়ে এসে বসলে যেমন টোকা দিয়ে ঝেড়ে

ফেলে, তেমনই ফুঃ করে দিল স্যামুয়েলকে : ইট্‌স্‌ নামাক ইয়া বিসনেস—

তারপর ডরোথীকে বললেঃ তুমি এখনও স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে কেন ?

ডরোথী : জিনিষগুলো এখানে দেব কি করে ? এখানে তো—

নিরঞ্জন : এখানেই-আছে ;—ইফ যু ডোণ্ট ওয়াণ্ট এ সিন,—ওয়েল —বাইরে চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ; জানলা দিয়ে চেষ্টা না করলেও দেখতে পাবে। লোকগুলোব চেহারা দেখলে মালুম হবে আই মিন বিসনেস—

ডবোথী ভেতরে চলে গেল। স্যামুয়েল জানলা দিয়ে লোকগুলোকে সাইজ আপ কবে একটা জিনিস বুঝলো জলের মতো প্রচুব পান করা সত্ত্বেও যে সেই মুহূর্তে অন্তত নিবঞ্জন মিনস বিজনেস।

বেডিও, কলম, বেকর্ড, বই টেবল ল্যাম্প সব সুড় সুড় করে বেরুল ; নিরঞ্জন তখনো নিবস্ত হলো না। বলল : রিষ্ট-ওয়াচটা ?

ডবোথী কেঁদে ফেলল : এটা তুমি নিও না রঞ্জন ; লেট মি কিপ ইট এস এ মেমেণ্টো—

যু হ্যাভ ফবফিটেড ছাট বাইট,—নাও,- নিজের থেকে খুলে দেবে, না—

বিষ্টওয়াচটা হাত থেকে খুলে নিয়ে টেবিলেব ওপর বাখলো ডবোথী। বাইবে থেকে এলো চাবজনেব মধ্যে সবচেয়ে দামপাণ্ডাটা ; এসে বললো : দেবী হচ্ছে দেখে এলাম—

রঞ্জন বললো : এইগুলো বাইবে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তোলো—

নিবঞ্জন বায় যা যা দিয়েছিলো ডরোথীকে সব ফেবৎ নিয়েও যে একটি মাত্র জিনিষ তাকে দিযেছিলো ডবোথী সেটি ইচ্ছে কবেই ফেবৎ দিলো না সে। ডরোথী নিবঞ্জনেব নাম ছেঁটে ছোট কবে দিযেছিলেন : —বঞ্জন। আমাদেব কাহিনীব সঙ্গে আজ যাব অবিচ্ছেদ্য যোগ,—সে নিরঞ্জন বায় নয। নিবঞ্জন বায়েব খোলস ছেড়ে ডবোথীব প্রতাবণা

তার নাম রঞ্জন রায়। এই কাহিনী প্রসঙ্গে পরে তাকে আমাদের প্রয়োজন হবে; সেই কারণে প্রথম যৌবনে স্কার্ট পরা বিদেশীনীর পর্ব এত ডিটেলসে আলোচনা করতে হোলো; নিরঞ্জন রায় কেমন করে রঞ্জন রায়ে অপরূপান্তরিত হোলো সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণে না রাখলে শক্ত হবে এই কাহিনীর সেই মর‍্যালের তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করা: এই কাহিনীর সেই একমাত্র প্রতিবাদ হচ্ছে আমরা অন্য লোককে যতই বাণী দিই, আমরা সবাই ক্রিচার অভ সার্কামস্টান্সেস। রঞ্জন রায় ডরোথীর কাছ থেকে মানুষের জীবনের জঘন্যতম আঘাত না পেলে সমাজকে প্রত্যাঘাত করবার আর্জ কোথাও থেকে পেত না; কিম্বা আরও মূল ধরে নাড়া দেওয়া যায় তার। রঞ্জন রায় নিরঞ্জন বায়ই থাকতো হয়তো, রঞ্জন রায় আবির্ভূতই হতো না কোনও দিন জীবনেব রঙ্গমঞ্চে। আর তাহলে রতনলাল মুন্সী, গ্লোবিয়া, রঞ্জন-ডালিয়া কাণ্ড ঘটতোই না কোনদিন; আমারই বা তাহলে নটেগাছ মুড়োবাব সুযোগ আসত কোথা থেকে?

এই রঞ্জন ছিলো ডালিয়াব আত্মীয় এবং বয়সে সামান্য বড়।

এবং এই রঞ্জনেব কাছেই ডালিয়া যায় রতনলাল গ্লোরিয়াকে বিবাহ কববাব মানসে বিলাত যাত্রা কবলে; কি কারণে সে তথ্য বলবার আগে বতন-ডালিয়াব বিদায় দৃশ্য বর্ণনা করবার আছে। বাবার সঙ্গে বিলাত যাত্রা উপলক্ষে কথা বলতে গিয়ে রতনলাল বেশ ভালো করেই বুঝে এলো যে সখারাম বাধা না দিলেও মনে মনে বিপর্যস্ত হবেন। মা-ও অত্যন্ত আঘাত পাবেন ডালিয়াকে প্রত্যাখ্যান করলে এবং রতন ভেতরে ভেতরে বসে গেল অনেকটা। বিলেত আদৌ আর যাবে কিনা নতুন কবে চিন্তা করতে বসলো রতনলাল মুন্সী। এতগুলো লোকেব মনে এত বড় একটা দাগা দেওয়া নিজের এক মুহূর্তের একটা গোঁ বজায় বাখবাব জন্যে, একটু বেশী বাড়াবাড়ি বলেই মনে হতে লাগল তার। ঠিক সেই সময়ে এল ডালিয়া; ডালিয়াকে দেখে যেটুকু গোঁয়ার্তুমি তখনও অল্প এক আধবার মাথা তুলছিল সমুদ্রের তলা থেকে ডোবা পাহাড়ের চূড়োর মত সেটুকুরও চিরকালের জন্যে সলিল

সমাধির পুণ্যলগ্ন পায়ে হেঁটে নিজে থেকেই রতনের মনের দোরগড়ায় এসে হাজির হলো। কিন্তু দুজনেরই দুর্ভাগ্য ভেতরে ঢুকবার আদেশ না পেয়ে ফিরে গেলো আবার যেমন এসেছিলো তেমনই।

ডালিয়া জিজ্ঞেস করলো: শুনলাম বিলেত যাচ্ছ? ডালিয়ার মন বলতে চেয়েছিলো কার কাছে বাহাদুরী দেখাবার জন্যে দুজনেরই সর্বনাশ করতে উদ্যত রতন। কিন্তু মুখ দিয়ে তার পরিবর্তে যা বেরুলো তা ওই নেহাৎই কাট এণ্ড ড্রাই: শুনলাম, বিলেত যাচ্ছ?

রতন মনে মনে এ প্রশ্ন আন্দাজ করেছিলো, মনে মনে উত্তরও তৈরী করে রেখেছিলো তার। তার মন বোধ হয় বলতে চেয়েছিলো: যাচ্ছি শুনেও ডালিয়া এতদিন চুপ করে বসে থেকেছিলো কোন্ সাহসে। তার মাথায় এটুকু ঢুকলো না যে ডালিয়ার সঙ্গে তার ঝগড়া পর্যন্ত হয়নি যে ডালিয়া ক্ষমা চাইবে, বিলেত গেলে ডালিয়াকে বিয়ে করে সস্ত্রীক যাবার আমন্ত্রণই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই অপেক্ষা করছিলো ডালিয়া একা নয়,—ডালিয়ার বাড়ির ইঁট, চূণ, সুরকি পর্যন্ত, সবাই, সব কিছুই। কিন্তু রতনের গলা তার বদলে উচ্চারণ করলো: হ্যাঁ, মুভি স্টুডিওতে ফিল্‌ম্ তোলা শিখতে যাব, ভাবছি।

শুনেই, ডালিয়ার ভেতরটা বলে উঠতে চাইলো: মিথ্যে কথা, তুমি গ্লোরিয়াকে বিয়ে করে নিজের এবং তার দুটো জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যাচ্ছ। বাঙলা ভাষায় জনপ্রিয়তম গল্পলেখকের নায়িকার মতো ডালিয়া যদি একবার বলতে পারত কয়েক ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রুসলিলে যে ডালিয়ার জীবন নিয়ে যাতা করবার অধিকার রতন অর্জন করেছে, কিন্তু রতনের নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলবার অধিকার তাকে অথবা আর কাউকেই বিধাতা দেন নি, সে অধিকার এই বিপুল জগৎসংসারে একা ডালিয়ার, তাহলে বাঙলা বই হলে এই জায়গাটায় স্বামীকে দেখাতো সধবা পাঠিকা মাত্রেই। স্বামী যদি আবার লেখক হবার দুঃসাহস সত্ত্বেও বাঙলা বইয়ের একমাত্র পাঠক যে পাঠিকা একথা মনে না রাখার অমার্জনীয় অপরাধ করে থেকে থাকে তাহলে জায়গাটা শুনিয়ে স্ত্রীর বাঁধা প্রশ্ন ছিলো এখানে: তুমি

এরকম বই লিখতে পারো না একখানা? কিন্তু ডালিয়া কোনওরকম সিন না করে নেহাৎই বাস্তব জীবনে একজন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রমেয়ের যা বলা উচিত কেবল সেইটুকুই, একটি অক্ষর না বেশি, না কম, বললো: best of wishes—

রতনলাল মুন্সী যদি এর উত্তরে বলতো: মিথ্যে কথা; আমি যে কোথাও যাচ্ছিনা তা তুমি জানো: বাঙলা ছবির জনপ্রিয়তম নায়কের মতো গরুর চোখে যদি তাকিয়ে থাকতো ডালিয়ার দিকে; তারপর নায়িকার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলতে পারত: ডালিয়া ছেড়ে কোথাও যাবে রতন, একথা আর যেই বলুক, ডালিয়া একথা বিশ্বাস করতে পারে নিজের কানে শুনলেও, একথা বিশ্বাস হয় না রতনের,—তাহলে বাঙলা ছবি হলে স্বামীকে সচেতন করতো সধবা দর্শকমাত্রই। স্বামী যদি আবার চিত্রপরিচালক হবার দুঃসাহস সত্ত্বেও বাঙলা ছবির দর্শক যে একমাত্র লেডিস ক্লাস একথা মনে না রাখার অমার্জনীয় অপরাধ করে থেকে থাকে তাহলে এজায়গায় স্বামীকে কনুই দিয়ে খুঁচিয়ে স্ত্রীর বাঁধা ফিশফিশ ছিলো এখানে: তুমি এরকম ছবি করতে পারো না একখানা? কিন্তু রতন কোনওরকম সিন না করে নেহাৎই বাস্তবজীবনে এক পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রছেলের যা বলা উচিত, কেবল সেইটুকুই, একটি অক্ষর না বেশি না কম, বললো: thanks!

একটুখানি বসে থেকে উঠে গেলো ডালিয়া।

দীঘ। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে ঠিক সময়ে এসেছিল ঠিক মুহূর্তটি; রঙ ধরেছিলো নতুন করে আকাশের বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়া নীলচে দেওয়ালে; বাতাস বয়ে এনেছিলো ফুলের বন থেকে নতুন গন্ধ; উজ্জ্বল রৌদ্রে পাখা মেলেছিলো এক জোড়া পায়রা। ঠিক সেই শুভদৃষ্টির মুহূর্তে ছিঁড়ে গেল সেতারের তার। সুর লাগলোনা কিছুতেই। বুকের ভেতরটা গুমরে গুমরে উঠতে লাগলো বিদ্যাপতির সুরে: এভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্যমন্দির মোর।

ডালিয়া আসবার আগে যেমন, ডালিয়া চলে যাবার পরও তেমনই রতন বসে রইল চুপ করে।

রতনলাল মুন্সীর কাছ থেকে ফিরে ডালিয়া গেল রঞ্জনের কাছে। রঞ্জন ডরোথীর কাছ থেকে ছিটকে পড়ার পর নিরঞ্জন থেকে রঞ্জনই হয়নি কেবল; আমূল পরিবর্তন হয়েছে তার। সে পরিবর্তন নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু সে পরিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করবার যথেষ্ট অবসর যথাসময়ে মিলবে তার জন্যে আপাতত মাথাব্যথার কোনও যুক্তি অথবা কাহিনীসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছি না বলে পাঠিকার কৌতূহল এই মুহূর্তেই নিবৃত্ত করতে না পারার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয়। তার পরিবর্তে রঞ্জনের সঙ্গে ডালিয়ার যা কথাবার্তা হলো তার ট্রু-কপি নিম্নলিখিত অংশে মুদ্রিত হলো। ডালিয়া জানতো সন্ধ্যেবেলায় ডায়মাণ্ড স্লিপারে পাওয়া যাবেই রঞ্জনকে; ডায়মাণ্ড স্লিপার সেই কলকাতায় সেনসেশান করেছিলো। বিলিতি ক্লাবের দরজা থেকে ফিরে এসেছিলেন একজন বাঙালী সে যুগে; ক্লাবের দরজায় নিষেধাজ্ঞা লটকে দিয়েছিলো সাহেবরা: Indians and dogs are not allowed। ফিরে যাননি বটে আর বাঙালী ভদ্রলোক। কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মুখের মতো জুতো। বাঙালী সে যুগে ভদ্র ছিলো যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলো লোক। অন্তত যার কথা বলছি তিনি তাই ছিলেন। ফিরে এসেই রাতারাতি সাহেবদের ক্লাবের উল্টোদিকে প্রতিষ্ঠিত হলো ইণ্ডিয়ানদের ক্লাব: ডায়মাণ্ড স্লিপার। ডায়মাণ্ড স্লিপারের প্রবেশমুখে জ্বল জ্বল করতে লাগলো সাদা জমির ওপর দগদগে লাল অক্ষরে দাগানো: Dogs and Europeans,—both allowed! ব্যস আর কিছু করতে হয়নি প্রতিষ্ঠাতাকে। একমাস হবার আগেই ডায়মাণ্ড স্লিপারের সভ্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো পাঁচশোর কোটায়। সাহেবদের কাগজে ক্লাবের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিলো; দৈনিকপত্রে: Attention! members! please note the change of address। সেই ডায়মাণ্ড স্লিপারে ডালিয়া গিয়ে হাজির হবে ভাবতে পারেনি রঞ্জন। ডালিয়াকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে এলো রঞ্জন;

রঞ্জন: কিরে ডালিয়া? খারাপ খবর নাকি কিছু?

ডালিয়া ঃ খবর ভালো; তোমাকে একটা কাজ করতে হবে আমার জন্যে ঃ এখন নয়, কয়েক বছর পরে—

র ঃ পাগল না মাথা খারাপ,—কয়েক বছর বাদের একটা কাজের জন্যে এখন থেকে তৈরী থাকতে হবে? কি কাজ রে? দেশ স্বাধীন করার ব্রত না কি?

ডালিয়া ঃ না; তার চেয়ে দুরূহ ব্রত—

র ঃ কিন্তু রতন কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?

ডা ঃ বিলেত যাচ্ছে—

র ঃ একা?

ডালিয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে বললো ঃ বুঝেছি, তোমার যখনই দরকার হবে তখনই আমাকে পাবে। ডালিয়ার কথা থেকে রঞ্জন আন্দাজ করলো রতন ডালিয়াকে ঠকিয়েছে। বহুদিন বাদে আজ আবার বুকটা খচখচ করে উঠলো; না। বুকের কোনও অসুখ নেই। যেটা বাজে সেটা একটা অত্যন্ত বাজে মেয়ের ধোঁকা। মেয়েটির নামটাই শুধু ভারি মিষ্টি : ডরোথী।

রতন মুন্সীর রক্তে জিদের স্রোত বইতে আরম্ভ করছে আবার ডালিয়া চলে যাবার পরের মুহূর্ত থেকেই। গ্লোরিয়াকে বিয়ে করবার প্রতিজ্ঞা; ম্যাকডোনালডের মুখ কালো আদমীর চেয়েও কয়লা করে দেবার পৈশাচিক স্বপ্ন। মনে পড়ে গেল তার ধমনীতে কেবল সখারামের নয়; শোনিত আছে তার পিতামহ বিদ্যাধর মুন্সীর। বিদ্যাধর মুন্সীর ইতিহাস সখারামের চেয়ে অনেক বিচিত্র; অনেক এ্যাডভেঞ্চারাস। জার্ডন হেণ্ডারসানের একাউন্টবাবু ছিলেন তিনি : যে টাকা মাইনে পেতেন তার দশগুণ রোজগারে সংসার চালাতে এখন ধার; বিদ্যাধর সেই টাকার মধ্যে সংসার চালিয়ে দুখানা বাড়ি করে গেছেন মরবার আগে; ফুলের দোকানের সম্পন্ন করে দিয়ে গেছেন শুভমুহূর্ত উৎসব। সখারামের ঘরে লক্ষ্মীর আসন নিজের হাতে তিনিই পেতে রেখে গেছিলেন তাই সখারাম হতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত সখারাম যা হয়েছেন তাই।

জার্ডিন হ্যাণ্ডারসনের জার্ডিন একবার ছুটি নিয়ে বিলেত গেছেন; সেই সময়ে সদ্য হোম থেকে আগত লাল বুলডগ মুখ এলো জার্ডিনের জায়গায় অস্থায়ী হয়ে। এ সেই হনুমান লঙ্কায় যা করেছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী অগ্নিকাণ্ড বাধালো। সকলেই পেছনে ভেংচি কাটল বটে কিন্তু সামনে যমকে অথবা দ্বিতীয় পক্ষের বউকে দেখলে যেমন কোথায় কোন্ গর্তে মুখ লুকোবে ভেবে পায় না তেমনই সাহেব যদি ওমোড়ে তো এমোড়ে পিন পড়লেও শব্দ শুনতে পায় সারা অফিস। বিদ্যাধর মুন্সী কেবল সোল একসেপসন। অফিসে যে কেউ এসেছে নতুন খেয়ালই নেই তাঁর। সেই এক স্টাইল, এক অখিল ভাবতীয় কার্যক্রম এমন কি মুদ্রাদোষ পর্যন্ত অবিকল এক। পাতা ওলটাবার আগে প্রত্যেকবার জিভে আঙুল ঠেকিয়ে ইজি হওয়া। বিদ্যাধরকে সামনা-সামনি কিছু বলতে জার্ডিনের চেয়ারে নতুন অস্থায়ী এপয়েণ্টড সাহস করলোনা; কাবণ জার্ডিন বলে গিয়েছিলো আর সকলের ওপর হুকুম চলবে; চলবে না কেবল একাউণ্টবাবু বিদ্যাধরের ওপর একটি কথাও বলা। দাঁড়কাক মারফৎ কথাটা কানে এলো বিদ্যাধর মুন্সীর। অস্থায়ী বড় সাহেব না কি তাঁর জিভে আঙুল ঠেকানোকে আখ্যা দিয়েছেন ন্যাষ্টি, আব হিসেবপত্তব পাকাখাতায় তোলবার আগে মুখে-মুখে রাখার বদাভ্যাস হচ্ছে ক্লাম্‌সি। বিদ্যাধব একদিন সোজা ঢুকলেন নতুন অস্থায়ীব ঘরে; গিয়ে সমস্ত খাতাপত্তব টেবলের ওপব বাখলেন; তারপব বললেনঃ জার্ডিন বস, মুন্সী সার্ভেণ্ট, হিসেব face to face, আই ইউরাইন অন ইয়োর চাকরী,—এই বইলো তোমাব খাতা।

জার্ডিনেব কাছে খবব গেল বিলেতে কিন্তু রিটার্ণ মেলে এলো না কোনও ইনষ্ট্রাকশান। তার বদলে জার্ডিন এলো নিজেই ছুটি ক্যানসেল করে। নতুন সাহেবের পত্রপাঠ বিদায় এবং মুন্সীর আবাব যোগদান অনুষ্ঠিত হলো প্রায় একই সময়ে।

এই গেল একবার; আরেকবার যা ঘটলো তা হায়েস্ট কমেডি; হাসির নাম কান্নার এণ্টিক্লাইম্যাকস্। জার্ডিন সেবারে সত্যি সত্যি চলে

যাচ্ছে ; ছুটি নিয়ে নয়, রিটায়ার করে। ফেয়ারওয়েল হয়ে যাবার পর সবাই চলে গেছে। জার্ডিন গিয়ে উঠছে গাড়িতে, মালাটালা নিয়ে মুন্সী পুরাতন ভৃত্যের মতো তখনও চলেছে গাড়িতে তুলে দিতে। জার্ডিন গাড়িতে উঠে ভালো করে তাকাতে পারলো না মুন্সীর চোখে ; ধরা গলায় শুধু প্রায় অস্ফুট উচ্চারিত হলো : well—

মুন্সী জোড়হাত করে বলল : হেণ্ডাবসান গন ; জার্ডিন গোয়িং ;— তারপর নিজের দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে শেষ করে অসমাপ্ত বাক্য : only poor and co left—

জার্ডিন তাকায় বিদ্যাধর মুন্সীর দিকে, মুন্সী তাকায় জার্ডিনের দিকে, দুজনেরই চোখে জল।

এই বিদ্যাধর মুন্সীর পৌত্র সে, সাহেবের দেশে গিয়ে সাহেবের মুঠো থেকে মুক্ত করে আনবে সে গ্লোরিয়াকে। কলকাতা থেকে পালিয়ে ম্যাকডোনাল্ড্ ভেবেছে গ্লোরিয়াকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে কালা আদমীর নোংরা সংস্পর্শ থেকে। আর কয়েক মাস, তারপর গ্লোরিয়ার বাবা জানবে রতনলাল মুন্সী কেবল সখারাম মুন্সীর পুত্র নয়; রতনলাল মুন্সী সেই সঙ্গেই বিদ্যাধর মুন্সীর পৌত্রও বটে!

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ডরোথার কাছ থেকে ছিটকে পড়ার পর নিরঞ্জন কেবল রঞ্জন হলো যে তাই নয়; এতদিন যে লোকটাকে সবাই জানতো সেই নিরঞ্জন তলিয়ে গেলো বিস্মৃতির গহ্বরে ; তার বদলে জেগে উঠল যে সে আসল মানুষটার চেয়ে এত দূর যে কেবল নামের পরিবর্তন দিয়ে তার ব্যাখ্যা অসম্ভব। প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে বহু বৎসরের চর যেমন জলের অতলে মুছে যায় আবার সুনীল জলধর অতল থেকে উঠে আসে নতুন ডাঙা তেমনই মানব প্রকৃতিতেও বোধ হয় এমন বৈপ্লবিক অঘটন ঘটে থাকে। রত্নাকরের যেমন বাল্মীকি হতে বাধা হয়না এই ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ অসম্ভব অন্তর্বিপ্লবের ফলে তেমনই ব্রাহ্মণেব সন্তানেরও পরিবর্তিত হতে সময় নেয়না কালাপাহাড়ের ভূমিকায়। রঞ্জনও পালটে গেল , এত দ্রুত পাল্টালো যে ঘরে বাইরে যারা তার আত্মীয় অথবা বন্ধু, তারাও ধরতে পাবলো না, পরিবর্তনটা হলো কোথায় এবং কবে। ডরোথীকে ছাড়বার চার পাঁচ বছরের মধ্যেই ইনকাম ট্যাক্সেব চাকরিও বঞ্জনকে ছাড়লো। ছাড়লো নয়,– ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো, বলাই সঙ্গত। চাব পাঁচ বছরের মধ্যে ঘুষ নেবাব ক্ষেত্রে এতদূব পাকা হলো যে যাবা ঘুষেব খেলা খেলতে অভ্যস্ত তারাও অবাক হয়ে তাকিয়ে বইল উড়ন ভূবড়ি যেমন বিস্মিত হয় হাউইকে তারাদেব মুখে ছাই দিয়ে আসবার জন্যে সীমা লঙ্ঘন করতে দেখে। অবশ্য হাউয়ের যা হয় রঞ্জনের ভাগ্যে তার ব্যতিক্রম না হলেও পরিণতি আর্থিক বিচাবে ট্রাজিক হলো না কিন্তু। অর্থাৎ চাকবি যাবার মুহূর্তে দুশো আড়াইশো টাকার চাকরির প্রয়োজনীয়তা রইল না এতটুকু। দুশো আড়াইশো না হয়ে দুহাজার আড়াই হাজার টাকা মাসমাইনে হলেও চাকরি ছেড়ে দিতে একটু লাগলেও, সে আঘাতে ফাষ্ট এডের দরকার হলেও হতে পারত ; কিন্তু সে ইজ্জৎ চির যে হবার কোনওরকম সম্ভাবনা নেই তা

বুঝবার ডাক্তার ডাকা বাহুল্য হতো নেহাৎই। অর্থাৎ দাস মনোভাব বস্তুটাই বিদায় নিয়েছিলো রঞ্জনের ভেতর থেকে। তার বদলে জেগে উঠেছিলো নতুন চর ; সে চরের ভিন্ন দেশে ভিন্ন কালে বিভিন্ন পরিচয় কিন্তু তার চরিত্র আবহমানকাল ধরে এক। অর্থাৎ সোজা কথায়, অনেষ্ট মিন্‌স্ অভ লিভলিহুড়ের শাকচচ্চড়ি, সুখনিদ্রার নিবিড় রাত, বিপদে পড়লে অথবা না পড়েও চাইলে কাউকে না বলতে পারার উদার নিরঞ্জন রায়ের পবিবর্তে, দেখা গেল বাড়ি গাড়ির এফ্লুয়েন্স পোষাকের বাহার, নিত্যনতুন গ্ল্যামার গার্লের সঙ্গ এবং নানা চিন্তায় বিনিদ্ররাতেব কষ্ট ভুলতে পেগ পেগ তরল গরল গলাধঃকরণ করার গে ব্যাচেলর রঞ্জন রয়।

ডরোথীকে বাঁচাবার চিন্তায় যখন নিরঞ্জন উদভ্রান্ত প্রায় তখনও উজ্জ্বলকান্তি ঘোষালের কাছে যাবার মত যথেষ্ট জোর আনতে পারেনি পায়ে; ডরোথী-দুর্ঘটনাব পব ঘোষালের কাছেই গেল ; ঘোষালের কাছে নির্দ্বিধায় যেতে যার মুহূর্তকাল দেরী হলো না আর সে অবশ্য নিরঞ্জন নয় , রঞ্জন। ঘোষালের কাছে যাবাব উদ্দেশ্যও গোপন করলে না সে। ঘোষালের সঙ্গে তাব কথাবার্তা অনেকটা নিম্নলিখিত প্যাটার্ণ অবলম্বন করলো :

ঘোষাল : তোমাব এখন যা পোষ্ট তাতে ভাই খুচরোব বেশি তোমাকে কেউ দেবেনা , কাবণ দিলে যে দেবে তার কাজ তুমি করে দিতে পারবে না ; আর একথা বোঝবাব মতো বয়স তোমার নিশ্চয়ই হয়েছে, তুমি কোয়াইট ইন্টেলিজেন্ট ছেলে, যে গরু যত দুধ দেবে তারই ওপর নির্ভর করেছে চিরকাল, এবং চিরকাল নির্ভর করবে, তার কতখানি চাট গোয়ালা সহ্য করবে !

রঞ্জন : কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে এর ইমিজিয়েট পোস্টটা পেতেও আমাব এ্যাটলিস্ট বছর তিন দেরী আছে ; তাহলে ?

ঘো : তোমাকে আর আমি কি বলবো? তুমি শিক্ষিত ছেলে, আমি আকাট মুখ্যু :—সেই মহাজনবাক্য নিশ্চয়ই তোমার

স্মরণে আছে যে হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে—

র : আমার 'উইল'-এ সন্দেহ করবার আর কারণ নেই।

ঘো : তাহলে 'ওয়ে'ও পেয়ে যাবে নিঃসন্দেহে ; একটা নয় ; একশো ওয়ে আছে ওঠবার 'উইল' স্ট্রং হলে তেনম—

র : কি রকম ?

ঘো : অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করো বৎস ; আমি দেখাচ্ছি—

র : দেখাচ্ছি, মানে ?

ঘো : ধীরে রজনী ধীরে,—একসঙ্গে অত হজম করতে গেলে বদহজম হবে ভায়া ; চোঁয়া ঢেকুরের গন্ধে ধরা পড়ে যাবে তুমি কি খেয়েছ সেই বামাল সমেত ! দেখাচ্ছি মানে, আমি থিয়োরীর চেয়ে প্রাকটিক্যালে বিশ্বাস করি অনেক বেশি, বুঝেছ ?

র : আজ্ঞে না,—

ঘো : এই দেখো তোমার এই 'না'-ই বলে দিচ্ছে বছরের পর বছর বক্তৃতা দিলেও যে কাজ হয় না,—তাই মুহূর্তে সম্পাদিত হয় একবার হাতে কাজ করবার সুযোগ পেলে। তাই আমার উপদেশের চেয়ে অনেক বেশি জানতে, বুঝতে, শিখতে পারবে যদি নিজের চোখে একবার প্রত্যক্ষ করতে পার কেমনভাবে এই সব কাজকর্ম চলে ; কি পারবে না ?

র : আজ্ঞে হ্যাঁ—

ঘো : দেখ, শুনেই হ্যাঁ বলছ,– দেখলে কি বলবে কে জানে ! যাক, এখন সাড়ে সাতটাঃ - এইবার তুমি অপেক্ষা কর পর্দার ওপাশে ওই ড্রেসিং টেবলের কাছে যেখানে একদিন প্রথম যেবার এসেছিলে চোর ধরতে সেবারে খাতাগুলো আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম ওই টেবলের ওপর ; তুমি ভেবেছিলে যে তুমি সাঙ্ঘাতিক বামাল ধরেছ,—মনে আছে ?

রঞ্জন মাথা নীচু করে।

ঘো : ওইখানে চেয়ার আছে এবং চেয়ারে সম্ভবত ছারপোকা আছে ; তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না,—আর পাঁচমিনিট ওয়েট করো ওখানে। তারপর যার সঙ্গে আমাকে কথাবার্তা বলতে শুনবে তাকে এখানে দেখে এবং কি কারণে আগমন তা জানতে পেবে বাঘে কামড়ালেও চেয়ার ছেড়ে উঠতে পাববে না তুমি।

রঞ্জন এঘবের চেয়াব ছেড়ে উঠলো ওঘরের চেয়ারোদ্দেশে। ভাগ্যিস সঙ্গে সঙ্গে উঠেছিলো বঞ্জন : তাই। ওঘরে ভালো করে পৌছবার আগেই এ ঘবের বাইরে কলিং বেল বাজলো। ঘবে ঢুকেই আগন্তুক দারুণ লজ্জিত হয়ে বললো : চাব মিনিট আগে এসে পড়েছি ; খারাপ হয়নি তো ?

ঘোষাল : শুভকাজ যত তাড়াতাড়ি কবা যায় তত ভালো : অসাধু কাজে দেবী কবলেও কেলেঙ্কারী,—তাড়াতাডি করলেও ফল কখন কখনও মড়কং

এতক্ষণ কেবল কণ্ঠেব বাঁশি শুনেছিল বঞ্জন, এখনও পর্যন্ত আগন্তুককে চোখে দেখতে পায়নি এমন জায়গায় বসেছিলো সে। পুরো প্রোফিল চোখে পড়া মাত্তব প্রায় আওয়াজ কবে আশ্চর্য হচ্ছিলো, পড়তে পড়তে গোয়েন্দা গল্পের ডিটেকটিভ যেমন ঘাসের মুঠি ধবে বোধ করে অনিবার্য পতন তেমনই অবিশাস্য, তেমনই, অলীক তেমনই অবিশ্বাস্য ভাবে নিজেব কণ্ঠস্ববেব দ্বাব রুদ্ধ কবলো কোনও রকমে রঞ্জন। বিনোবা ভাবেকে ট্রাউজাব পবতে দেখলে কিম্বা সুনীতি চাটুজ্যেকে সিনেমাব কাগজের পরবর্তী সংখ্যায় যাবা যাবা লিখছেন তাঁদেব তালিকায় উপস্থিত দেখলে যে অবাক হবাব সম্ভাবনা, বঞ্জন যাকে সেই মুহূর্তে ঘোষালের ঘরে ঢুকতে দেখে উপস্থিত হলো বহন কবা প্রায় অসম্ভববিস্ময়েব প্রান্ত সীমায়, তা, তুলনায় নেহাৎই আকিঞ্চিৎকব। বছব পঁয়ত্রিশ আগেকাব কলকাতায় বাঙালীদের নেতৃস্থানীয় সেই মহাপুরুষেব আসল নাম এখানে দিলে এখনও বিস্ময় কিছু কম হবে না ; তার কারণ ইনি ধরা

পড়বার আগেই ধরাধাম ত্যাগ করে গেছেন। যারা বলে ক্রাইম ডাস নট পে, অথবা পাপ কখনও চাপা থাকে না তারা সে কলকাতা এবং এ কলকাতায় তো বটেই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই সেই হতভাগ্য শ্রেণীদের প্রতিনিধি যাদেব বোঝানো কিছুই নয় যে গতজন্মে একজন সুকর্ম করেছে বলেই এজন্মে তার এত সুখ। সেও যদি এজন্মে নির্বিবাদে সব হজম করে, পাণ্ডাদেব প্রণামী দেয়, পাবলিক ম্যানকে চাঁদা, ভাগ্য বলে মেনে নেয় সব তাহলে আগামী জন্মে সে-ও রাজা না হোক বাজকর্মচাবী হবে নিশ্চয়ই। যদি ভালো লোকের নির্যাতন আব মন্দ লোকেব অনায়াস অব্যাহত জীবন-যাত্রায় ফাটল ধরে তাব পুনর্জন্মবাদেব সুবিধাবাদী ব্যাখ্যায় তাহলে, তাব আগেই, সে দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হতে দেবাব পূর্বাহ্ণেই শবণ নেওযা হয পুবাতন ইংবেজী বাকধাবাব: Prevention is better than cure। সেই ধাবা স্মবণ করে তৈরী হয়ে থাকে এই সান্ত্বনা যে যাবা অন্যায বাস্তায এগিযে গেছে তাবা খাযদায় বটে, তাবা কিন্তু রাতে ঘুমোয় না। তাদেব সংসাবে অশান্তিব শেষ নেই।

শুনে মেনে নেয় যাবা, মানবাব জন্যে, সংসাবেব সমস্ত দুঃখকষ্ট অন্যায় অবিচাবেব সঙ্গে মানিয়ে নেবাব জন্যেই তাদেব জন্ম। ক্যাপি-টালিষ্ট এবং সর্বহাবাব দ্বন্দ্বে যাদেব প্রাণ যায চিবকাল বাজায় বাজায় যুদ্ধে উলুখড়েব মতো,—আজ তাদেব বিত্তহীনতাব লজ্জা ঢাকবার জন্যে নিজেদেব জাহিব কবে মধ্যবিত্ত বলে, তারা চিবকাল ছিলো এক নামে, আজ পবিচিত হোক যে নামেই, আগামী কালেও তাবা থাকবে আবেক নামে। ঠিক বাছতে গাঁ উজোড়ের দুর্দিনে দৈবাৎ ধরা পড়লে কেউ, জাল ছিড়ে বেরুবাব কৌশল ভালো কবে আযত্ত কববার আগেই জেলে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাবাদী নীতিশাস্ত্রকাবদেব মওকা আসে; উচ্চগ্রামে ওঠে উৎফুল্ল কণ্ঠ: দেখেছ, পাপেব সাজা হয কিনা। বলতে সাধ হয় তাদেব, কিন্তু সাধ্য হয় না যে, ধবা পড়েছে যাবা তাবা তো কেউ বাঘব বোয়াল নয, তারা তো চুনোপুঁটি মাত্তব। বলতে সাধ হয় তাদেব যে রাত্রিতে পাপেব পথে যাদেব বোজগাব তাদের ঘুম

হয় কিনা তারা জানে না; কিন্তু এটুকু জানে যে রাতে না ঘুমোলেও দিনের বেলা ঘুমোবার অবসর মেলে তাদের; এমনই ঘুম না হলে মেলে ঘুমের ওষুধ। কিন্তু মধ্যবিত্ত যারা সব দেশে সব কালে বিশ্বাস করেছে, অনেষ্টি ইস দ্য বেষ্ট পলিসি, তারা সকালে বাজার কি দিয়ে হবে-র চিন্তায় রাতে ঘুমোতে না পারলেও, উঠতে বাধ্য হয়েছে অন্য দিনের চেয়ে আরও সকাল-সকাল। দারুন ঘুষখোর কারুর একমাত্র সন্তানের অপঘাত-মৃত্যু হলে সমাজের সব ধূর্ত শেয়ালের এক রা শুনেছে কেবল: ওই দেখ, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। বেচারা মধ্যবিত্ত ধর্মভারু শান্তি-প্রিয় আইনমানা নাগরিকদের সাধ হয়েছে, কিন্তু সাধ্য হয় নি অর্বাচীন প্রশ্ন কবতে: তবে কেন, সমস্ত জীবন দিয়ে যিনি ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেলেন তাঁর কণ্ঠনালিতে দেখা দেয় দুরাবোগ্য কান্সার? যদি কখনও সাধ্য হয় একজন দুঃসাহসীরও সেই আতঙ্কে ধর্মের ধ্বজাধারীরা সাধ মিটিয়ে সাফাই গেয়েছেন: সকলের পাপ একা গ্রহণ করেছেন যিনি তিনি পুরুষোত্তম হলেও শরীরধারী পুরুষ বলে শরীরের ধর্ম অস্বীকার করবেন কেন? দুরারোগ্য অসুখে তাই সকল মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন তিনি একা।

রঞ্জন এই হতভাগ্য মধ্যবিত্তদেব একজন না হলে যাকে ঘোষালের কাছে দেখে চমকে উঠেছিলো অতখানি, অতখানি কেন, সম্ভবত একটুও অবাক হতো না। বরং অবাক হতো আরও, সীজারের স্ত্রীর মতো যার চরিত্র প্রশ্নের উর্দ্ধে এমন কোনও আরও নিষ্কলঙ্ক কাউকে না দেখে। তাছাড়া রঞ্জনের তখন বয়স হয়নি। বয়স হলে, মাথার চুল উঠে যায়, দাঁত পড়ে যায়, চামড়া কুঁচকে যায়, দৃষ্টি চলে যায়; কিন্তু সকলের আগে চলে যায় বিস্ময় বোধ। রঞ্জনের বয়স তখনও অবাক হবার পালা করেনি অতিক্রম। কাজেই ঘরের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সেই মহাপুরুষের দর্শন পাবার পর এবার ঘোষালের সঙ্গে তার কথাবার্তা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইল। একটুক্ষণ শুনেই বুঝলো মোটা একটা ঘুঁসের টাকা একজন দিতে রাজী হয়েছে কিন্তু সরাসরি নিতে সাহস পাচ্ছেন না ভদ্রলোক। অথচ তাঁর নিজের এমন বিশ্বাসী কেউ নেই যার মারফৎ

পাওয়া সহজসাধ্য হয়। এই অবস্থায় ঘোষাল বলছেন তাঁর জানা একজন লোক আছে যে অনায়াসে উদ্ধার করতে পারে কাজ যৎসামান্য কিছু পেলে। নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোক জানতে চাইলেন যাকে দেবেন ঘোষাল সে খাঁটি লোক তো। ঘোষাল দেশলায়ের ওপর সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে জবাব দেন : কাকে দিচ্ছি সেটাই দেখছেন কেন শুধু ? কে দিচ্ছে সেটা দেখবেন না। আজকের কলকাতায় স্বামীর নাম ভুল-ক্রমে বেরিয়ে গেলে বউরা কি করে বলা শক্ত, কিন্তু সেদিন স্বামীব নাম নিয়ে ফেললে স্বপ্নের মধ্যেও যেমন আধহাত জিভ কাটতো তেমনই লজ্জা পাবার চেষ্টা করে ভদ্রলোক আমতা আমতা করেন : না, মানে, ইয়ে; ভয় কবে কিনা ঘোষাল মশাই। ঘোষালেব মুখে বিরক্তিব চিহ্ন ঘামের মতো ফুটে ওঠে; নাচতে নেমে ঘোমটা দিলে পেটও ভবে না জাতও যায়; আপনি এ লাইনে তো নতুন নয় স্যর—। উঠে পড়েন আগন্তুক অতঃপর : তাহলে ওই কথাই রইলো; যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন—।

আগন্তুকের শেষ কথাটা শুনে উজ্জ্বলকান্তি ঘোষাল এমন একখানা মুখ কবলেন পর্দার আড়াল থেকে তা দেখে, সে দুঃখে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে মায়ের অথচ একেবারে বাচ্চা ছেলের অবুঝ প্রশ্নে হেসে ফেলেন ওই দুঃখের মধ্যেই, তারই মতো একরকম দুর্দান্ত টেনস মোমেন্টও রঞ্জনেব বহুবার শোনা মাকালীব গল্প আবেকবার মনে পড়লো। মাকালীব কাছে সওয়া পাঁচানাব পূজো দিয়ে এক ভক্ত বলছে : মা, আমি জানি আজ সকালেই ষোড়ষোপচাবে তোমার পূজো দিয়ে গেছে আমাবই এক প্রতিবেশী যাতে তার ছেলে চাকরিটা পায়; কিন্তু তাব ছেলের চাকরি না হলেও যে চলে এবং আমাব ছেলের না হলে যে আমার চলে না তার প্রমাণ তার ষোড়োষোপচার এবং আমার সওয়া পাঁচানা। শুনে সেই ভক্তের ভেতব থেকে মা স্বয়ং বলে ওঠেন, তোরা কেউ জানিস নে, আবও ভোরে একজন তার ছেলের ওই চাকরিরই জন্যে খালি হাতে প্রণাম করে গেছে। প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুযায়ী যদি কারুর ছেলেব সে চাকরী প্রাপ্য হয় তাহলে ষোড়োষোপচারেব চেয়ে

সওয়া পাঁচানার দাবী যেমন আগে তেমনই হাতের মুঠোয় যার খুদ ছাড়া আর জোটেনি কিছু তারই দাবী সর্বাগ্রে কি না তুইই বল। শুনে ভক্ত চলে যায়; যাবার আগে বলে যায়ঃ তাহলে তোমার যা'চ্ছে তাই কোরো। এবারে ভক্তের মনের মধ্যে শ্রুত হয় মায়ের হাসি; সে হাসি একথাই বোধ হয় বলতে চায়ঃ আমার যা ইচ্ছে তাইতো করি; মিথ্যে কেন তোরা পূজো, মানসিক, আর হত্যে দিয়ে মরিস, সে তোরাই জানিস কেবল; আমি সব জানি কিন্তু আমিও তা জানিনে। 'যা ভালো বুঝবেন, তাই করবেন'—বলে সেই মহাপুরুষ যখন যাবার আগে তাকালেন ঘোষালের দিকে, তখন মা কালীর গল্প যাদের জানা আছে তাদের অবধারিত মনে পড়বে ঘোষালের হাসিতে মাকালীর হাসির কথাই।

আগন্তুকের জুতোর শব্দ দরজার বাইরে হাওয়া হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রায় লাফিয়ে এসে প্রবেশ করে রঞ্জন রায়। কথামালার ভালুক আর দুই বন্ধুর কথায় ভালুক চলে গেলে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়া সেই বন্ধুর মতোই অনেকটা; বিপদ বুঝে যে গাছের মগডালে গিয়ে উঠেছিলো প্রাণের বন্ধুকে ভাল্লুকের নখরে অসহায় সমর্পণ করে। ঢুকতেই ঘোষাল বললেনঃ টাইম, প্লেস এবং ভিজিটের উদ্দেশ্য অবগত হয়েছ এতক্ষনে বৎস; অতএব এখন থেকেই তৈরী থেক; ঠিক সময়ে যথাস্থানে কাজ হাসিল করে হাতেখড়ি হোক তোমার নতুন মহান বৃত্তিতে। কাজ হাসিল খালি হাতে করতে হবে না; হাসিলের আগেই বাঁ হাতে যা সরিয়ে রাখবে তোমার ডান হাত যেন না জানে,—মনে রেখো এই প্রফেসনের একমাত্র বাণীই হচ্ছে এই।

যাবার আগে রঞ্জন উজ্জ্বলকন্তি ঘোষালের মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায়; ঘোষাল কিছু না জিজ্ঞেস করেই জিজ্ঞেস করেন চোখ দিয়ে; কিছু বলবে? রঞ্জন বলেঃ একটা কথা জানবার ইচ্ছে করছে ভারি,— যদি কিছু না মনে করেন—। ঘোষাল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলেনঃ মনে করবার অথবা একটা কথার পাঁচরকম মানে করবার, কোনটারই বয়স নেই ব্রাদার; একটা কথার একটাই মানে হয় আজ আমার কাছে এবং

সেই একটা কথার যে মানেই হোক একটা তাতে হার্ট না হবার মতো হার্টও আছে আমার। অতএব নির্ভয়ে বলতে পার তুমি—

রঞ্জন জিজ্ঞেস করে: আপনি কতদূর পড়েছেন? হো হো করে হেসে ওঠেন ঘোষাল; হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে আসে প্রায় তবু থামতে চায় না অট্টহাসি। এমন কি হাসির কথা বলেছে ভেবে ভেবে কূলকিনারা করতে পারে না রঞ্জন। হাসি থামলে ঘোষাল দারুণ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন: আমার লেখাপড়া ওই ফার্স্ট বুক পর্যন্ত। তারপর রঞ্জনের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন, তখন আবার বলেন: বিশ্বাস হলো না বুঝি? বিশ্বাস করো সত্যিই ফার্ষ্ট বুক অব্দি আমার বিদ্যে; এবং আরও বিশ্বাস করো এম-এ বি-এ পাস করতে হয় না, করে খাবার জন্যে; গোটা ফার্স্ট বুক পড়বারও হয় না দরকার; কেবল একটা কথা জীবনের আরম্ভেই মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হয়; সেই কথা যারা গেঁথে নিতে পেরেছে মগজে তারাই গেঁথেছে চিরকাল শিকার; তারাই সংসারে সার চিনেছে; বাকী যারা তারা সংসারের সং চিরকাল—।

ঘোষাল নিজে থেকেই হয়তো বলতেন ফার্স্ট বুকের সেই ফার্স্ট এবং লাস্ট ওয়ার্ড; জীবনের সেই বীজমন্ত্রটি। হয়তো কেন,—নিশ্চয়ই বলতেন ঘোষাল। তবু উদগ্র আগ্রহ দমন করতে না পারায় রঞ্জনের মুখ দিয়ে তখন বেরিয়ে গেছে ধনুক থেকে বেরিয়ে যাওয়া তীরের মতো: ফার্স্ট বুকের কোন্ কথাটা বলবেন?

ঘোষাল: A sly fox met a hen.

দুই

নিরঞ্জন রায়ের খোলস ছেড়ে যতদিনে বেরুচ্ছে রঞ্জন রয় ততদিনে হাত পা গুটিয়ে বসে নেই বিদ্যাধর মুন্সীর পৌত্র, সখারাম মুন্সীর পুত্র শ্রীমান রতনলাল মুন্সী। রতন বাপকা বেটা হলে কেবল সিপাই কো ঘোড়া হতো; বড় জোর হতো কুছ নেই তো থোড়া থোড়া। কিন্তু

রতনলাল কেবল সখারামের সন্তান নয়,—বিত্তাধরের রক্ত তার শিরায় বইছে যে একথা বিস্মৃত হয় সে কি করে। তাই নির্দিষ্ট দিনে সে ভারতের মাটি ত্যাগ করলো ; মায়ের আশীর্ব্বাদে নির্দিষ্ট তারিখে পা দিলো সাদাম্প্‌টনেব টিলবেরি পোতাশ্রয়ে। এখান থেকে নিয়ে যাওয়া ইন্ট্রো-ডাকশানকে থ্যাঙ্কস, ফিল্মের কাজে লেগে গেল কয়েকদিনের মধ্যে। এবং বাপেব আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো যেদিন ফিল্মকোম্পানীর চেয়ারম্যানের কাছে ডাক পড়লো এই কালা আদমীর। রতনলাল মুন্সী তখনও পর্যন্তো জানতো না যে যার সঙ্গে সে দেখা করতে যাচ্ছে সে ম্যাকডোনাল্‌ড ; গ্লোরিয়ার বাবাও তখনও পর্যন্ত জানতো না যে রতন-লাল মুন্সীই ইণ্টাবভিউই। সাক্ষাৎ হলো সাপেনেউলে। চাকরি অথবা ফিল্‌ম্ স্টুডিওব কথা উড়ে গেলো ; গ্লোরিয়াকে নিয়ে পড়লো দুজনেই। ফাইন্যাল এই ঠিক হলো যে এসব কথা এখানে ডিসকাস করতে রাজি নয় স্যার অলিভার ম্যাকডোনাল্‌ড। রতনকে বাড়ি যেতে বলতে রতন জবাব দিলো ম্যাকডোনাল্‌ড্ তাকে যেখানে যেতে বলবে সেখানেই সে যাবে ; আপ টু দি এণ্ড অভ দিস ওয়ার্ল্ড। সেকথা নয়, কিন্তু ম্যাকডোনাল্‌ড্ যেন জরুরী তার পেয়ে আবাব ভাবতবর্ষে চলে না যায়, রতন এখন লণ্ডনে আছে কিছুদিন, এই নিশ্চিন্ততায়। অবশ্য ম্যাকডোনাল্ডেব এতদিনে এ অভিজ্ঞতা অবশ্যই হয়েছে যে যেখানেই যাক গ্লোরিয়াকে নিয়ে, রতনলাল আজ হোক, কাল হোক, একদিন সেখানে যাবেই। কথাটাব মধ্যে এতদূর ব্লাণ্ট ট্রুথ ছিলো যে ম্যাক-ডোনাল্‌ড্-এর বুলডগমুখে সিঁদুর মাখিয়ে দিলো যেন কেউ।

রতন যেদিন ম্যাকডোনাল্ডেব বাড়ি গিয়ে হাজির হলো সেদিন ম্যাকডোনাল্‌ড্ বাড়িতেই ছিলেন। ছিলেন, তার কারণ গ্লোরিয়ার দিক থেকে নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি। দার্জিলিংএ আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার কবে আনার কৃতিত্বে একটা টেম্পরারি ইনফ্যাচুয়েশানের কারণেই সে ভাবতবর্ষের মাটিতে 'না' কবতে পারেনি। তাবপব ওয়াটারলু ব্রীজেব তলায় বয়ে গেছে অনেক জল, এতদিনে গ্লোরিয়া নিশ্চয়ই বুঝেছে যে সাদায় কালোয় দ্বন্দ্বই হয় দুজনে মিলে ; ছন্দ হয় না একটা।

সমাধির পুণ্যলগ্ন পায়ে হেঁটে নিজে থেকেই রতনের মনের দোরগড়ায় এসে হাজির হলো। কিন্তু দুজনেরই দুর্ভাগ্য ভেতরে ঢুকবার আদেশ না পেয়ে ফিরে গেলো আবার যেমন এসেছিলো তেমনই।

ডালিয়া জিজ্ঞেস করলো : শুনলাম বিলেত যাচ্ছ? ডালিয়ার মন বলতে চেয়েছিলো কার কাছে বাহাদুরী দেখাবার জন্যে দুজনেরই সর্বনাশ করতে উদ্যত রতন। কিন্তু মুখ দিয়ে তার পরিবর্তে যা বেরুলো তা ওই নেহাৎই কাট এণ্ড ড্রাই : শুনলাম, বিলেত যাচ্ছ?

রতন মনে মনে এ প্রশ্ন আন্দাজ করেছিলো; মনে মনে উত্তরও তৈরী করে রেখেছিলো তার। তার মন বোধ হয় বলতে চেয়েছিলো : যাচ্ছি শুনেও ডালিয়া এতদিন চুপ করে বসে থেকেছিলো কোন্ সাহসে। তার মাথায় এটুকু ঢুকলো না যে ডালিয়ার সঙ্গে তার ঝগড়া পর্যন্ত হয়নি যে ডালিয়া ক্ষমা চাইবে; বিলেত গেলে ডালিয়াকে বিয়ে করে সস্ত্রীক যাবার আমন্ত্রণই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই অপেক্ষা করছিলো ডালিয়া একা নয়,—ডালিয়ার বাড়ির ইঁট, চূণ, সুরকি পর্যন্ত, সবাই, সব কিছুই। কিন্তু রতনের গলা তার বদলে উচ্চারণ করলো : হ্যাঁ; মুভি স্টুডিওতে ফিল্ম্ তোলা শিখতে যাব, ভাবছি।

শুনেই, ডালিয়ার ভেতরটা বলে উঠতে চাইলো : মিথ্যে কথা; তুমি গ্লোরিয়াকে বিয়ে করে নিজের এবং তার দুটো জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যাচ্ছ। বাঙলা ভাষায় জনপ্রিয়তম গল্পলেখকের নায়িকার মতো ডালিয়া যদি একবার বলতে পারত কয়েক ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রুসলিলে যে ডালিয়ার জীবন নিয়ে যাতা করবার অধিকার রতন অর্জন করেছে; কিন্তু রতনের নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলবার অধিকার তাকে অথবা আর কাউকেই বিধাতা দেন নি; সে অধিকার এই বিপুল জগৎসংসারে একা ডালিয়ার, তাহলে বাঙলা বই হলে এই জায়গাটায় স্বামীকে দেখাতো সধবা পাঠিকা মাত্রেই। স্বামী যদি আবার লেখক হবার দুঃসাহস সত্ত্বেও বাঙলা বইয়ের একমাত্র পাঠক যে পাঠিকা একথা মনে না রাখার অমার্জনীয় অপরাধ করে থেকে থাকে তাহলে জায়গাটা শুনিয়ে স্ত্রীর বাঁধা প্রশ্ন ছিলো এখানে : তুমি

এরকম বই লিখতে পারো না একখানা? কিন্তু ডালিয়া কোনওরকম সিন না করে নেহাৎই বাস্তব জীবনে একজন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রমেয়ের যা বলা উচিত কেবল সেইটুকুই, একটি অক্ষর না বেশি, না কম, বললো : best of wishes—

রতনলাল মুন্সী যদি এর উত্তরে বলতো : মিথ্যে কথা; আমি যে কোথাও যাচ্ছিনা তা তুমি জানো : বাঙলা ছবির জনপ্রিয়তম নায়কের মতো গরুব চোখে যদি তাকিয়ে থাকতো ডালিয়ার দিকে; তারপর নায়িকার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলতে পারত : ডালিয়া ছেড়ে কোথাও যাবে রতন, একথা আর যেই বলুক, ডালিয়া একথা বিশ্বাস করতে পারে নিজের কানে শুনলেও, একথা বিশ্বাস হয় না রতনের,—তাহলে বাঙলা ছবি হলে স্বামীকে সচেতন করতো সধবা দর্শকমাত্রই। স্বামী যদি আবার চিত্রপরিচালক হবার দুঃসাহস সত্ত্বেও বাঙলা ছবিব দর্শক যে একমাত্র লেডিস ক্লাস একথা মনে না রাখার অমার্জনীয় অপরাধ করে থেকে থাকে তাহলে এজায়গায় স্বামীকে কনুই দিয়ে খুঁচিয়ে স্ত্রীর বাঁধা ফিশফিশ ছিলো এখানে : তুমি এরকম ছবি করতে পাবো না একখানা? কিন্তু রতন কোনওরকম সিন না কবে নেহাৎই বাস্তবজীবনে এক পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রছেলের যা বলা উচিত, কেবল সেইটুকুই, একটি অক্ষর না বেশি না কম, বললো : thanks!

একটুখানি বসে থেকে উঠে গেলো ডালিয়া।

দীর্ঘ। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে ঠিক সময়ে এসেছিল ঠিক মুহূর্তটি; রঙ ধবেছিলো নতুন করে আকাশের বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়া নীলচে দেওয়ালে; বাতাস বয়ে এনেছিলো ফুলের বন থেকে নতুন গন্ধ; উজ্জ্বল রৌদ্রে পাখা মেলেছিলো এক জোড়া পায়রা। ঠিক সেই শুভদৃষ্টির মুহূর্তে ছিঁড়ে গেল সেতাবের তাব। সুব লাগলোনা কিছুতেই। বুকের ভেতবটা গুমরে গুমরে উঠতে লাগলো বিদ্যাপতির সুবে : এভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্যমন্দির মোর।

ডালিয়া আসবার আগে যেমন, ডালিয়া চলে যাবার পরও তেমনই রতন বসে রইল চুপ করে।

রতনলাল মুন্সীর কাছ থেকে ফিরে ডালিয়া গেল রঞ্জনের কাছে। রঞ্জন ডরোথীর কাছ থেকে ছিটকে পড়ার পর নিরঞ্জন থেকে রঞ্জনই হয়নি কেবল; আমূল পরিবর্তন হয়েছে তার। সে-পরিবর্তন নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু সে পরিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করবার যথেষ্ট অবসর যথাসময়ে মিলবে তার জন্যে আপাতত মাথাব্যথার কোনও যুক্তি অথবা কাহিনীসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছি না বলে পাঠিকার কৌতূহল এই মুহূর্তেই নিবৃত্ত করতে না পারার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয়। তার পরিবর্তে রঞ্জনের সঙ্গে ডালিয়ার যা কথাবার্তা হলো তার ট্রু-কপি নিম্নলিখিত অংশে মুদ্রিত হলো। ডালিয়া জানতো সন্ধ্যেবেলায় ডায়মাণ্ড স্লিপারে পাওয়া যাবেই রঞ্জনকে; ডায়মাণ্ড স্লিপার সেই কলকাতায় সেনসেশান করেছিলো। বিলিতি ক্লাবের দরজা থেকে ফিরে এসেছিলেন একজন বাঙালী সে যুগে; ক্লাবের দরজায় নিষেধাজ্ঞা লটকে দিয়েছিলো সাহেবরা: Indians and dogs are not allowed। ফিরে যাননি বটে আর বাঙালী ভদ্রলোক। কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মুখের মতো জুতো। বাঙালী সে যুগে ভদ্র ছিলো যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলো লোক। অন্তত যার কথা বলছি তিনি তাই ছিলেন। ফিরে এসেই রাতারাতি সাহেবদের ক্লাবের উল্টোদিকে প্রতিষ্ঠিত হলো ইণ্ডিয়ানদের ক্লাব: ডায়মাণ্ড স্লিপার। ডায়মাণ্ড স্লিপারের প্রবেশমুখে জ্বল জ্বল করতে লাগলো সাদা জমির ওপর দগদগে লাল অক্ষরে দাগানো: Dogs and Europeans,—both allowed! ব্যস আর কিছু করতে হয়নি প্রতিষ্ঠাতাকে। একমাস হবার আগেই ডায়মাণ্ড স্লিপারের সভ্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো পাঁচশোর কোটায়। সাহেবদের কাগজে ক্লাবের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিলো; দৈনিকপত্রে: Attention! members! please note the change of address। সেই ডায়মাণ্ড স্লিপারে ডালিয়া গিয়ে হাজির হবে ভাবতে পারেনি রঞ্জন। ডালিয়াকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে এলো রঞ্জন:

রঞ্জন: কিরে ডালিয়া? খারাপ খবর নাকি কিছু?

ডালিয়া: খবর ভালো; তোমাকে একটা কাজ করতে হবে আমার জন্যে: এখন নয়, কয়েক বছর পরে—

র: পাগল না মাথা খারাপ,—কয়েক বছর বাদের একটা কাজের জন্যে এখন থেকে তৈরী থাকতে হবে? কি কাজ রে? দেশ স্বাধীন করার ব্রত না কি?

ডালিয়া: না; তাব চেয়ে দুরূহ ব্রত—

র: কিন্তু রতন কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?

ডা: বিলেত যাচ্ছে—

র: একা?

ডালিয়াকে চুপ কবে থাকতে দেখে বললো: বুঝেছি, তোমার যখনই দরকার হবে তখনই আমাকে পাবে। ডালিয়ার কথা থেকে রঞ্জন আন্দাজ করলো রতন ডালিয়াকে ঠকিয়েছে। বহুদিন বাদে আজ আবার বুকটা খচখচ করে উঠলো; না। বুকের কোনও অসুখ নেই। যেটা বাজে সেটা একটা অত্যন্ত বাজে মেয়ের ধোঁকা। মেয়েটির নামটাই শুধু ভারি মিষ্টি: ডরোথী।

রতন মুন্সীর রক্তে জিদের স্রোত বইতে আরম্ভ করছে আবার ডালিয়া চলে যাবার পরের মুহূর্ত থেকেই। গ্লোরিয়াকে বিয়ে করবার প্রতিজ্ঞা; ম্যাকডোনালডের মুখ কালো আদমীর চেয়েও কয়লা করে দেবার পৈশাচিক স্বপ্ন। মনে পড়ে গেল তার ধমনীতে কেবল সখারামেব নয়; শোনিত আছে তার পিতামহ বিদ্যাধব মুন্সীর। বিদ্যাধর মুন্সীর ইতিহাস সখারামের চেয়ে অনেক বিচিত্র; অনেক এ্যাডভেঞ্চারাস। জার্ডন হেণ্ডারসানের একাউন্টবাবু ছিলেন তিনি; যে টাকা মাইনে পেতেন তার দশগুণ বোজগাবে সংসাব চালাতে এখন ধার; বিদ্যাধব সেই টাকার মধ্যে সংসার চালিয়ে দুখানা বাড়ি করে গেছেন মরবার আগে; ফুলের দোকানের সম্পন্ন করে দিয়ে গেছেন শুভমুহুর্ত উৎসব। সখারামেব ঘরে লক্ষ্মীর আসন নিজের হাতে তিনিই পেতে রেখে গেছিলেন তাই সখাবাম হতে পেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত সখারাম যা হয়েছেন তাই।

জার্ডিন হ্যাণ্ডারসনের জার্ডিন একবার ছুটি নিয়ে বিলেত গেছেন; সেই সময়ে সন্থ হোম থেকে আগত লাল বুলডগ মুখ এলো জার্ডিনের জায়গায় অস্থায়ী হয়ে। এ সেই হনুমান লঙ্কায় যা করেছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী অগ্নিকাণ্ড বাধালো। সকলেই পেছনে ভেংচি কাটল বটে কিন্তু সামনে যমকে অথবা দ্বিতীয় পক্ষের বউকে দেখলে যেমন কোথায় কোন্ গর্তে মুখ লুকোবে ভেবে পায় না তেমনই সাহেব যদি ওমোড়ে তো এমোড়ে পিন পড়লেও শব্দ শুনতে পায় সারা অফিস। বিদ্যাধর মুন্সী কেবল সোল একসেপসন। অফিসে যে কেউ এসেছে নতুন খেয়ালই নেই তাঁর। সেই এক স্টাইল, এক অখিল ভারতীয় কার্যক্রম এমন কি মুদ্রাদোষ পর্যন্ত অবিকল এক। পাতা ওলটাবার আগে প্রত্যেকবার জিভে আঙুল ঠেকিয়ে ইজি হওয়া। বিদ্যাধরকে সামনা-সামনি কিছু বলতে জার্ডিনের চেয়ারে নতুন অস্থায়ী এপয়েণ্টড সাহস করলোনা; কারণ জার্ডিন বলে গিয়েছিলো আর সকলের ওপর হুকুম চলবে; চলবে না কেবল একাউণ্টবাবু বিদ্যাধরের ওপর একটি কথাও বলা। দাঁড়কাক মারফৎ কথাটা কানে এলো বিদ্যাধর মুন্সীর। অস্থায়ী বড় সাহেব না কি তাঁর জিভে আঙুল ঠেকানোকে আখ্যা দিয়েছেন ন্যাষ্টি; আর হিসেবপত্তর পাকাখাতায় তোলবার আগে মুখে-মুখে রাখার বদাভ্যাস হচ্ছে ক্লাম্‌সি। বিদ্যাধর একদিন সোজা ঢুকলেন নতুন অস্থায়ীর ঘরে; গিয়ে সমস্ত খাতাপত্তর টেবলের ওপর রাখলেন; তারপর বললেন: জার্ডিন বস, মুন্সী সার্ভেণ্ট; হিসেব face to face; আই ইউরাইন অন ইয়োর চাকরী,—এই রইলো তোমার খাতা।

জার্ডিনের কাছে খবর গেল বিলেতে কিন্তু রিটার্ণ মেলে এলো না কোনও ইনষ্ট্রাকশান। তার বদলে জার্ডিন এলো নিজেই ছুটি ক্যানসেল করে। নতুন সাহেবের পত্রপাঠ বিদায় এবং মুন্সীর আবার যোগদান অনুষ্ঠিত হলো প্রায় একই সময়ে।

এই গেল একবার; আরেকবার যা ঘটলো তা হায়েস্ট কমেডি; হাসির নাম কান্নার এণ্টিক্লাইম্যাকস্। জার্ডিন সেবারে সত্যি সত্যি চলে

যাচ্ছে ; ছুটি নিয়ে নয়, রিটায়ার করে। ফেয়ারওয়েল হয়ে যাবার পর সবাই চলে গেছে। জার্ডিন গিয়ে উঠছে গাড়িতে, মালাটালা নিয়ে মুন্সী পুরাতন ভৃত্যের মতো তখনও চলেছে গাড়িতে তুলে দিতে। জার্ডিন গাড়িতে উঠে ভালো করে তাকাতে পারলো না মুন্সীর চোখে ; ধরা গলায় শুধু প্রায় অস্ফুট উচ্চারিত হলো : well—

মুন্সী জোড়হাত করে বলল : হেণ্ডারসান গন ; জার্ডিন গোয়িং ;—তারপর নিজের দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে শেষ করে অসমাপ্ত বাক্য : only poor and co left--

জার্ডিন তাকায় বিদ্যাধর মুন্সীর দিকে ; মুন্সী তাকায় জার্ডিনের দিকে ; দুজনেরই চোখে জল।

এই বিদ্যাধর মুন্সীর পৌত্র সে ; সাহেবের দেশে গিয়ে সাহেবের মুঠো থেকে মুক্ত করে আনবে সে গ্লোরিয়াকে। কলকাতা থেকে পালিয়ে ম্যাকডোনাল্ড্ ভেবেছে গ্লোরিয়াকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে কালা আদমীর নোংরা সংস্পর্শ থেকে। আর কয়েক মাস ; তারপর গ্লোরিয়ার বাবা জানবে রতনলাল মুন্সী কেবল সখারাম মুন্সীর পুত্র নয় ; রতনলাল মুন্সী সেই সঙ্গেই বিদ্যাধর মুন্সীর পৌত্রও বটে !

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ডরোথীর কাছ থেকে ছিটকে পড়ার পর নিরঞ্জন কেবল রঞ্জন হলো যে তাই নয় ; এতদিন যে লোকটাকে সবাই জানতো সেই নিরঞ্জন তলিয়ে গেলো বিস্মৃতির গহ্বরে ; তার বদলে জেগে উঠল যে সে আসল মানুষটার চেয়ে এত দূর যে কেবল নামের পরিবর্তন দিয়ে তার ব্যাখ্যা অসম্ভব। প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে বহু বৎসরের চর যেমন জলের অতলে মুছে যায় আবার সুনীল জলধর অতল থেকে উঠে আসে নতুন ডাঙা তেমনই মানব প্রকৃতিতেও বোধ হয় এমন বৈপ্লবিক অঘটন ঘটে থাকে। রত্নাকরের যেমন বাল্মীকি হতে বাধা হয়না এই ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ অসম্ভব অন্তর্বিপ্লবের ফলে তেমনই ব্রাহ্মণের সন্তানেরও পরিবর্তিত হতে সময় নেয়না কালাপাহাড়ের ভূমিকায়। রঞ্জনও পালটে গেল ; এত দ্রুত পাল্টালো যে ঘরে বাইরে যারা তার আত্মীয় অথবা বন্ধু, তারাও ধরতে পারলো না, পরিবর্তনটা হলো কোথায় এবং কবে। ডরোথীকে ছাড়বার চার পাঁচ বছরের মধ্যেই ইনকাম ট্যাক্সের চাকরিও রঞ্জনকে ছাড়লো। ছাড়লো নয়,—ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো, বলাই সঙ্গত। চার পাঁচ বছরের মধ্যে ঘুষ নেবার ক্ষেত্রে এতদূর পাকা হলো যে যারা ঘুষের খেলা খেলতে অভ্যস্ত তারাও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল উড়ন তুবড়ি যেমন বিস্মিত হয় হাউইকে তারাদের মুখে ছাই দিয়ে আসবার জন্যে সীমা লঙ্ঘন করতে দেখে। অবশ্য হাউয়ের যা হয় রঞ্জনের ভাগ্যে তার ব্যতিক্রম না হলেও পরিণতি আর্থিক বিচারে ট্রাজিক হলো না কিন্তু। অর্থাৎ চাকরি যাবার মুহূর্তে দুশো আড়াইশো টাকার চাকরির প্রয়োজনীয়তা রইল না এতটুকু। দুশো আড়াইশো না হয়ে দুহাজার আড়াই হাজার টাকা মাসমাইনে হলেও চাকরি ছেড়ে দিতে একটু লাগলেও, সে আঘাতে ফার্স্ট এডের দরকার হলেও হতে পারত ; কিন্তু সে ইজ্জৎ চির যে হবার কোনওরকম সম্ভাবনা নেই তা

বুঝবার ডাক্তার ডাকা বাহুল্য হতো নেহাৎই। অর্থাৎ দাস মনোভাব বস্তুটাই বিদায় নিয়েছিলো রঞ্জনের ভেতর থেকে। তার বদলে জেগে উঠেছিলো নতুন চর; সে চরের ভিন্ন দেশে ভিন্ন কালে বিভিন্ন পরিচয় কিন্তু তার চরিত্র আবহমানকাল ধরে এক। অর্থাৎ সোজা কথায়, অনেষ্ট মিন্‌স্ অভ লিভলিহুডের শাকচচ্চড়ি, সুখনিদ্রার নিবিড় রাত, বিপদে পড়লে অথবা না পড়েও চাইলে কাউকে না বলতে পারার উদার নিরঞ্জন রায়ের পরিবর্তে, দেখা গেল বাড়ি গাড়ির এফ্লুয়েন্স পোষাকের বাহার, নিত্যনতুন গ্ল্যামার গার্লের সঙ্গ এবং নানা চিন্তায় বিনিদ্ররাতের কষ্ট ভুলতে পেগ পেগ তরল গরল গলাধঃকরণ করার গে ব্যাচেলর রঞ্জন রয়।

ডরোথীকে বাঁচাবার চিন্তায় যখন নিরঞ্জন উদভ্রান্ত প্রায় তখনও উজ্জ্বলকান্তি ঘোষালের কাছে যাবার মত যথেষ্ট জোর আনতে পারেনি পায়ে; ডরোথী-দুর্ঘটনার পর ঘোষালের কাছেই গেল; ঘোষালের কাছে নির্দ্বিধায় যেতে যার মুহূর্তকাল দেরী হলো না আর সে অবশ্য নিরঞ্জন নয়; রঞ্জন। ঘোষালের কাছে যাবাব উদ্দেশ্যও গোপন করলে না সে। ঘোষালের সঙ্গে তার কথাবার্তা অনেকটা নিম্নলিখিত প্যাটার্ণ অবলম্বন করলো:

ঘোষাল: তোমার এখন যা পোষ্ট তাতে ভাই খুচরোর বেশি তোমাকে কেউ দেবেনা; কারণ দিলে যে দেবে তার কাজ তুমি করে দিতে পারবে না: আর একথা বোঝবার মতো বয়স তোমার নিশ্চয়ই হয়েছে, তুমি কোয়াইট ইন্টেলিজেণ্ট ছেলে, যে গরু যত দুধ দেবে তারই ওপর নির্ভর করেছে চিরকাল, এবং চিরকাল নির্ভর করবে, তার কতখানি চাট গোয়ালা সহ্য করবে!

রঞ্জন: কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে এর ইমিজিয়েট পোস্টটা পেতেও আমার এ্যাটলিস্ট বছর তিন দেরী আছে; তাহলে?

ঘো: তোমাকে আর আমি কি বলবো? তুমি শিক্ষিত ছেলে, আমি আকাট মুখ্যু;—সেই মহাজনবাক্য নিশ্চয়ই তোমার

স্মরণে আছে যে হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে—

র : আমার 'উইল'-এ সন্দেহ করবার আর কারণ নেই।

ঘো : তাহলে 'ওয়ে'ও পেয়ে যাবে নিঃসন্দেহে ; একটা নয় ; একশো ওয়ে আছে ওঠবার 'উইল' স্ট্রং হলে তেনম—

র : কি রকম ?

ঘো : অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করো বৎস ; আমি দেখাচ্ছি—

র : দেখাচ্ছি, মানে ?

ঘো : ধীরে রজনী ধীরে,- একসঙ্গে অত হজম করতে গেলে বদহজম হবে ভায়া ; চোঁয়া ঢেকুরের গন্ধে ধরা পড়ে যাবে তুমি কি খেয়েছ সেই বামাল সমেত! দেখাচ্ছি মানে, আমি থিয়োরীর চেয়ে প্রাকটিক্যালে বিশ্বাস করি অনেক বেশি, বুঝেছ ?

র : আজ্ঞে না,-

ঘো : এই দেখো তোমার এই 'না'-ই বলে দিচ্ছে বছবেব পর বছর বক্তৃতা দিলেও যে কাজ হয় না,—তাই মুহূর্তে সম্পাদিত হয় একবার হাতে কাজ করবার সুযোগ পেলে। তাই আমার উপদেশেব চেয়ে অনেক বেশি জানতে, বুঝতে, শিখতে পাববে যদি নিজের চোখে একবাব প্রত্যক্ষ করতে পাব কেমনভাবে এই সব কাজকর্ম চলে ; কি পাববে না ?

ব : আজ্ঞে হ্যাঁ—

ঘো : দেখ, শুনেই হ্যাঁ বলছ,- দেখলে কি বলবে কে জানে! যাক, এখন সাড়ে সাতটা : এইবার তুমি অপেক্ষা কর পর্দার ওপাশে ওই ড্রেসিং টেবলেব কাছে যেখানে একদিন প্রথম যেবার এসেছিলে চোব ধরতে সেবানে খাতাগুলো আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম ওই টেবলের ওপর ; তুমি ভেবেছিলে যে তুমি সাঙ্ঘাতিক বামাল ধবেছ,—মনে আছে ?

রঞ্জন মাথা নীচু করে।

ঘো: ওইখানে চেয়ার আছে এবং চেয়ারে সম্ভবত ছারপোকা আছে; তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না,—আর পাঁচমিনিট ওয়েট করো ওখানে। তারপর যার সঙ্গে আমাকে কথাবার্তা বলতে শুনবে তাকে এখানে দেখে এবং কি কারণে আগমন তা জানতে পেরে বাঘে কামড়ালেও চেয়ার ছেড়ে উঠতে পাবে না তুমি।

রঞ্জন এঘরের চেয়ার ছেড়ে উঠলো ওঘরের চেয়ারোদ্দেশে। ভাগ্যিস সঙ্গে সঙ্গে উঠেছিলো রঞ্জন; তাই। ওঘরে ভালো করে পৌঁছবার আগেই এ ঘরের বাইরে কলিং বেল বাজলো। ঘরে ঢুকেই আগন্তুক দারুণ লজ্জিত হয়ে বললো: চার মিনিট আগে এসে পড়েছি; খারাপ হয়নি তো?

ঘোষাল: শুভকাজ যত তাড়াতাড়ি করা যায় তত ভালো; অসাধু কাজে দেরী করলেও কেলেঙ্কারী.- তাড়াতাড়ি করলেও ফল কখন কখনও মড়কং

এতক্ষণ কেবল কণ্ঠের বাঁশি শুনেছিল রঞ্জন; এখনও পর্যন্ত আগন্তুককে চোখে দেখতে পায়নি এমন জায়গায় বসেছিলো সে। পুরো প্রোফিল চোখে পড়া মাত্তর প্রায় আওয়াজ করে আশ্চর্য হচ্ছিলো; পড়তে পড়তে গোয়েন্দা গল্পের ডিটেকটিভ যেমন ঘাসের মুঠি ধরে রোধ করে অনিবার্য পতন তেমনই অবিশ্বাস্য, তেমনই, অলীক তেমনই অবিশ্বাস্য ভাবে নিজের কণ্ঠস্বরের দ্বার রুদ্ধ করলো কোনও রকমে রঞ্জন। বিনোবা ভাবেকে ট্রাউজার পরতে দেখলে কিম্বা সুনীতি চাটুজ্যেকে সিনেমার কাগজের পরবর্তী সংখ্যায় যারা যারা লিখছেন তাঁদের তালিকায় উপস্থিত দেখলে যে অবাক হবার সম্ভাবনা, রঞ্জন যাকে সেই মুহূর্তে ঘোষালের ঘরে ঢুকতে দেখে উপস্থিত হলো বহন করা প্রায় অসম্ভববিস্ময়ের প্রান্ত সীমায়, তা, তুলনায় নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। বছর পঁয়ত্রিশ আগেকার কলকাতায় বাঙালীদের নেতৃস্থানীয় সেই মহাপুরুষের আসল নাম এখানে দিলে এখনও বিস্ময় কিছু কম হবে না; তার কারণ ইনি ধরা

পড়বার আগেই ধরাধাম ত্যাগ করে গেছেন। যারা বলে ক্রাইম ডাস নট পে, অথবা পাপ কখনও চাপা থাকে না তারা সে কলকাতা এবং এ কলকাতায় তো বটেই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই সেই হতভাগ্য শ্রেণীদের প্রতিনিধি যাদের বোঝানো কিছুই নয় যে গতজন্মে একজন সুকর্ম করেছে বলেই এজন্মে তার এত সুখ। সেও যদি এজন্মে নির্বিবাদে সব হজম করে, পাণ্ডাদের প্রণামী দেয়, পাবলিক ম্যানকে চাঁদা, ভাগ্য বলে মেনে নেয় সব তাহলে আগামী জন্মে সে-ও রাজা না হোক রাজকর্মচারী হবে নিশ্চয়ই। যদি ভালো লোকের নির্যাতন আর মন্দ লোকের অনায়াস অব্যাহত জীবন-যাত্রায় ফাটল ধরে তার পুনর্জন্মবাদের সুবিধাবাদী ব্যাখ্যায় তাহলে, তার আগেই, সে দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হতে দেবার পূর্বাহ্ণেই শরণ নেওয়া হয় পুরাতন ইংরেজী বাকধারার: Prevention is better than cure। সেই ধারা স্মরণ করে তৈরী হয়ে থাকে এই সান্ত্বনা যে যারা অন্যায় রাস্তায় এগিয়ে গেছে তারা খায়দায় বটে, তারা কিন্তু রাতে ঘুমোয় না। তাদের সংসারে অশান্তির শেষ নেই।

শুনে মেনে নেয় যারা, মানবার জন্যে, সংসারের সমস্ত দুঃখকষ্ট অন্যায় অবিচারের সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্যেই তাদের জন্ম। ক্যাপিটালিষ্ট এবং সবহারার দ্বন্দ্বে যাদের প্রাণ যায় চিরকাল রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখড়ের মতো;—আজ তাদের বিত্তহীনতার লজ্জা ঢাকবার জন্যে নিজেদের জাহির করে মধ্যবিত্ত বলে, তারা চিরকাল ছিলো এক নামে; আজ পরিচিত হোক যে নামেই, আগামী কালেও তারা থাকবে আরেক নামে। ঠক বাছতে গাঁ উজোড়ের দুর্দিনে দৈবাৎ ধরা পড়লে কেউ, জাল ছিঁড়ে বেরুবার কৌশল ভালো করে আয়ত্ত করবার আগেই জেলে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাবাদী নীতিশাস্ত্রকারদের মওকা আসে: উচ্চগ্রামে ওঠে উৎফুল্ল কণ্ঠ: দেখেছ, পাপের সাজা হয় কিনা। বলতে সাধ হয় তাদের, কিন্তু সাধ্য হয় না যে, ধরা পড়েছে যারা তারা তো কেউ রাঘব বোয়াল নয়; তারা তো চুনোপুঁটি মাত্তর। বলতে সাধ হয় তাদের যে রাত্রিতে পাপের পথে যাদের রোজগার তাদের ঘুম

হয় কিনা তারা জানে না ; কিন্তু এটুকু জানে যে রাতে না ঘুমোলেও দিনের বেলা ঘুমোবার অবসর মেলে তাদের ; এমনই ঘুম না হলে মেলে ঘুমের ওযুধ। কিন্তু মধ্যবিত্ত যারা সব দেশে সব কালে বিশ্বাস করেছে, অনেষ্টি ইস দ্য বেষ্ট পলিসি, তারা সকালে বাজার কি দিয়ে হবে-র চিন্তায় রাতে ঘুমোতে না পারলেও, উঠতে বাধ্য হয়েছে অন্য দিনের চেয়ে আরও সকাল-সকাল। দারুন ঘুষখোর কারুর একমাত্র সন্তানের অপঘাত-মৃত্যু হলে সমাজের সব ধূর্ত শেয়ালের এক রা শুনেছে কেবল : ওই দেখ, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। বেচারা মধ্যবিত্ত ধর্মভীরু শান্তি-প্রিয় আইনমানা নাগরিকদের সাধ হয়েছে, কিন্তু সাধ্য হয় নি অর্বাচীন প্রশ্ন করতে : তবে কেন, সমস্ত জীবন দিয়ে যিনি ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেলেন তাঁর কণ্ঠনালিতে দেখা দেয় দুরারোগ্য কান্সার ? যদি কখনও সাধ্য হয় একজন দুঃসাহসীরও সেই আতঙ্কে ধর্মের ধ্বজাধারীরা সাধ মিটিয়ে সাফাই গেয়েছেন : সকলের পাপ একা গ্রহণ করেছেন যিনি তিনি পুরুষোত্তম হলেও শরীবধারী পুরুষ বলে শরীবের ধর্ম অস্বীকার কববেন কেন ? দুবাবোগ্য অসুখে তাই সকল মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন তিনি একা।

রঞ্জন এই হতভাগ্য মধ্যবিত্তদের একজন না হলে যাকে ঘোষালের কাছে দেখে চমকে উঠেছিলো অতখানি, অতখানি কেন, সম্ভবত একটুও অবাক হতো না। বরং অবাক হতো আরও, সীজারের স্ত্রীর মতো যার চরিত্র প্রশ্নের উর্দ্ধে এমন কোনও আরও নিষ্কলঙ্ক কাউকে না দেখে। তাছাড়া রঞ্জনেব তখন বয়স হয়নি। বয়স হলে, মাথার চুল উঠে যায়, দাঁত পড়ে যায়, চামড়া কুঁচকে যায়, দৃষ্টি চলে যায় ; কিন্তু সকলের আগে চলে যায় বিস্ময় বোধ। রঞ্জনের বয়স তখনও অবাক হবার পালা করেনি অতিক্রম। কাজেই ঘরের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সেই মহাপুরুষের দর্শন পাবার পর এবার ঘোষালের সঙ্গে তার কথাবার্তা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইল। একটুক্ষণ শুনেই বুঝলো মোটা একটা ঘুঁসের টাকা একজন দিতে রাজী হয়েছে কিন্তু সরাসরি নিতে সাহস পাচ্ছেন না ভদ্রলোক। অথচ তাঁর নিজের এমন বিশ্বাসী কেউ নেই যার মারফৎ

পাওয়া সহজসাধ্য হয়। এই অবস্থায় ঘোষাল বলছেন তাঁর জানা একজন লোক আছে যে অনায়াসে উদ্ধার করতে পারে কাজ যৎসামান্য কিছু পেলে। নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোক জানতে চাইলেন যাকে দেবেন ঘোষাল সে খাঁটি লোক তো। ঘোষাল দেশলায়ের ওপর সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে জবাব দেন ঃ কাকে দিচ্ছি সেটাই দেখছেন কেন শুধু? কে দিচ্ছে সেটা দেখবেন না। আজকের কলকাতায় স্বামীর নাম ভুলক্রমে বেরিয়ে গেলে বউরা কি করে বলা শক্ত, কিন্তু সেদিন স্বামীর নাম নিয়ে ফেললে স্বপ্নের মধ্যেও যেমন আধহাত জিভ কাটতো তেমনই লজ্জা পাবার চেষ্টা করে ভদ্রলোক আমতা আমতা করেন ঃ না, মানে, ইয়ে; ভয় করে কিনা ঘোষাল মশাই। ঘোষালের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ঘামের মতো ফুটে ওঠে; নাচতে নেমে ঘোমটা দিলে পেটও ভরে না জাতও যায়; আপনি এ লাইনে তো নতুন নয় স্যর—। উঠে পড়েন আগন্তুক অতঃপর ঃ তাহলে ওই কথাই রইলো; যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন—।

আগন্তুকের শেষ কথাটা শুনে উজ্জ্বলকান্তি ঘোষাল এমন একখানা মুখ করলেন পর্দার আড়াল থেকে তা দেখে, সে দুঃখে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে মায়ের অথচ একেবারে বাচ্চা ছেলের অবুঝ প্রশ্নে হেসে ফেলেন ওই দুঃখের মধ্যেই, তারই মতো একরকম দুর্দান্ত টেনস মোমেন্টও রঞ্জনের বহুবার শোনা মাকালীর গল্প আরেকবার মনে পড়লো। মাকালীর কাছে সওয়া পাঁচানার পূজো দিয়ে এক ভক্ত বলছে ঃ মা, আমি জানি আজ সকালেই ষোড়শোপচারে তোমার পূজো দিয়ে গেছে আমারই এক প্রতিবেশী যাতে তার ছেলে চাকরিটা পায়; কিন্তু তার ছেলের চাকরি না হলেও যে চলে এবং আমার ছেলের না হলে যে আমার চলে না তার প্রমাণ তার ষোড়োষোপচার এবং আমার সওয়া পাঁচানা। শুনে সেই ভক্তের ভেতর থেকে মা স্বয়ং বলে ওঠেন, তোরা কেউ জানিস নে, আরও ভোরে একজন তার ছেলের ওই চাকরিরই জন্যে খালি হাতে প্রণাম করে গেছে। প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুযায়ী যদি কারুর ছেলের সে চাকরী প্রাপ্য হয় তাহলে ষোড়োষোপচারের চেয়ে

সওয়া পাঁচানার দাবী যেমন আগে তেমনই হাতের মুঠোয় যার ফুল ছাড়া আর জোটেনি কিছু তারই দাবী সর্বাগ্রে কি না তুইই বল! শুনে ভক্ত চলে যায়; যাবার আগে বলে যায়ঃ তাহলে তোমার যা'চ্ছে তাই কোরো। এবারে ভক্তের মনের মধ্যে শ্রুত হয় মায়ের হাসি; সে হাসি একথাই বোধ হয় বলতে চায়ঃ আমার যা ইচ্ছে তাইতো করি; মিথ্যে কেন তোরা পূজো, মানসিক, আর হত্যে দিয়ে মরিস, সে তোরাই জানিস কেবল; আমি সব জানি কিন্তু আমিও তা জানিনে। 'যা ভালো বুঝবেন, তাই করবেন'—বলে সেই মহাপুরুষ যখন যাবার আগে তাকালেন ঘোষালের দিকে, তখন মা কালীর গল্প যাদের জানা আছে তাদের অবধারিত মনে পড়বে ঘোষালের হাসিতে মাকালীর হাসির কথাই।

আগন্তুকের জুতোর শব্দ দরজার বাইরে হাওয়া হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রায় লাফিয়ে এসে প্রবেশ করে রঞ্জন রায়। কথামালার ভালুক আর দুই বন্ধুর কথায় ভালুক চলে গেলে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়া সেই বন্ধুর মতোই অনেকটা; বিপদ বুঝে যে গাছের মগডালে গিয়ে উঠেছিলো প্রাণের বন্ধুকে ভাল্লুকের নখরে অসহায় সমর্পণ করে। ঢুকতেই ঘোষাল বললেনঃ টাইম, প্লেস এবং ভিজিটের উদ্দেশ্য অবগত হয়েছ এতক্ষনে বৎস; অতএব এখন থেকেই তৈরী থেক; ঠিক সময়ে যথাস্থানে কাজ হাসিল করে হাতেখড়ি হোক তোমার নতুন মহান বৃত্তিতে। কাজ হাসিল খালি হাতে করতে হবে না; হাসিলের আগেই বাঁ হাতে যা সরিয়ে রাখবে তোমার ডান হাত যেন না জানে.—মনে রেখো এই প্রফেসনের একমাত্র বাণীই হচ্ছে এই।

যাবার আগে রঞ্জন উজ্জ্বলকণ্ঠি ঘোষালের মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায়; ঘোষাল কিছু না জিজ্ঞেস করেই জিজ্ঞেস করেন চোখ দিয়ে; কিছু বলবে? রঞ্জন বলেঃ একটা কথা জানবার ইচ্ছে করছে ভারি,—যদি কিছু না মনে করেন—। ঘোষাল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলেনঃ মনে করবার অথবা একটা কথার পাঁচরকম মানে করবার, কোনটারই বয়স নেই ব্রাদার; একটা কথার একটাই মানে হয় আজ আমার কাছে এবং

সেই একটা কথার যে মানেই হোক একটা তাতে হার্ট না হবার মতো হার্টও আছে আমার। অতএব নির্ভয়ে বলতে পার তুমি—

রঞ্জন জিজ্ঞেস করে: আপনি কতদূর পড়েছেন? হো হো করে হেসে ওঠেন ঘোষাল; হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে আসে প্রায় তবু থামতে চায় না অট্টহাসি। এমন কি হাসির কথা বলেছে ভেবে ভেবে কূলকিনারা করতে পারে না রঞ্জন। হাসি থামলে ঘোষাল দারুণ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন: আমার লেখাপড়া ওই ফার্স্ট বুক পর্যন্ত। তারপর রঞ্জনের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন, তখন আবার বলেন: বিশ্বাস হলো না বুঝি? বিশ্বাস করো সত্যিই ফার্স্ট বুক অব্দি আমার বিদ্যে; এবং আরও বিশ্বাস করো এম-এ বি-এ পাস করতে হয় না, করে খাবার জন্যে; গোটা ফার্স্ট বুক পড়বারও হয় না দরকার; কেবল একটা কথা জীবনের আরম্ভেই মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হয়; সেই কথা যারা গেঁথে নিতে পেরেছে মগজে তারাই গেঁথেছে চিরকাল শিকার; তারাই সংসারে সার চিনেছে; বাকী যারা তারা সংসারের সং চিরকাল—।

ঘোষাল নিজে থেকেই হয়তো বলতেন ফার্স্ট বুকের সেই ফার্স্ট এবং লাস্ট ওয়ার্ড; জীবনের সেই বীজমন্ত্রটি। হয়তো কেন,—নিশ্চয়ই বলতেন ঘোষাল। তবু উদগ্র আগ্রহ দমন করতে না পাবায় রঞ্জনের মুখ দিয়ে তখন বেরিয়ে গেছে ধনুক থেকে বেরিয়ে যাওয়া তীরের মতো: ফার্স্ট বুকের কোন্ কথাটা বলবেন?

ঘোষাল: A sly fox met a hen.

দুই

নিরঞ্জন রায়ের খোলস ছেড়ে যতদিনে বেরুচ্ছে রঞ্জন বয় ততদিনে হাত পা গুটিয়ে বসে নেই বিদ্যাধর মুন্সীর পৌত্র, সখারাম মুন্সীর পুত্র শ্রীমান রতনলাল মুন্সী। রতন বাপকা বেটা হলে কেবল সিপাই কো ঘোড়া হতো; বড় জোর হতো কুছ নেই তো থোড়া থোড়া। কিন্তু

রতনলাল কেবল সখারামের সন্তান নয়,—বিদ্যাধরের রক্ত তার শিরায় বইছে যে একথা বিস্মৃত হয় সে কি করে। তাই নির্দিষ্ট দিনে সে ভারতের মাটি ত্যাগ করলো; মায়ের আশীর্ব্বাদে নির্দিষ্ট তারিখে পা দিলো সাদাম্প্টনের টিলবেরি পোতাশ্রয়ে। এখান থেকে নিয়ে যাওয়া ইণ্ট্রো-ডাকশানকে থ্যাঙ্কস, ফিল্মের কাজে লেগে গেল কয়েকদিনের মধ্যে। এবং বাপের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো যেদিন ফিল্মকোম্পানীর চেয়ারম্যানের কাছে ডাক পড়লো এই কালা আদমীর। রতনলাল মুন্সী তখনও পর্যন্তো জানতো না যে যার সঙ্গে সে দেখা করতে যাচ্ছে সে ম্যাকডোনাল্ড; গ্লোরিয়ার বাবাও তখনও পর্যন্ত জানতো না যে রতন-লাল মুন্সীই ইণ্টারভিউই। সাক্ষাৎ হলো সাপেনেউলে। চাকরি অথবা ফিল্ম্ স্টুডিওর কথা উড়ে গেলো; গ্লোরিয়াকে নিয়ে পড়লো দুজনেই। ফাইন্যাল এই ঠিক হলো যে এসব কথা এখানে ডিসকাস করতে রাজি নয় স্যার অলিভার ম্যাকডোনাল্ড। রতনকে বাড়ি যেতে বলতে রতন জবাব দিলো ম্যাকডোনাল্ড্ তাকে যেখানে যেতে বলবে সেখানেই সে যাবে; আপ টু দি এণ্ড অভ দিস ওয়ার্ল্ড। সেকথা নয়, কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড্ যেন জরুরী তার পেয়ে আবার ভারতবর্ষে চলে না যায়, রতন এখন লণ্ডনে আছে কিছুদিন, এই নিশ্চিন্ততায়। অবশ্য ম্যাকডোনাল্ডের এতদিনে এ অভিজ্ঞতা অবশ্যই হয়েছে যে যেখানেই যাক গ্লোরিয়াকে নিয়ে, রতনলাল আজ হোক, কাল হোক, একদিন সেখানে যাবেই। কথাটার মধ্যে এতদূর ব্লাণ্ট ট্রুথ ছিলো যে ম্যাক-ডোনাল্ড্-এর বুলডগমুখে সিঁদুর মাখিয়ে দিলো যেন কেউ।

রতন যেদিন ম্যাকডোনাল্ডের বাড়ি গিয়ে হাজির হলো সেদিন ম্যাকডোনাল্ড্ বাড়িতেই ছিলেন। ছিলেন, তার কারণ গ্লোরিয়ার দিক থেকে নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি। দার্জিলিংএ আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে আনার কৃতিত্বে একটা টেম্পরারি ইনফ্যাচুয়েশানের কারণেই সে ভারতবর্ষের মাটিতে 'না' করতে পারেনি। তারপর ওয়াটারলু ব্রীজের তলায় বয়ে গেছে অনেক জল; এতদিনে গ্লোরিয়া নিশ্চয়ই বুঝেছে যে সাদায় কালোয় দ্বন্দ্বই হয় দুজনে মিলে; ছন্দ হয় না একটা।

গোটা মুন্সী ফিল্‌ম্‌ স্টুডিওটা কাঁপিয়ে হেসে উঠলো রতন; দীর্ঘকাল সে এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারেনি।

রঞ্জন রয় আর কি পারে অথবা কত টাকার একোমোডেশান সত্যি সত্যি করে দিতে পারে তার ছবির জন্যে সে তথ্য অবগত হবার আগেই রতনের তার সম্পর্কে ফার্স্ট ইম্‌প্রেশন হলো: রঞ্জন রয় কথা বলতে জানে। চা খেতে খেতেই রঞ্জন প্রমাণ দিলো সে কাজের কথাও কাজের লোকের মতই বলতে জানে।

রঞ্জন: আপনি কি ছবি এখন তুলতে যাচ্ছেন?

রতন: লায়লা-মজনু— ; হিন্দীতে।

রঞ্জন: হিন্দীতে কেন?

রতন: বাঙলা ছবিতে নাম হয়; কাম হয় না—

রঞ্জন: কিন্তু হিন্দী ছবি তোলার খরচা তো অনেক বেশী?

রতন: রাইট! কিন্তু চিনি যত মিষ্টিও তত যে!

রঞ্জন: বেশ; ছাট্‌স্‌ ইয়া হেডেক --; কত টাকা হলে আপনার চলে?

রতন: পঞ্চাশ হাজাব টাকা পর্যন্ত আমার স্মুথলি যাবে চাকা; তারপর ঠেকবে আরও পঞ্চাশের জন্যে—

রঞ্জন: টাম্‌স—

রতন: হয় ফিফটি-ফিফটি আর নয় উইথ ইনটারেস্ট বিপেয়বেল উইদিন এ ইয়ার: লোন যে দেবে সে স্টুডিওর এগেন্সটে দেবে—

রঞ্জন: এগেন্সটে নয়; যে দেবে সে ফেভারেই দেবে--

রতন: কিন্তু আপনার পার্টি কোথায়? তাকে আজ আনার কথা ছিলো না—

রঞ্জন: পার্টির সঙ্গেই তো আপনি কথা বলছেন—

রতন: তার মানে?

রঞ্জন: এর মানে বোঝবার জন্যে আপনার এ্যাটলিস্ট মানে-বইয়ের দরকার হবে না; টাকাটা আমিই দেব—

রতন: কিন্তু ডালিয়া বলেছিলো,—

রঞ্জন ঃ ডালিয়া বলেছিলো আমি পার্টি জোগাড় করে দিয়ে দুপক্ষ থেকেই টাকা খাই ; ঠিকই বলেছিলো—

রতন ঃ তবে ?

রঞ্জন ঃ এতদিন তাই ঠিক ছিলো ; এখন তা আর ঠিক থাকছে না—

রতন ঃ বেঠিক হচ্ছে কিসে ?

রঞ্জন ঃ অনেষ্ট মিন্‌স্‌ অফ লিভলিহুডে—

রতন ঃ মানে ?

রঞ্জন ঃ আমি যে টাকা রোজগার করি তাতে গাড়ি, বাড়ি, মদ, মেয়ে, ডায়মাণ্ড স্লিপার সব চলে ; কিন্তু যেভাবে করি ইনকাম ট্যাক্স অথবা পুলিশের কাছে তার অনেকটাই বলা চলে না—

রতন ঃ ও—

রঞ্জন ঃ তারই জন্যে এবারে ফিলমের ব্যবসায় নেমে ডিসঅনেস্ট মিন্‌স্‌ অভ লিভলিহুডের খাতা থেকে নাম খারিজ করাবো ; আর সেই সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্সের হাত থেকে রেহাই নেব লোকসান করে !

রতন ঃ লোকসান ?

রঞ্জন ঃ নো ; নাথিং টু ওরি 'বাউট দ্যাট , আপনার লাভই হোক, —আমার হওয়া চাই লোকসান—

রতন ঃ হাও'স দ্যাট—

রঞ্জন ঃ পরে হবে সে সব কথা ; আপাততঃ এইটুকু জেনে রাখুন যে অনেককাল আগে আমি ইনকাম ট্যাক্সের লোকই ছিলাম ; তখন ট্যাক্স দেবার মতো ইনকাম ছিলো না কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স দেবার ইচ্ছে ছিলো ; আজ আমার যা ইনকাম তাতে সুপার ট্যাক্স চালু থাকলে তাই দেওয়া আমার কর্তব্য ছিলো ; কিন্তু এখন সাধারণ ইনকাম ট্যাক্স দেবারও আমার প্রবৃত্তি মরে গেছে। কেন জানেন ? আমি দেখেছি অনেস্ট মিন্‌স্‌ অভ লিভলিহুডে গ্রাসাচ্ছাদন চলে হয়তো ; সঙ্গত ইনকামে চলে ইনকাম ট্যাক্সই দেওয়া কেবল,—তার বেশি কিছু করতে গেলেই সংসার অচল। বাড়ি, গাড়ি, দামী শাড়ি, গয়না, গ্ল্যামার

অনেস্ট মিন্‌স্ অভ লিভলিহুডে অসম্ভব আজকের দিনে; আমার ধারণায় বিগত দিনেও তা অসম্ভব ছিলো; তবে অতীত কালকে আমরা সর্বদাই সমালোচনার অতীত জ্ঞান করি তাই সেকাল আর একালের মধ্যে মিথ্যা মূল্যবোধের পাঁচিল তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলি—

রতন কি বলতে যাচ্ছিলো; বাধা দিয়ে রঞ্জনই কন্টিন্যু করলো:

আমি জানি। আমি জানি যে আপনি বলবেন, শাড়ি, গাড়ি, গয়না, গ্ল্যামারের দরকার কি? অঋণী অবস্থায় শাকান্নে যে তৃপ্ত সে-ই সুখী। না; সেই সুখী নয়। অন্তত যিনি এই মহাভারত-বিখ্যাত উত্তর দিয়েছিলেন সেদিন তিনি এ্যাট লিস্ট সুখী ছিলেন না মাত্র ওইটুকুতে; থাকলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অসম্ভব হতো শ্রীকৃষ্ণের ধর্মযুদ্ধের প্ররোচনা সত্বেও। আমি জীবন দিয়ে এসত্য জেনেছি যে অঋণী অবস্থায় শাকান্নে তৃপ্ত যে সেই সুখী,—একথা বলবার জন্মেও পাণ্ডব রাজত্বের চাই পুনরুদ্ধার; নাহলে ওকথা মুখ দিয়ে বেরুনো অসম্ভব। লোকে যখন বলে যে যারা অন্যায় রাস্তায় টাকা করে তাদের টাকা থাকে না তখন তারা দুপাঁচ দশ বিশ, পঞ্চাশ হাজার টাকার কথা বলে বড় জোর; কিন্তু যারা লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা করছে, দুনিয়া জুড়ে বিস্তৃত যাদের কারবারের জাল তাদের টাকা কি থাকে না পুরুষানুক্রমে? যখন থাকে না তখন অসৎ উপায়ে রোজগারের টাকা বলে থাকে না যে তা নয়; থাকে না তার কারণ কলসীর জল কেবল ঢেলে খেলে একসময়ে তা শূন্য হতে বাধ্য,—কুবেরের টাকার কলসী হলেও তার অন্যথা অসম্ভব। লোকে একথাও বলে যে রাস্তার কুলিকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেখে হেনরি ফোর্ড বলেছিলেন নাকি যে আমার টাকার বদলে ওই কুলির ঘুম যদি কেউ দিতো! বলেছিলেন কি না জানি না; তবে আমাকে বললে আমি বলতাম আপনাকে বাধা দিচ্ছে কে? রাজা যখন বলে যে সিংহাসন মাত্রই কন্টক-শয্যা তখন কোনও প্রজা তাঁকে সে শয্যা ত্যাগ করে কন্টকমুক্ত হবার কথা বলতে ভরসা পায় না তার ঘাড়ে একটার বেশী দুটো মাথা নেই বলে।

আমার এই কথা বলা অন্যায় আমি জানি। সমাজের এবং

আইনের দুই চোখেই। তবু বলছি মিস্টার মুন্সী,—ক্রাইম ডাস নট পে,—এ ফিকশনের বাণী; ফ্যাক্টের কথা: ক্রাইম পেস। অন্য লোককে যখন অন্যায় রাস্তায় গাড়ি, বাড়ি, গয়না, গ্ল্যামার কিনতে দেখি তখন পরের জন্মে রাজা হবার অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের ওপর ভরসা করে শুকিয়ে মরে যারা এজন্মে তারা এমন করে ধর্মভীরু বলে নয়; অধর্মভীরু বলে। গাট্সের অভাবে। আমাদের দেশে লোকে চরিত্রবান, তার কারণ স্ত্রীলোকের প্রতি, অন্যের স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরাগের অভাব নয়; সাহসের অভাব। পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ,—এরই অপর নাম বোধ হয় সভ্যতা?

এক নিঃশ্বাসে ঝড়ের মতো এতগুলো কথা বলে ফেলে লজ্জিত হয় রঞ্জন রায়; রতনের সঙ্গে আজ তার দ্বিতীয় দিন দেখা সবে। রতনের দিকে লজ্জার হাসি প্রোট্রুড করে রঞ্জন দুঃখিত হয়: বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম; হাসছেন তো মনে মনে—

রতন: হাসবার কথা তো আপনি একটাও বলেন নি; তাহলে হাসবো কেন?

রঞ্জন: যাক! এবারে কাজের একটা কথা বলুন দেখি; লায়লা মজনুতে লায়লা করছে কে?

রতন: কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি অভিনেত্রী চেয়ে; পায়নি এখনও --। আপনার হাতে তেমন কেউ আছে না কি?

রঞ্জন: আমার হাতে নেই; তবে আপনার হাতে আছে—

রতন: আমার হাতে।

রঞ্জন: এক্স্যাক্টলি সো—কিন্তু ভয়ে বলব না নির্ভয়ে?

রতন: কি বলছেন আপনি?—দয়া করে বলুন—

রঞ্জন: মিসেস মুন্সী নামতে রাজী হবেন লায়লার ভূমিকায়?

রতন: গ্লোরিয়া?

রঞ্জন: ওফেণ্ডেড হলেন তো?

রতন: না। গ্লোরিয়ার কথা কখনও মাথায় আসেনি তো?

রঞ্জন: গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না ব্যাপারটা জগতের সর্বত্রই

সত্য ; সিনেমাজগতেও ইকোয়ালি এপ্লিকেবল দেখছি—;
ওল রাইট ! এখন উঠি ; কথার কথা বললাম,—ভেবে
দেখবেন একবার—

রঞ্জন রায় চলে যাবার পর দীর্ঘসময় চুপ করে বসে রইল রতনলাল মুন্সী। যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে তেল ফুরিয়ে যাওয়া গাড়ী কি করে চালানো যায় আকাশ পাতাল ভাবছে তারই তলায় যে পেট্রোলের খনি,—এতদিন কেন একথা মনে হয়নি তার তাই মনে করে নিদারুণ ধিক্কারে আচ্ছন্ন হলো সত্তা।

অন্ত একজন আঙুল দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়ে গেলো যে শুধু তাই নয় ; আঙুল তার দিকেও দেখিয়ে গেল বোধ হয় ; এতকাল ধরে নিজের সম্বন্ধে তার যে অটল বিশ্বাস তার অচলায়তনে ফাটল ধরিয়ে দিয়ে গেল এইমাত্র।

।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।।

গ্লোরিয়ার কাছে লায়লা-করবার প্রস্তাব নিয়ে যাবার সময় সাঙ্ঘাতিক উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো রতনলাল মুন্সীকে; বহুদিন তাকে এমন ব্রাইট এমন হোপফুল, এমন লিভলি দেখেনি কেউ। দাড়িকামাবার দর্পণের সামনে শিস দিচ্ছিলো রতন; যৌবনের রঙীন ছবি, হাউ হ্যাপি ওয়াস মুন-এর পাগলা করা শিস। কপর্দক পর্যন্ত ফুঁকে দিয়ে যখন ধার করার কথা ভাবতে বসে কেউ তখন হঠাৎ যদি বউ বার করে দেয় একবাশ রূপোর টাকা; সরিয়ে রেখেছিল যা বউ সংসারের টাকা থেকে এমন দিন আসতে পারার সম্ভাবনায় তখন পাঁচ টাকার মূল্য ফাইভ হাণ্ড্রেড রুপিসেব চেয়েও অনেক বেশি, দরকারের সময়ে অযাচিত রেডি, এই কারণে; তাহলে তার মুখের চেহারা সেই মুহূর্তে যেমন জ্বলজ্বল কবে ওঠে তেমনই চকচক কবেছিলো রতনের তুচোখ; তার শিসে দেখা দিয়েছিলো কথায় হার্ডলি যা এক্সপ্রেস করা চলে, জগতের সবশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর কথা ধার করেও যে মুখে যাওয়া যায় না ভিসবিল ডিসটান্সের মধ্যেও সেই আবেগ। তার শিস যা বলতে চাইছিলো তা ল্যাংওয়েজে ট্রান্সক্রাইব করলে দাঁড়ায় আজ কি খুসীর দিন। গ্লোরিয়াকে কথাটা সোজাসুজি না পেড়ে সাপ্রাইজ দেওয়া যায় কেমন করে তারই একটু উত্তেজনা-মধুর চিন্তায় মশগুল ছিলো শিস দিতে দিতে। কিন্তু হঠাৎ বেশি শিস অথবা বেশি খুসী কিম্বা কোনটাই নয়; সাপ্রাইজ দেবার আনন্দে ধৈর্য আর ধরতে না পারার কারণে তাড়াতাড়ি করে ক্ষুর চালাতে গিয়ে ফস করে এতখানি কেটে বসল গাল। মনটা খারাপ হয়ে গেল রতনের; ছাঁত করে উঠলো তার বুক। প্রস্তাব করতে যাবার মুখেই একি অশুভ ইঙ্গিত; তাকিয়ে দেখলো আয়নায় রতন। রক্ত গাল বেয়ে নেমে আসছে দ্রুত; তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেললো সে। তাকিয়ে দেখলো আয়নায় আবার; রক্ত গাল বেয়ে আবার নেমে আসছে দ্রুত।

গ্লোরিয়ার কাছে যেতে হল না; সে এদিকেই আসছিলো। তার মুখ, হরতাল হবার আগে সারাদেশ যেমন কিহয়-কিহয় চিন্তায় থমথম করে, তেমনই বিষণ্ন, চিন্তাক্লিষ্ট, এবং গম্ভীর। রতন ক্ষুর রেখে এগিয়ে গেল; একটু কনসার্ণড কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো: হোয়াট্‌স্ রোং গ্নরি? গ্লোরিয়া বরাবর এমন অবস্থায় যেভাবে পাশ কাটাতে চায় তেমনই খুব আস্তে আস্তে বললো: নাথিং। রতন কিন্তু ছাড়লো না কিছুতেই; সে জানতো এমন কিছু হয়েছে নিশ্চয় যাতে ভীষণ বিচলিত হয়েছে গ্লোরিয়া। একে নিজের একটু আগের হঠাৎ খুশীর বুদবুদ একটুখানি সুপারষ্টিশানের টোকাতেই ফেটে চৌচির হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে তার ওপর স্ত্রীর চোখে আসন্ন ধারাপাতের কারণ না জমতে পারা-তক তার মন আরও ছটফট, আরও উত্তেজিত এবং কণ্ঠস্বর আরও বেশ কয়েক ধাপ চড়ায় উঠে গেল। অনেক ধস্তাধস্তি, অনেক কাকুতি মিনতি এবং শেষ পর্যন্ত অভিমানের থ্রেটে কাজ হলো। গ্লোরিয়া বার করে দিলো একখানা চিঠি; তলায় সাক্ষর নেই। চিঠিটা হাতে দিতেই দারুণ ক্ষেপে গেল রতন। বললো: আমার ধারণা ছিলো আমি যে সমাজের মেয়েকে বিবাহ করেছি সে সমাজের কেউ বেনামা চিঠি পড়াটা বেনামা চিঠি লেখার চেয়েও বড় ক্রাইম বলে মনে করে।

গ্লোরিয়া: চিঠির তলায় স্বাক্ষর নেই বটে তবে এনোনিমাস নয় বোধ হয় এচিঠি—

রতন: কি করে বলছ?

গ্লো: চিঠিটা আগে একবার পড়; তারপর সব বলছি।

চিঠিটায় লেখা আছে যে রঞ্জন রয় বলে যে ড্যাশিং ইয়াং ম্যান অতি সম্প্রতি মুন্সী স্টুডিওর ফিনানসিয়ারের ভূমিকায় অবতীর্ণ সে লোকটি সুবিধের নয় মোটেই। রঞ্জন রায়ের পেশা যেমন ডিসঅনেস্ট তার নেশাও তেমনই পার্ভার্স। পরের সুখের সংসার ভাঙাই তার কাজ, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে এনে। গ্লোরিয়াকে নিয়ে ডালিয়া সেদিন যখন ডায়মাণ্ড স্লিপারে ঢুকেছে তার ফ্রাকশন অফ এ

সেকেণ্ড আগে ক্লাবের মেয়েদের সঙ্গে বাজি ধরেছে রতন যে ইমিডিয়েট নেক্সট মোমেণ্টেই যে মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাকেও যদি উইন করতে পারে রঞ্জন তাহলে সে হবে ডায়মাণ্ড স্লিপারের মধ্যমণি,—'ডায়মাণ্ড'। এবং আনফরটুনেটলি সেই উডবি নেক্সট ভিক্টিম হবার দুর্ভাগ্য হয়েছে যার তার নাম গ্লোরিয়া, সে যেন সাবধান হয় এখন থেকেই। নইলে—তলায় পত্র লেখিকার পরিবর্তে জ্বলজ্বল করছে যে নাম সে এক জগদ্বিখ্যাত চিত্রতারকার : ডোলরেস ডেলরিও।

রতন : বেশ ; কিন্তু চিঠি এনোনিমাস নয় কেন? ডলোরেস ডেল রিওর তো আর লেখা নয় এ উড়ো চিঠি—

গ্লোরিয়া : না : তা নয়—

রতন : দেন'

গ্লোরিয়া : এই দেখো—

গ্লোরিয়া বার করে দেয় ছবিসহ এক আবেদন পত্র ; মুন্সী ফিল্ম্ স্টুডিওর লায়লা-মজনু ছবিতে লায়লার রোলের জন্যে অভিনেত্রী চেয়ে যে বিজ্ঞাপন কাগজে বেরোয় তারই উত্তরে প্রেরিত। প্রেরিকার নাম : কামিনী মেহরা—

রতন : দেখলাম ; কিন্তু বুঝলাম না -

গ্লোরিয়া : ভালো করে দেখলে বুঝবে যে কামিনী মেহরাই ডলোরেস ডেল রিও—

রতন : I see !—দুটোতেই হাতের লেখা এক—

রতনের মুখে দারুণ কালো মেঘ জমে ; ক্ষুরে কাটা গাল জ্বালা করে। সে বলে : গ্লরি,-এর মধ্যে না যাওয়াই ভালো ; রঞ্জন রায় লোক ভালো নয়—

গ্লোরিয়া : না ; অত মুখ গম্ভীর করে ডিসিসন দেবার কিছু নেই এখনই ; তোমার বউকে এখনই নিয়ে পালাচ্ছে না।—হেসে উঠলো দুজনেই। মেঘের গরাদ ভেঙ্গে কয়েদী রোদ দেখা দিল অনেকদিন পর। সেই মুহূর্তেই বেয়ারা এসে খবর দিলো যে একজন দেখা করবার জন্যে কার্ড পাঠিয়েছে।

গ্লোরিয়া এবং রতন দুজনে একসঙ্গে ঝুঁকে পড়লো; আইভরি ফিনিশ কার্ডের ওপর কোটসের দারুণ কালোয় ছাপা কার্ড যার তার নাম: কামিনী মেহেরা।

একটু নিস্তব্ধতার পর গ্লোরিয়াই প্রথম বরফ ভাঙ্গলো: বলো গিয়ে যে সাহেব আসছেন এখনই—

তারপর রতনকে বললো: তুমি চান করে নাও চট করে; আমি ততক্ষণ দেখছি কি ব্যাপার। রতন বাথরুমে ঢুকে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

দুই

নিরঞ্জন রায় যেমন একদিন ডরোথীর কাছে ঠোক্কর খেয়ে তবেই পরিবর্তিত হয় রঞ্জন রয়েতে; তেমনই রঞ্জন রয়ও তার নারী বিজয়ের অভিমানে এপর্যন্ত যে একেবারেই কেবল ঠেকে যায় তা ওই ডলোরেস ডেল রিও ওরফে কামিনী মেহেরার কাছেই; তবে এ ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা তার না হয়ে হয় কামিনীরই; কামিনী মরে গিয়ে তার দেহে যে নবজন্ম নেয় তাকেই মুদ্রাদোষর কারণে লোকে তাকে ঠাট্টা করে অনেকদিন থেকেই ডেকে আসছে কখনও পুরো ডলোরেস ডেলরিও, কখনও ডলোরেস, কখনও বা কেবল ডেলরিও বলে। কামিনী মেহেরা কোনদিন ডায়মাণ্ড স্লিপারে আসতে পারবে এ যারা কামিনীকে ক্লাবে আসবার আগে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছে তারা যেমন, কামিনী নিজেও তেমনই তার উদ্দামতম কল্পনাতেও ভাবতে সাহসী হয় নি। সেই অঘটন কিন্তু ঘটলো বিবাহ মারফৎ। বিবাহের আগে কামিনী ভারি মিষ্টি মেয়ে ছিলো। একরাশ লাবণ্য সর্বাঙ্গে মেখে সুজন বাসুদেবের এই একমাত্র সন্তান কন্যার রূপ ধরে এসেছিলো যেদিন ঘর আলো করতে সেদিন নিশ্চয়ই কেউ ভাবেনি যে মধ্যবিত্ত এই মেয়েকে শেষ পর্যন্ত এম কে ইণ্ডাস্ট্রীসের সমস্ত পরিকল্পনার পেছনে দিবারাত্র যে বছর

তিরিশের-বেশি-বয়স-নয়-মাথা কাজ করে তার কণ্ঠলগ্ন হতে হবে। উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর চেয়ে বেশি আর্থিক ব্যবধান ঘুচিয়েছিলো যা তা কামিনী বাসুদেবের চোখ, না হাসি না তার দুপাশে নদীর বুকে পাল তুলে তরতর কবে বয়ে যাওয়া নৌকার ছন্দোময় গতি,—বলা শক্ত, মেহেরা ইনডাস্ট্রিসের মাথার মাথা শ্রীমল মেহরা তখন বেঁচে। অন্তত এক হাজার মেয়ে-অভিজ্ঞ-চোখের রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগ করে ভেতরে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় দেখে নিয়ে মেটেনি লখীন্দরের জন্যে বেহুলার আশা; সেই সময়ে একদম আচমকা, একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাঁর চোখে পড়ে যায় কামিনী আমরোহী; চোখ ফেরাতে সময় নেন বুড়ো।

শ্রীমল মেহেরা যখন একমাত্র পুত্রের জন্যে সুজন বাসুদেবের এক-মাত্র কন্যাকে দাবী করলেন তখন সুজনের মনে পড়লো কামিনীর যখন বয়স খুব অল্প তখন তার হাত দেখে এক মাদ্রাজী গণক বলেছিলো: এ মেয়ে তো রাজরাণী হবে। কামিনীর মা তখন বেঁচে ছিলেন; আজ কামিনী যখন সত্যি সত্যি রাজরাণী হতে চলেছে তখন কামিনীর মা আর তা দেখবার জন্যে নেই; আনন্দে এবং বেদনায় দু ফোঁটা হাসি-কান্নার হীরাপান্না ঝলমল করতে লাগলো সুজন বাসুদেবের প্রৌঢ় দু চোখে। আরও একজনেব জন্য সুজন বাসুদেবের উজ্জ্বল আননে মেঘেব ছায়া থেকে থেকেই এসে পড়ছিলো; তার নাম অর্জুন শ্রীবাস্তব। সুজন বাসুদেব তখন র‍্যাভেনশ কলেজে ইংরেজিব অধ্যাপক ছিলেন; অর্জুন সেই কলেজেরই তরুণতম লেকচাবার সেদিন।

অর্জুন শ্রীবাস্তব কলেজের কাছে একটি মনোহরী দোকান থেকে মাসকাবারী ষ্টেশনারী কিনছিলো; সামনে খোলা ছিলো খবরকাগজের পাতা। একটি মেয়ের ছবি জ্বলজ্বল করছিলো সেই পাতায়; ট্রেণের কামরায় মত্তপ এক লালমুখকে কি ভাবে শায়েস্তা করেছে সেই মেয়ে তারই রোমাঞ্চকর বিবরণ ছাপা ছিলো ছবির সঙ্গে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই।

শহর থেকে কিঞ্চিৎ দূরে বান্ধবীদের সঙ্গে পিকনিক সেরে লোক্যাল ট্রেণে বাড়ি ফিরছিলো একটি মেয়ে; সঙ্গের মেয়েরা যে যার

বাড়ির কাছে নেমে যাবার পর পথ যখন আর অল্প বাকী তখন ওঠে এক লালমুখ সাহেব জলের নেশায় চোখ রক্তবর্ণ করে সঙ্গে কুকুর নিয়ে। মেয়েটি বাধা দেয়। কুকুর নিয়ে যেতে হলে কামরা রিজার্ভ করে যেতে হবে এই ছিলো মেয়েটির বক্তব্য। সাহেব তা শোনবার পাত্র নয়; উল্টে লেলিয়ে দিলো একটু সাঙ্ঘাতিক মেজাজের সেই চতুষ্পদকে। ভয়ে লাফিয়ে পড়বার ভাণ করে মেয়েটি দরজা খুলে ঝাঁপ দেবার উপক্রম করতেই সাহেবের নেশা ছুটে যায়; দৌড়ে আসে দরজার কাছে। মেয়েটি পিছিয়ে এসে সজোরে ধাক্কা দেয় সাহেবকে; সঙ্গে সঙ্গে কুকুর কামিনীকে ছেড়ে অনুগমন করে প্রভুকে। চেন টেনে দেয় মেয়েটি; লোক্যাল ট্রেণটা তখনও স্টেশন ছেড়ে ভালো করে স্পীড নেয়নি, থেমে যায় কয়েক শো গজের আগেই। হৈ-হৈ পড়ে যায় স্টেশনে; সেখান থেকে শহরময় আলোড়ন। খবর কাগজের খবর হয়েছে ছবি সহযোগে।

পড়ে যাবার পরও চৈতন্য হারায়নি লালমুখ; বরং চৈতন্য ফিরে পেয়ে ক্ষমা চেয়েছে মেয়েটির কাছে: আয়াভ গট ওনলি হোয়াট আই ডিজাভর্ড্।

খবরটা পড়ে শেষ করার পর অর্জুন শ্রীবাস্তবের মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে পড়ে: এরাই দেশের গৌরব।

কারা?—চমকে ওঠে প্রশ্ন শুনে অর্জুন। পাশে যে আরেকজন কেউ এসে দাঁড়িয়েছে ভাবতে পারেনি অর্জুন। তাকিয়ে দেখলো র‍্যাভেনশ কলেজের ইংরেজির সিনিয়ার অধ্যাপক সুজন বাসুদেব।

অর্জুন: ওঃ, আপনি?

সুজন: দেশের গৌরব কারা?

অর্জুন: এই যে এই সব মেয়েরা,--দেখছেন কি করেছে একজন ভারতীয় মেয়ে?

সুজন: দেখেছি; চেন একে?

অর্জুন: না; আমি তো সবে এসেছি এখানে,—কারুর সঙ্গেই প্রায় আলাপ নেই—

সুজন : আলাপ করলে খুসী হও—

অর্জুন : খুসী ? সম্মানিত বোধ করি তাহলে ; আপনি চেনেন ?

সুজন : সেই এতটুকু বয়স থেকেই—

অর্জুন : কোথায় থাকে ?

সুজন : আমার বাড়িতেই—

হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন অর্জুন এক বিন্দু বুঝতে না পেরে। সুজন বাসুদেব মুহূর্তে নিরসন করেন অর্জুনের সমস্ত সন্দেহ ; একটু রহস্যময় হাসির ময়ান ঠোঁটের ওপর মাখিয়ে বলেন : আমার বাড়িতে থাকে, কারণ আমার মেয়ে ; আলাপ করতে চাও তো কাল এসো—

অর্জুনের হৃৎপিণ্ড তড়াক করে এক লাফে কণ্ঠলগ্ন হলো ; বলতে চেয়েছিলো অর্জুন : যদি অনুমতি করেন তো এখনই আসি ; সঙ্কোচ কাটিয়ে বলতে পাবলো না কিছুতেই ; সুজন বাসুদেবের কারণে নয় ; তিনি খুশীই হতেন হয়ত যেমন লোক। বলতে পারলো না ; দোকানদারটার চোখে ঈর্ষার কপিশছায়া।

তিন

এই অর্জুন শ্রীবাস্তবের সঙ্গেই বিবাহ হলে কামিনীব সখীদের স্বপ্নসঙ্গত হতো ; কিন্তু নিয়তির বিধান ছিলো সম্পূর্ণ আরেক রকম। বাতের অন্ধকাব নির্জনে একটি দিনেব স্মৃতি ভেসে এলো বহুদিনের ওপার থেকে। অর্জুনেব বাড়ি গিয়েছিলো সেদিন কামিনী। অবিবাহিত যুবকের ঘব যেমন হয় তেমন করে অগোছালো নয় একেবারেই ; উপন্যাসের নায়িকাদেব মতো যে ঘব সাজানোর অছিলাতেও জমে উঠবে প্রেমের নাটক তারও উপায় বাখেনি অর্জুন। যেখানকার যা সেখানকার তা ঠিক জায়গায় রয়েছে ; একটা আলপিন সরালেও টেব পাবে ঘবের মালিক। ভারি হতাশ হয় কামিনী। অর্জুন কলেজ থেকে ফিরে একদিন দেখে যে তার সমস্ত ঘর তচনচ হয়ে গেছে।

মা-কে ডেকে জিজ্ঞেস করে এঘর থেকে : কামিনী এসেছিলো বুঝি ? মা জবাব দেন : 'হ্যাঁ ; কি করে বুঝলি ?' 'আমার ঘরখানা একবার উঁকি দিয়ে দেখলে তুমিও বুঝতে যে কামিনী এসেছিলো।' মা এসে ঘর দেখে গালে হাত দেন : এ কি রে ? আমি ভেবেছি কামিনী এঘরে বসে পড়ছে ; কিন্তু এরকম করলো কেন বল্‌তো ?' 'আর কেন ?' রাগের ভাণে দারুণ খুসী হয়েছে ছেলে, এটুকু বোঝেন মা ; কিন্তু কেন এই খুসীর মেলা বুঝতে পারেন না তিনি। উচ্ছ্বসিত খুসীতে উচ্ছল ছেলে নিরসন করে মাতৃসন্দেহের : তোমার কামিনীর দারুণ দুঃখ যে আমার মতো অবিবাহিত লোকের ঘর এতো গোছাল হবে কেন ? তাই আজ রাগ করে আমার ঘরে দিনে ডাকাতি করে গেছে সে ; বুঝেছ ? 'আমি বুঝলে কি লাভ হবে ? তুমি একটু বুঝলে হয় এখন যে'- -, স্নেহের তিরস্কারে মায়ের কণ্ঠ দিয়ে মধু ঝরে পড়লো ছেলের মনের মাটিতে।

অর্জুন : আমি আবার কি বুঝবো ? মাঝে মাঝে তুমি কি যে বলো কোনও মানে হয় না মা—

মা : তুই থাম দেখি অজু ; মানে হয় শুধু তোর ছেলেদের কাছে রোজ রোজ লেকচার দেবার !

অ : বেশ বলো, কি বুঝবো আমি ?

মা : এইটুকু তো অন্তত বুঝবি বাবা,—যে কোনও মেয়ে, এত গোছাল হলে পুরুষ মানুষ দুঃখ পায় !

অ : সে কি মা ? তোমরাই ত' বলো যে আমরা একটা কাজ ঠিক মতো গুছিয়ে করতে না পারার জন্যেই সংসারে তোমাদের এত জ্বালা ; বলে না মেয়েরা ?

মা : বলে ; সেটা তো মুখের কথা : মনের কথা নাকি ? কোন্ মেয়ে না চায় যে তাদের না হলে সংসার অচল এই ভাব পুরুষের মুখে দেখতে ?

অ : মনের আর মুখের কথা এক নয় যাদের তারাই যে মেয়ে, ভুলে গিয়েছিলাম মা—

মাঃ মায়েদের কাছে মনে না করে মেয়েদের কাছে মনে রাখলে ভালো হয় খোকা !

মনে রেখেছিলো বটে অর্জুন শ্রীবাস্তব। পরের দিন অনেক আশা নিয়ে কামিনী এসে দেখে যে যুদ্ধবিধ্বস্ত য়ুরোপের পুনর্গঠনের চেয়ে অনেক নিপুণ হস্তে কালকের ঘর আগের চেয়েও সুবিন্যস্ত। দেখে দমে গেল বুক কামিনীর। তারপর তাকিয়ে দেখলো লাল অক্ষরে দেওয়ালের গায়ে সাঁটা কাগজের ওপর রক্তবর্ণ অনুমতি ঃ আজকের ঘর কালকের চেয়েও তচনচ হওয়া চাই—

মনের সুখে তার পরের দিন থেকে পালা করে একবার কামিনী ঘর ভাঙে আর অর্জুন শ্রীবাস্তব ঘর গড়ে। কতদিন এ খেলা চলতো কে জানে। বাদ সাধলেন অর্জুনের মা একদিন। বাদ সাধলেন বললে হালকা করা হয় ব্যাপারটা। নিদারুণ তিরস্কার করলেন অর্জুনের মা; সত্যি সত্যি; নির্মম নিষ্করুণ তিরস্কার। অর্জুন জীবনে মায়ের কাছে সেই ছেলেবেলা থেকে সেদিন পর্যন্ত কতবার রিয়াল বকুনি খেয়েছে তার সংখ্যার আঙুলের নাম্বারকে অতিক্রম করতে তখনও অনেক বাকী। কিন্তু তার সঙ্গে তুলনা হয় না আজকের এই মার কণ্ঠস্বরের কিছুমাত্র। কথা যে খুব বেশী কিছু বললেন, তা নয়; কিন্তু তার উত্তাপের তুলনায় গণগণে আগুনের তাপ কম দুঃসহ। মা বললেন একদিন দুজনকেই ডেকেঃ এ কি খেলায় মেতেছিস তোরা? এ কি সব্বনেশে খেলায়? ছেলেরা ঘর ভাঙ্গতে চায়, মেয়েরা আঁকড়ে রাখে, তাই সংসারে থাকে লক্ষ্মী; মেয়েকে দিয়ে রোজ রোজ ঘর তচনচ করানোর এই লক্ষ্মীছাড়া খেলা ছেড়ে দে এখনই; নইলে—

কথাটা সেদিন সম্পূর্ণ করেন নি অর্জুন শ্রীবাস্তবের মা; সন্তানের অমঙ্গল-আশঙ্কাতেই করেন নি নিশ্চয়ই। কিন্তু সেদিন মা উচ্চারণ না করলে কি হবে; আজ ভাগ্যের মুখে উচ্চারিত হতে চলেছে তার অসম্পূর্ণ অংশ। আজ শেষ পর্যন্ত কামিনীর দিক থেকেই তচনচ হয়ে গেল একটি স্বপ্ন; ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল একটি আকাশ যেখানে

দিনের পর দিন মেঘের পর মেঘ মুছে মুছে নীলের পর নীল বুলিয়ে গেছে একটি পুরুষের হৃদয়।

সুজন বাসুদেব অপেক্ষা করছিলেন; কামিনী এসে বলবে, অর্জুনের কথা। কিন্তু কামিনী বলেনি; দুর্জয় অভিমানে গুমরে গুমরে কেঁদেছে কামিনী; পুরুষ মেঘ বৃষ্টি হয়ে নেমে গেলে মাটিতে স্ত্রী মেঘ যেমন তাকে খুঁজে না পেয়ে ডেকে ডেকে বেড়ায় শ্রাবণের সারা বাদল বেলা তেমনই অনেক অন্ধকার রাতে যখন গান এসেছে কামিনীর মনে তখন কে যেন ছিলো না তার সঙ্গে তবুও সে ছিলো। বাবা কি করে মেহরা পরিবারের কথা আদৌ শুনতে প্রস্তুত হলেন; বলতে কোথায় বাধলো, আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই,—বুঝতে পারলো না কামিনী; বুঝতে চাইলো না সে।

মেহরার সঙ্গে কামিনীর বিবাহের বার্তা গোচর করবেন কেমন করে অর্জুনের তাই ভেবে পাচ্ছিলেন না সুজন বাসুদেব। অর্জুন শ্রীবাস্তবের নিমন্ত্রণ পত্র হাতে করে বাড়ি যেতে কোথায় লাগলো তাঁর; অর্জুনের মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। কলেজে গেলেন তাই। গিয়ে শুনলেন, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে কলেজের সব চেয়ে ভবিষ্যৎময় তরুণ ঃ অর্জুন শ্রীবাস্তব। পাগলের মতো এবারে তার বাড়ি ছুটলেন সুজন বাসুদেব। না; সেখান থেকেও মাকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে সে, কেউ বলতে পারলো না।

চার

কামিনী বাসুদেব কামিনী মেহেরা হলো যে কেবল তাই নয়। নিরঞ্জন রায় রঞ্জন রায় হতে যত সময় নিয়েছিলো তার চেয়ে অনেক, অনেক কুইকলি এবং অনেক বেশি পালটে গেল নিরঞ্জনের চেয়ে। দাঁড়কাক ময়ূর সেজে ছিল কথামালায়; কামিনী বাসুদেবকে যারা দেখেছে কামিনী মেহেরাকে তারা দেখলে দেখতে পেত জীবনের

কথামালায় ময়ূর দাঁড়কাক সাজতে চেষ্টা করলে আরও কত হাস্যকর, আরও কত ট্র্যাজিক, আরও কত রিডিকুলাস হয় সেই দৃশ্য। রাতের চেয়ে কালো কাজল হরিণ চোখ থেকে চলে গেল স্বপ্নের অঞ্জন ; তার বদলে উঠলো গগলসের পাখা কামনার আগুনে পুড়ে মরবার জন্যেই বোধ হয় ; ছিপছেপে বেতের মতো মজবুত শরীর থেকে আস্তে আস্তে তরতর করে চলা পাল তোলা নৌকার বিদায় নিলো সচ্ছন্দ বিহার ; পরিবর্তে দেখা দিলো নিতম্ব একবার উচু একবার নীচু করে চলার দৃষ্টিকটু মুভমেণ্ট ; কথার সুরে এলো মেমসাহেবের স্কুলে পড়া বাঙালী মেয়ের মাতৃভাষা পর্যন্ত বিকৃত করে বলার বাহাদুরী। ঠোঁট দুমড়ে মুচড়ে, টেনে হিঁচড়ে হাসার এমন চেহারা যার সঙ্গে হাসার কারণের কোনও যোগ নেয়। কামিনীর গায়ের রং ময়লা কিন্তু কোথায় সমস্ত চেহারাটার সঙ্গে তার সোনায় সোহাগা যোগ হয়েছিলো। সাঁওতাল মেয়ের গায়ের চকচকে কালো রংএর সঙ্গে কয়লার খাদের ; অথবা বুনো অন্ধকারের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিতালী তাকিয়ে দেখলে চোখ জুড়োয়। শ্যামলা মেয়ের যে নরম রং চোখ ধাঁধায় না ; কিন্তু দুচোখ ভরে দেয় যেমন শহরের রৌদ্রদগ্ধ চোখ হঠাৎ গ্রামে গেলে মাঠের সবুজ আকাশের নীল তেমনই কি মায়া ছিলো সেই চোখে মাখানো যার পাশে দারুণ ফর্সা যে কাউকে নিদারুণ ফ্যাকাশে লাগতো ; মনে হোতো রক্তশূন্য ; মনে হতো মানুষ নয়,—মমি। সেই শ্যামলিমার সবুজ আস্তরণ চেঁচে চেঁচে তুলে তার বদলে চুল বাদে আপাদমস্তক হোয়াইট ডিসটেম্পার করলো যেদিন কামিনী, সেদিন ধবলে ধোয়া গা যেমন ভারতীয়কে সাহেব বলে ভুল করায় বটে কিন্তু তারই সঙ্গে কোথায় একটু অস্বাভাবিক, একটু অসুস্থ উজ্জ্বল মনে করায়ও নিশ্চয়ই, তেমনই কৃত্রিম, তেমনই প্রাণহীন পুতুল-পুতুল লাগতে থাকলো যারা তাকে আগে দেখেছে তাদের চোখে অসম্ভব। যারা তাকে আগে দেখেনি এড়ালো না তাদের চোখও। জামার গলা, পেট, বুক উড়িয়ে দিলো কামিনী। সেই তেত্রিশ চৌত্রিশের কলকাতায় এমন অক্লেশে এমন হেসে যেমন অক্লেশে যেমন হেসে আজকেও লোকে আব অপারেশন করতে গিয়েও সম্মতি দিতে

দ্বিধা করে। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবার তখনও অনেক বাকী; অর্থাৎ কলির তখন সবে সন্ধ্যে।

রঞ্জন রয়ের সঙ্গে কামিনী মেহেরার দেখা যখন তখন রঞ্জনের মুখে মদের গেলাস এবং কামিনী মেহেরার ঠোঁটে সিগারেট উঠেছে অনেকদিন; দেখা হলো শান বাঁধানো শহরের রাজপথে নয়; শহর থেকে দূরে পুরীর সমুদ্রতীরে।

পাঁচ

কামিনী মেহরা বসে বসে পিকচার প্যালেসের পাতা ওলটাচ্ছিলো। গ্লোরিয়া এসে ঢুকতে চোখ তুলে তাকালো। গ্লোরিয়া বললো: একটু বসুন; মিস্টার মুন্সী আসছেন এখনই। কামিনী কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে বললো: আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম এখন; মিস্টার মুন্সীর কাছে নয়। গ্লোরিয়া হাসলো: তার মানে, এখন যিনি এখানে উপস্থিত তিনি কামিনী মেহরা নন; তিনি—,বলবে কি বলবে না ভেবে ভেবে উঠতে পারছিলো না গ্লোরিয়া; কামিনী তাকে রেহাই দিলো: তিনি হচ্ছেন ডলোরেস ডেলরিও—। তারপর দুজনেই একটু কথা খুঁজে না পেয়ে পরের চুপ করে থাকবার পর কামিনীই আবার জের টানলো: আমি ভেবেছিলাম আপনি শুধু ছবিতে নামবার জন্যে এপ্লিকেশান লেটার দিয়েছিলাম সেইটেই পেয়েছেন বুঝি; তাহলে আর একখানা চিঠিও পেয়েছেন এর মধ্যে? গ্লোরিয়া তখনও কথা কইছে না দেখে কামিনী একটু অপ্রস্তুত ভাব কাটাবার জন্যেই যেন বলে উঠলো: আপনি ওফেণ্ডেড হয়েছেন? গ্লোরিয়া লুকোল না: হোয়েছিলাম এ বিট, তবে সে পাবার পর প্রথম চোটে; ইটস পার্ফেক্টলি ওল রাইট নাও। কামিনী: আপনি কি কোনও ডিসিসন নিয়েছেন এ বিষয়ে?

ঠিক সেই সময়ে ঘরের পর্দা ঠেলে এসে ঢুকলো রতনলাল মুন্সী; এসেই কমিনীর কথার কিউ ধরে জবাব দিলো: উই হ্যাভন্ট এাস

ইয়েট। আরও কিছু মেয়ের এ্যাপ্লিকেশান এয়োয়েট করছি আমরা; ওয়েল আপনি কি এব আগে আব কোনও ছবিতে কাজ করেছেন না এখন কবছেন? কামিনী না কবার ভঙ্গীতে মাথা নাড়লো। বতন একটু চিন্তামগ্ন কণ্ঠে কি ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক বললো: লায়লাব বোলে যদি নাও হয় তো অন্য কোনও ইম্পর্টাণ্ট বোলে নামতে আপনাব আপত্তি আছে? কামিনী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেয় কথাটা: এ্যাবশোলুটলি নাথিং, এনি বোল ইস গুড ইনাফ ফ'মি,—যদি অফকোর্স আমাকে দিয়ে মোভি একটিং আদৌ হয়—

মুন্সী: হয় কি হয়না,—বুঝতে হলে আপনাকে বুধবাব বেলা তিনটেয স্টুডিওতে আসতে হবে একবাব, আবও কযেকজনকেও ডেকেছি—কামিনা থ্যাঙ্কস দেয। মুন্সী গ্লোবিয়াকে বলে: আমি আধঘটাব জন্যে বেবোচ্ছি একবাব, চা দাওনি মিসেস মেহেবাকে? বতনেব কথা শেষ হবাব আগেই ঢোকে বয় চায়েব ট্রে নিয়ে।

কামিনী: আমাব বিষযে ডিসিসন জানতে আসিনি, ডলোবেসেব চিঠি পড়ে ঠিক কবলেন কিছু—হোযাট শুড য়ু ডু ইন ফিউচাব?

গ্লোবিযা: আই ডু এনিথিং এক্সেপ্ট হোযাট য়ু ওযাণ্ট মি টু ডু ইন ফিউচাব -

কামিনী: তাহলে আপনি আমাকে বন্ধু বলে নিতে পাবেন নি?

গ্লোবিযা: কেন?

কামিনী: ইটস সিম্পল! আপনি আমাকে তাদেবই একজন ভেবেছেন,—ওয়ান অভ দোস ফিলথি ব্যাটস,—যাবা কেবল ফুটো জাহাজ ছেড়ে পালায না, স্ক্যাণ্ডালমংগাবে আনন্দ পায। বলুন, সত্যি তাই ভেবেছেন কি না—

গ্লোবিযা: বিলিভ মি, ইটস্ নট দ্যাট,—তবে, একটু আশ্চর্য হয়নি বললে মিথ্যে বলা হবে—

কামিনী: আপনি বুঝতে পাবছেন যে এ চিঠি যে লেখে সে ওল-মোস্ট স্বীকাব কবে যে সে একজন ডিক্টিম এ

ব্যাপারে ;—একজন মেয়ে কতদূর জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেলে তবে সম্পূর্ণ স্ট্রেঞ্জারের কাছে এমন কনফেশান করে ?

গ্লোরিয়া : কিন্তু, আপনার চিঠি আমার ওপর কম্‌প্লিটলি উল্টো রিয়্যাকশান করেছে—

কামিনী : কি রকম ?

গ্লোরিয়া : আপনাদের এই ডায়মাণ্ড স্লিপারের রঞ্জন রয়ের মতে সব মেয়েই সমান,--এই তো ? জীবনে একবার অন্তত ঠেকে জানুক অন্তত: যে সব মেয়েই সমান নয়—

কামিনী : কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা, মনে রাখবেন -

গ্লোরিয়া : আগুন নিয়ে খেলা বলেই তো মনে এত জোর আমার—

কামিনী : লেট গড গিভ য়ু ইনাফ স্ট্রেন্‌গ্‌থ -

গ্লোরিয়া : ভগবানকে এই তুচ্ছ ব্যাপারে কেন ব্যস্ত কচ্ছেন ? তাঁর অনেক কাজ। তার চেয়ে আপনার চিঠিতে আমি অনেক স্ট্রেনগ্‌থ পেয়েছি। গ্লোরিয়া হাত বাড়িয়ে দেয় --।

রাস্তায় বেরিয়ে কামিনী বুঝলো গ্লোরিয়া মরবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ; যে পীপিলিকার পাখা ওঠে মরবার জন্যে আগুনের লেলিহানশিখা থেকে তাকে বাঁচায় কে। একদিন ঠিক আজ গ্লোরিয়া যেমন, সেদিন কামিনী মেহেরাও তেমনই রঞ্জন আর যার সঙ্গে যাই করুক, তার সঙ্গে সুবিধে করতে পারবে না,—মনে করে এগিয়েছিলো। তারপর যা ঘটে গেছে তা কেবল রঞ্জন জানলে তবু হতো ; কিন্তু জেনে গেছে ডায়মাণ্ড স্লিপারের পোকামাকড় পর্যন্ত। রঞ্জন অথবা কামিনী কাউকেই জানতে হয়নি সে বার্তা কষ্ট করে। কুসুমে কীটের খবর কেমন করে পুষ্পলোভীর কাণে যায় সে কথা বলা যায় না বটে কিন্তু যায় যে এ বিষয়ে সন্দেহ কি ?

কামিনী মেহেরা চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো রতন।

গ্লোরিয়া : তুমি লায়লা ছাড়া অন্য রোলের কথা বললে কেন কামিনী মেহরাকে ? ওকে দিয়ে চলবে না ?

রতন : চললেও, চালাবার প্রয়োজন হবে না—

গ্লোরিয়া : তার মানে লায়লাকে পেয়ে গেছ ?

রতন : এক্স্যাক্টলি শো ; অনেকদিন আগে—

গ্লোরিয়া : অনেকদিন আগে ? কোথায় ?

রতন : প্রথম দেখেছিলাম দার্জিলিং-এর পাহাড়ে,—লাগাম না মানা ঘোড়ার পিঠে ; দ্বিতীয়বার বিলেতে—

গ্লোরিয়া বয়বাবুর্চি ভুলে চীৎকার করে ওঠে : কিডিং ? য়ু ডোন্ট মিন ইট ?

রতন : আই মিন ইট ; এভরি লেটার অভ ইট—

বাচ্চা ছেলের মতো হাততালি দিয়ে ওঠে গ্লোরিয়া : মজনু করবে কে ?

রতন মুন্সী বলে চোখে চোখ রেখে : রঞ্জন রয়—

বয়টা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে : ফিউস হয়ে গেছে, - মেমসাব—!

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

সন সেই তেরশো বত্রিশ-তেত্রিশ; পুরীর সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়েছিলো রঞ্জন রয়। কথা বলছিলো হঠাৎ সিবিচে দেখা হয়ে যাওয়া পুরণো বন্ধু কমল সরকার এবং তার গাইয়ে বন্ধু গীতালির সঙ্গে। ইতোমধ্যে একটি সর্বাঙ্গ অসম্ভব সাদা ডিসটেম্পার করা মেয়ে হনহন করে হেঁটে অনেকটা বেরিয়ে চলে গিয়ে থেমে গেল দারুণ ঝাঁকুনি দিয়ে যেমন থেমে যায় ট্রাম সামনে কোনও গেঁয়ো লোক পড়ে গেলে তেমনই অনেকটা। তফাতের মধ্যে কেবল, এই মেয়েটি থামলো পেছনের কাকে দেখে। রঞ্জন, কমল, গীতালি কাকে দেখে সেই চলন্ত ডিসটেম্পার চটকরে ব্রেক কষে পিছু ফিরলো তখনও পর্যন্ত তিনজনের একজনের কাছেও তা ক্লিয়ার নয় এতটুকুও। যে স্পীডে এগিয়েছিলো প্রায় সেই স্পীডে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে চোখ থেকে খুলে নিলো গগল্‌স্: খুলে নিয়ে রঞ্জনকেই জিজ্ঞেস করলো: এ্যাম আই স্পিকিং উইথ মিস্টার রঞ্জন রয় অফ ক্যালক্যাটা? রঞ্জন একটু থতমত খেয়ে গেল: একমুহূর্তের জন্যেও নয় পুরো অবশ্য। তারপরই ফিরে এলো তার স্মার্টনেস; যেমন শরীরের কোনও জায়গা অনেক্ষণ চেপে ধরার পর ছেড়ে দিলে ফিরে আসে রক্তের লাল আবার। রঞ্জন রয়ও ইংরেজীতেই জবাব করলো: য়ু আর। মেয়েটি আবার প্রশ্ন করে: ডু য়ু প্লেস মি? রঞ্জন আবার উত্তর দেয়: আই ডু। আমন্ত্রণ জানায় মেয়েটিই এবার: ইফ য়ু কেয়ার টু মিট মি; য়ু কাম হিয়ার। বি-এন-আর হোটেলের ছত্রিশ নম্বর কামরায় ঠিকানা দিয়ে গগল্‌স্ চোখে তুলে আবার হনহন করে এগিয়ে যায় আমন্ত্রণকারিণী; সিবিচে সমুদ্রের ঢেউয়ের চেয়েও বেশী ক্রাউডের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় এত দ্রুত যেন ম্যাজিক, যেন ভানুমতীর খেল, যেন এতক্ষণ যা হচ্ছিলো, এতক্ষণ তা হচ্ছিলো না বলেই মনে হলো উপস্থিত তিনজনেরই। চলে যাবার পর ছবির ফিল্‌ম্ কেটে যাবার

মতো একটুক্ষণ নির্বাক হলো পর্দা। তারপর আবার আস্তে কখন গ্রথিত হলো ছিন্নসূত্র। গীতালি এবং কমল প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞেস না করে পারলো না কিছুতেই : ইনি কে বট? রঞ্জন ভাববার চেষ্টা করছিলো; দুটি অনিবার্য ভাবনা অধিকার করেছিলো তার মন। সদ্য জাগরিত কেউ কাউকে প্রশ্ন করলে সে যেমন আঁত্‌কে ওঠে তেমনই অস্ফুট আওয়াজ করে রঞ্জন : কি বলছ? হাসে গীতালি এবং কমল সরকার দুজনেই আবার রিপিট করে তাদের কোয়েশ্চেন পেপার; রঞ্জন বলে : আমি কিছুতেই প্লেস করতে পাচ্ছিনা, কে? গীতালি এবং কমল সরকার আবার দুজনেই হাসলো।

রঞ্জন রয় র‍্যালি প্লেস করতে পারলো না কে এই লা বেল দঁ? সারা রাত ছটফট করেও খুঁজে পেলো না হারানো নাম। হোটেলে গিয়েই বা নাম বলবে কি করে যার সঙ্গে দেখা করতে চায় ভাবতে ভাবতে হোটেলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছেও নাম মনে করতে না পেরে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল; ম্যানেজারই শেষ পর্যন্ত বাঁচালো : জিজ্ঞেস করল সেই অবধারিত এক প্রশ্ন : কার সঙ্গে দেখা করবেন? তারপর নিজেই বললো : মিসেস মেহেরার সঙ্গে? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো রঞ্জনের; কামিনী মেহেরা। ডায়মাণ্ড প্লিপারে এক-আধবার দেখেছে; কোনও সময়েই ভালো করে কথা হয়নি। হোটেলের সবচেয়ে ভালো ঘরে যখন একজন পৌঁছে দিয়ে গেলো রঞ্জনকে তখন স্ল্যাক পরে ইজীচেয়ারে বসে কামিনী হোল্ডারে লাগিয়ে সিগারেট টানছিলো। রঞ্জন যেতে চোখের কোণ দিয়ে হাসলো : নাম মনে পড়েছে আমার?

রঞ্জন : দিস ইজ নট ফেয়ার মিসেস মেহেরা—, আই এ্যাটলিস্ট টুক য়ু ফ'এ পার্ফেক্ট স্পোর্ট!

কামিনী : ভুল করেছিলেন হয়তো; করা কিছু বিচিত্রও নয়,—

র : কেন?

কা : আমাদের সম্বন্ধে প্রবচন আছে না? দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।'

র ঃ আপনি ইংরেজি ছাড়াও আরও একটা ভাষা এ্যাটর্লিস্ট জানেন দেখছি—

কা ঃ একটা নয়; দুটো। সংস্কৃত আর উর্দু—

র ঃ যাক,—একটা কথা বলো, তোমাকে প্লেস না করতে পারায় অন্যায় করেছি কিছু? ক'বার দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে ডায়মণ্ড শ্লিপারে গুণে বলতে একটা আঙুলও লাগে না বোধ হয়—

কা ঃ দেখা হলেই বা লাভ কি হতো?

র ঃ ক্ষতি হতো না, বলতে পারি অন্ততঃ

কা ঃ আমার ক্ষতি হতো—

র ঃ কেন?

কা ঃ কারণ শুনেছিলাম আপনার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, শান্তিতে যারা স্বামীর ঘর করছে, সেই সব মেয়েদের ঘর ভাঙা—

র ঃ তাহলে আমি এখন বদলেছি বলো?

কা ঃ বদলে না থাকলে,—বদলে যাও যাতে তার জন্যেই এবারে যেচে ডেকেছি তোমাকে—

র ঃ ভালই হয়! হাওয়া বদলের জন্যে এসেছিলাম; মনের হাওয়া পালটে যেতে পারব!

দুজনে বেরুলো একটু বাদে; গিয়ে উঠলো যে জায়গায় পুরীতে এমন জায়গা আছে, রঞ্জন তো বটেই, পুরীতে যাদের জন্ম এবং বড় হওয়া তাদেরও অজানা।

ঝাউবনের মধ্যে একটি আশ্চর্য পরিষ্কার নির্জন অন্ধকার।

দুই

ঝাউবনের মধ্যে এরকম একটা পরিবেশ; এমন মনোরমতর সঙ্গ সত্ত্বেও রঞ্জন রয় যথেষ্ট উৎসাহিত, যথেষ্ট উত্তেজিত বোধ করতে পারলো

না; বরং নারীমৃগয়া যার অর্থ-অন্বেষণের বাইরে একমাত্র অকিউপেসান সেই রঞ্জনের কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো। তার কেবলই মনে হতে লাগল কেন সে বলতে পারবে না, সব ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা ট্র্যাপ কিনা; মিসেস মেহরার সঙ্গে তার প্রায় একোয়েণ্টেলের চেয়েও ক্ষীণ পরিচয়েব সূত্র। মিস্টার মেহরাকে একবারও কিন্তু দেখবার সুযোগ হয়নি তার; কারুরই হয়েছে কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে রঞ্জনের। অথচ ট্র্যাপের কোনও জীবনসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত কারণ এখন পর্যন্ত অনুপস্থিত। অর্থের অভাব এর এজীবনেই কারণ হতে পারে না কিছুতেই। অর্থ নয়; এম-কে ইণ্ডাষ্টিসের যা আছে তাকে প্রাচুর্য বললে মডেষ্টলিই বলা হয়। তাহলে? মিসেস কামিনী মেহরা কি অতৃপ্তকামনারী? না; তাও তো মনে হয় না। রঞ্জন যা, রঞ্জন তা না হলে রঞ্জনের অবশ্যই তা ই মনে হতো। কিন্তু রঞ্জন ডবোথীপর্বের পর ক'বছরে মেয়ে মানুষ ঘেঁটেছে ডাক্তার যেভাবে রুগী ঘাঁটে; নার্স যেভাবে ঘাঁটে রুগীর ঘাঁ পুঁজ। নারীর নাড়িনক্ষত্র জানার দাবী রঞ্জন রয় করে না নিশ্চয়ই; কিন্তু অন্য আর পাঁচজন মেয়েদের সঙ্গে না মিশে মেয়েদের সম্পর্কে গল্প বানাতেই যাদের জীবনী শক্তি ব্যয় হয় তাদের একজন নয় যে, এ তার মুখ দর্শনেও আপত্তি আছে এমন বৈরীও স্বীকার করবে। তাই যেহেতু কামিনী মেহেরা মুখে বং মাখে; গলাকাটা, বগলকাটা, কোমরকাটা জামা পরতে অভ্যস্ত সেই সুদূর অতীত কলকাতাতেই; সিগারেট জ্বলে তার ভারতীয় ঠোঁটে প্রকাশ্যে; সেই হেতুই সে মন্দ স্ত্রীলোক' বা নিমফোম্যানিয়াক অথবা স্বামীসঙ্গে অসুখী এমন মনে করে কনক্লুশানে চটকরে পৌঁছে যাবার মতো অপবিণতবুদ্ধি বিলিতি উপন্যাসের নাবালক পাঠক নয়। বরং তার অভিজ্ঞতায় কখনও কখনও এই প্রকাশ-অযোগ্য নিদর্শন রয়েছে যখন সাতহাত ঘোমটার আড়ালে খেমটার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়েছে দিবালোকে হাতছানি দিয়ে ফেরিওলা ডাকার চেয়েও। উল্টোপক্ষে যাদের সম্পর্কে প্রায় সকলেরই ধারণা হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবার বলে তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই হাত বাড়ালেই মেলেনি বান্ধবীর দেখা। এরা বাইনেচার

একটু বেশী জলি হয়ঃ এদেশের তুলনায় একটু আনয়ুযালি স্পোর্ট হয় আর লোকে ভুল করে অনায়াসলভ্যা ভেবে আনন্দ পায়। কেচ্ছাও করে কেউ কেউ; নাগালের বাইরের দ্রাক্ষাফল মাত্রই মন্দজ্ঞানে সরব হয় জীবনের কথামালায় যারা তাদের একমাত্র যথার্থ সংজ্ঞা হচ্ছে, তারা প্রায়ই টোয়েন্টয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স।

কামিনী মেহেরার মুখে এসব চিন্তার ছায়া পর্যন্ত নেই। দিব্যি গুছিয়ে গল্প করবার মুড তাব। সে বললোঃ আপনার সম্পর্কে যেসব গল্প শুনেছি তার সঙ্গে কিন্তু আপনার চেহারা মিলছে না মোটেই!

রঞ্জনঃ কি শুনেছিলে তা না বললে চেহারা মেলাই কি করে বলো?

কামিনীঃ আমি যা শুনেছি, তা কি আর একা আমার কাণের জন্যেই ছড়ানো; তোমারও তো শোনা আছে কিছু কিছু আপনার সম্পর্কে অন্যান্যদের কি ধারণা; নেই শোনা?

রঃ নিজের সম্বন্ধে তো আছেই; তোমার সম্পর্কেও কিছু কম শোনা নেই কামিনী

কাঃ তার সঙ্গে আমার চেহারার মিল পাচ্ছো?

রঃ একদম না; তুমি আমার সঙ্গে আমার সম্পর্কে ধারণার যদি এতটুকু মিল পেয়েও থাক,- আমি তোমাকে কম্‌প্লিটলি তার কনট্র্যারি দেখছি -

কাঃ এবার র‍্যালি জানতে লোভ হচ্ছে, আমার সম্বন্ধে কি কি শুনেছো?

রঃ সে কি তোমাকে বলা সিভালরি হবে?

কাঃ খুব খারাপ কিছু শুনেছো নিশ্চয়ই?

রঃ ভালো কিছু শুনিনি যে তা তো ভালো করেই তোমার জানা -

কাঃ তাহলে আর তার সঙ্গে আমার মিল পাচ্ছনা কেন?

রঃ কি মিল পাবার আছে বলো,-- শুনি!

কা ঃ কেন? আমার সর্বাঙ্গে তো সেই মিল সারাক্ষণ ঝিলমিল করছে—

র ঃ কি রকম?

কা ঃ এই আমার ঠোঁটে সিগারেট; মুখে রং; জামাকাপড়ের বাহার, পুরুষবন্ধুর বাহুল্য, —মন্দ মেয়ের সঙ্গে এমন উত্তম মিল তো শেলি কিটসও দিতে পারতেন না—

র ঃ তুমি কি আমাকে সেই তাদেরই একজন মনে করছ না কি—

কা ঃ তা মনে করলে এত কথা জানতে চাইব কেন? তাদের কথা তো আমার জানা আছে; তোমার কথা শুনি—

র ঃ একদিনে সব শুনে নিলে,—বাকী দিনকটা কি করে কাটাবে তাহলে? তার চেয়ে আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে; তার জবাবটা দেবে?

কা ঃ অসঙ্গত না হলে নিশ্চয়ই দেবো—

র ঃ সঙ্গত না হলে আমি সে প্রশ্ন করবই বা কেন? তুমি আমাকে হঠাৎ ধরে নিয়ে এসেছ কেন? এটা কি বেড়ালের সঙ্গে ইঁদুরকে নিয়ে খেলানো?

কা ঃ না। মরীচিকার পথিককে ভোলানো?

র ঃ কে পথিক আর কে মরীচিকা, শুনতে পাই?

কা ঃ একদিনে সব শুনে নিলে, বাকী দিন কটা কি করে কাটাবে তাহলে? তার চেয়ে আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে; তার জবাব দেবে?

র ঃ সঙ্গত হলে নিশ্চয়ই দেবো না—

কা ঃ অসঙ্গত প্রশ্ন না হলে তোমার কাছে তার জবাবই বা চাইতে যাব কেন? তুমি নাকি বলে বেড়াও, যে জগতে এমন কোনও মেয়ে নেই যাকে ইচ্ছে করলে না বার করে আনা যায় স্বামীর ঘর থেকে!—এটা কি ফিকশন নয়?

র: না; ফ্যাক্ট।

কা: ফ্যাক্ট?

র: কেন? তুমি এত জানো আর এটা জানো না যে ফ্যাক্টস আ'স্ট্রেঞ্জা' দ্যান ফিকশান—

কা: জানি; কিন্তু সব সময়ই যে তা নয়,—এইটে তোমারই এখনও জানা নেই দেখছি—

র: একটা জিনিস জেনো; নতুন কিছু জানতে আমার মত উৎসাহীর জুড়ি পাবে না কোথাও।

ফেরার রাস্তায় কামিনী বললো: এবার আপনি আসুন; আমি একাই যাবো—। রঞ্জন রাজি হলো না: ঝাউবনের নির্জনে যখন বিশ্বাস করতে পেরেছ, তখন প্রকাশ্য রাস্তায় নিশ্চয়ই পারবে! কামিনী হাসলো: সেজন্যে নয়; এখানে তোমার সঙ্গে আমাকে দেখলে অনর্থক কেউ কেউ ভাববে আমাদের রিলেশন বুঝি তাই; আমাদের রিলেশন আসলে যা কোনওদিন হবার নয়। রঞ্জন লক্ষ্য করলো কামিনীর তাকে সম্বোধন-পাঠ 'তুমি'-তে নেমে গেছে। রঞ্জন কামিনীর 'না' শুনলো না; সঙ্গে গেলো। দু চার পা যেতে না যেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল হঠাৎ কামিনী। রঞ্জন তাকে পাঁজা কোলা করে এনে শুইয়ে দিল পাথরের ওপর। সমুদ্রের জল ছিটিয়ে দিলো কপালে; চোখে। কিন্তু গায়ে হাত দিলো না শুইয়ে দেবার পর আর। কেন জানে না তার মনে হলো কামিনীর জ্ঞানহারা হওয়াটা আসলে অজ্ঞান হওয়া নয়; অজ্ঞান হবার ভাণ মাত্র। তবুও নিজেকে চেক করলো সে; রিস্ক নিলো না কিছুতেই। কামিনী যদি বিড়াল হয় তাহলেও সে ইঁদুর নয়,—এ প্রমাণটা অন্তত না দিলে রঞ্জনের জীবনে ডবোথা আসেই নি বলতে হবে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার চলতে স্থরু করল মিসেস মেহরা। রঞ্জন কেবল বললো: একা ছেড়ে দিলে কি হতো আজ বুঝেছ? কামিনী সে কথার জবাব না দিয়ে আবার সংস্কৃত বললো: পণ্ডিতেরা ঠিকই বলেছেন: পথি নারী বিবর্জিতা; তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলাম—।

কয়েকদিন এদিক ওদিকে অর্থহীন ঘুরে বেড়াবার পর যাবার আগের দিনে রঞ্জনের কামিনী আবার তাকে ঝাউবনের সেই পুরোণো স্পটে নিয়ে এলো। সেখানে একথা-ওকথার পর এক সময়ে রঞ্জনের কেন যেন মনে হলো : নাও অ' নেভার। সে কামিনীর দু কাঁধ বাঘের মতো শক্ত থাবায় বাগিয়ে ধরে কাছে টানবার চেষ্টা করতেই ছাড়াবার প্রয়াসে ছটফট করতে লাগলো কামিনী। তারপর ছটফটানি হঠাৎ কমে যেতে রঞ্জন মনে করলো জোবের দরকার নেই আর বুঝি; পাখী এবার আপনা থেকেই পোষ মানবে; জোর আলগা করতেই ছাড়িয়ে নিলো কামিনী নিজেকে; আর নিয়েই যত জোর শরীরে ছিলো সবটুকু দিয়ে একটি প্রচণ্ড চড় মারলো রঞ্জনের ফর্সা গালে। পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এক মিনিটও দাঁড়ালো না কামিনী। হন হন করে এগিয়ে গেল সমুদ্রতীরে প্রথম দেখা হবার মুহূর্তে যেমন এগিয়ে গিয়েছিলো রঞ্জনকে ছাড়িয়ে অনেক দূর। রঞ্জন ছেলেমানুষের মতো চীৎকার করে উঠলো : কামিনী, ডোন্ট লিভ মি; আমি রাস্তা চিনি না । কামিনী ফিরেও তাকালো না।

তিন

কামিনী চলে যেতে প্রথম যে চিন্তা ভীড় করে তুললো রঞ্জনের মাথায় তা কামিনীর নয়: এই ঝাউবন থেকে বেরুবার পথ বার করার। একটা দোলনা কারা টাঙ্গিয়ে রেখে গিয়েছিলো সেখানে বসে পরপর দুটো সিগারেট টেনে উঠে দাঁড়াতেই দেখলো কামিনী মেহরা আবার ফিরে আসছে। এসেই জিজ্ঞেস করলো : তুমি কি তোমার বাড়ি ফিরতে চাও? রঞ্জন: ইয়েস বলবার আগেই কামিনী আবার হাঁটতে সুরু করে দিয়েছে ঝড়ের বেগে। কোনও রকমে প্রায় দৌড়ে রঞ্জন ফলো করে এসে পৌঁছলো শহরে। যে মোড়ে এসে রঞ্জনের বাড়ির রাস্তা আলাদা হয়ে গেছে কামিনীর হোটেলের পথের থেকে সেইখানে

এসে কামিনী অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে রঞ্জন আরেকবার চেঁচালো : তোমার স্কার্ফটা নেবে না ? কামিনী সৈনিকী এবাউট টার্ণ করে প্রায় ছোঁ মেরে চিলের মতো স্কার্ফটা নিয়েই বিদ্যুৎবেগে আবার নিজের পথ ধরে এগিয়ে ফেড আউট করে চোখের পলক ভালো করে পড়বার আগেই। রঞ্জন রয় একটি কথাও বলে না ; ফিরে আসে বাড়িতে। পরের দিন কলকাতায় ফেরবার গোছগাছ আরম্ভ করে দেয়। সঙ্গে এক ছোট ভাইকে নিয়ে এসেছিলো, তার স্কুল খুলবে দু'তিন দিন পরে। পরের দিন স্টেশনে পৌঁছে দেখে কামিনী দাঁড়িয়ে আছে আগে থেকেই।

কামিনী : তোমার যাওয়া হবে না ; কথা আছে আমার—

রঞ্জন : এর স্কুল খুলছে ; আমাকে যেতেই হবে।

কামিনী : না ; ওকে তুলে দিলে ও সচ্ছন্দে চলে যেতে পারবে :

তারপর রঞ্জনের ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে কামিনী : কিরে বাবলু পারবিনে একা যেতে ? ভয় করবে ? বাস ; এতেই কাজ হলো। বাবলুর আত্মমর্যাদা এমন আহত হলো যে সম্ভবত এরপর রঞ্জন তার সঙ্গে যেতে চাইলে সে অন্য ট্রেন ধরতে চাইতো। বাবলু চলে গেল সেই ট্রেনে : রঞ্জন ফিরে এলো। কামিনীর সঙ্গে তার হোটেলে এসে উঠলো ; রঞ্জন যে বাড়িতে ছিলো সে বাড়িতে ফিরে যাওয়া দৃষ্টিকটু হতো তা-ই।

হোটেলে এসে হাউহাউ করে কাঁদলো কামিনী। মাথার চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে থাকে রঞ্জন। খুব নরম গলায় ; আস্তে বলে : ছিঃ কাঁদে না। আরও অবাধ্য হলো কান্নার উত্তালতরঙ্গ। ঘরের মধ্যে কখন এসে পড়েছে ভোরের আলো টের পায়নি সে রাতে তারা কেউ। না যে চড় মেরেছিল নরম হাতে সে ; না যে শক্ত গাল পেতে দিয়েছিলো সেই চড় খেতে।

না। টের পেয়েছিল। বেয়ারা বেডটি নিয়ে এসে দরজায় টোকা দিতে।

চার

রঞ্জন রায়কে থাপ্পড় মারবার পরেও কেন রঞ্জনের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারলো না কামিনী মেহেরা। শেষ পর্যন্ত পুরীর সমুদ্রতীরে রঞ্জনের সঙ্গে কামিনী যে কদিন ছিলো সে কদিন জানতে পারে নি। কলকাতায় ফিরে এসেও না। মনের মধ্যে তীব্র অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে ; রঞ্জনের মুখ জীবনে আর না দেখবার প্রতিজ্ঞায় হয়েছে দৃঢসঙ্কল্প। কিন্তু রঞ্জনকে দেখবারও প্রয়োজন হয়নি; টেলিফোনে তার গলার বাঁশী শুনেই নতুন করে মরেছে কামিনী। হয়ত কোনও দিন বুঝতোও না কামিনী রঞ্জনের জন্যে মেয়েদের এমন পাগল হবার জোর অথবা জাদু রঞ্জন রয়ের কোথায়: যদিনা একদিন দুর্ভাগ্য, না কি সৌভাগ্য হতো কামিনার ডায়মাণ্ড শ্লিপারে পাশের টেবলে আড্ডায় উন্মত্ত এক দক্ষিণ ভারতের সুউচ্চ কণ্ঠ দৈবাৎ শুনবার। টেবলে কয়েকজনের সঙ্গে সাঙ্ঘাতিক তর্ক জমেছিলো কাফির কাপের ওপর। প্রথমটায় কান দেয়নি; কিন্তু দু'একটা টুকরো সেই উত্তপ্ত কথাবার্তার, কড়া থেকে ছিটকে পড়া তেলের মতো, কানে এসে লাগলো। লাগতেই উৎকর্ণ হলো কামিনী। বধির যেমন হঠাৎ যদি তার নাম শোনে একটু দূরে কারুর মুখে তাহলে ধরে নেয় অবধারিত যে তাকে গাল দেওয়া হচ্ছে এবং তখন প্রাণপণ পোজ করে না শুনবার অথচ চেষ্টা করে সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে তা গেলবার তেমনই কামিনী মেহরা সম্পর্কিত আলোচনা না হলেও যা নিয়ে তর্ক, তা তার একটি জীবন-মরণ প্রশ্নের বন্ধ দরজা অবারিত করে দিলো মুহূর্তে; তাই সে এতদিনের বন্ধ গৃহের ভিতরটা পুরো পরিদর্শন না করে উঠে যেতে চাইলো না; অথচ ডিসটেম্পার্ড মুখের ওপর নির্লিপ্ততার এমন মুখোস এঁটে বসে রইলো যে সে যে হাঁ করে গিলছে পাশের টেবলের দক্ষিণ ভারতীয় মারাত্মক-উচ্চারণ

ইংরেজির কথা, সেমিকলন, স্টপ পর্য্যন্ত ; মায় উচ্চারণের উঁচুনীচুর রংফাউন্ট অব্দি তাকে বলবে।

দক্ষিণ ভারতীয় সেই ভদ্রলোকের বক্তব্য ছিলো বশীকরণ নামক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব পৃথিবীর সর্বত্রই অল্পবিস্তর ছিলো ; এখনও আছে ; এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ' শ্রোতারা এর সম্পূর্ণ বিপক্ষে। তাদের মতে বশীকরণ একটা বিরাট ধাপ্পা ; আসলে কামাখ্যার মানুষকে ভেড়া বানানো যায় বলে যেমন গপ্পো চালু আছে চিরকাল অথচ আজ পর্যন্ত যত ভেড়া দেখা গেছে তারা কামাখ্যায় কেন পৃথিবীর সর্বত্রই হেনপেকৃড হ্যাসব্যাণ্ড ছাড়া কিছু নয় ; অনুরূপ বাজে কথা এই বশীকরণ ব্যাপারটাও। মান্দ্রাজী জেণ্টলম্যান তার অপূর্ব ইংরেজিতে বলতে চায় যে তার দেশে এমন সবুজ রংএর একটা গন্ধচূর্ণ আছে যা কোনও পুরুষ যদি, কোনও রমণীকে অথবা কোনও স্ত্রীলোক কোনও পুরুষকে পানীয়ের সঙ্গে গলাধঃকরণ করাতে পারে তাহলে সেই স্ত্রীলোক অথবা সেই লোক যা হবে সেই লোক অথবা সেই স্ত্রীলোকের, কামাখ্যার ভ্যাড়াও তার তুলনায় অনেক কম বাধ্য। শুনতে শুনতেই দারুণ চমকে চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলো কামিনী ; কোনও রকমে সামলালো।

রঞ্জন রয় যে পানীয়টি তুলে ধরতো কামিনী মুখের কাছে তার রং সবুজ নয় ; গোলাপী।

সেই তর্কের রাউণ্ড টেবল থেকেই আরেকটা তথ্যও জোগাড় করলো মিসেস মেহরা ; সেটি অবশ্য অনেক বেশি প্রধান এবং প্রয়োজনীয়। তথ্যটি হচ্ছে এই যে দক্ষিণ ভারতের ওই গন্ধচূর্ণর চেয়ে কম কার্যকরী কিন্তু অনেক বেশি দামের অনুরূপ একটি এসেন্স পাওয়া যায় হগসাহেবের বাজারের একটি বিশেষ স্টলে। স্টলের নাম বলতেই সচকিত হলো কামিনী ; স্টলটি তার সবিশেষ পরিচিত। এই দোকানে কত দশ বছরে কতশো বার গেছে সে দুর্মূল্য ও দুর্লভ কসমেটিক্স কিনতে, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ।

তার পরের দিনই। দোকান থেকে বেশ কয়েকগজ দূরে তখনও

কামিনী। সুলেমান, মেঘ দেখলে চাতক যেমন উর্দ্ধমুখে অধীর হয় তেমনই এগিয়ে এসে ব্যগ্র কৌতূহলে সরব হলো : আইয়ে মেমসাব; আতাই নেহি কেতনা রোজ হুয়া। কামিনী ঢুকে গেল ভেতরে। তারপর আস্তে জিজ্ঞেস করলো জিনিষটার নাম করে, আছে কি না। সুলেমান বলল; আছে; তবে তার কাছে নেই,—দরকার হলে এনে দিতে পারে। কামিনী দেখতে চাইলো একবার। সুলেমান বললো : দেখবার কিছু নেই; অন্য যে কোনও জলীয় জিনিষের মতোই, নানা-রকম রঙের পাওয়া যায়। কয়েক ফোঁটার যা দাম বললো সে দাম যার ওপর পরীক্ষা করে দেখবার, তার কানে গেলে, আর প্রয়োজন হবে না পান করবার। সুলেমান কমিনীকে সেই ঘরের মধ্যেই অপেক্ষা করতে বলে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই বাইরে পাওয়া গেল কার পায়ের আওয়াজ। আগন্তুক 'সুলেমান' বলে ডেকে সাড়া না পেয়ে ঢুকে গেল ভেতরের দোকানে। ঢুকেই থেমে গেল; না পারে আর ঢুকতে, না পারে বেরুতে। কামিনীর অবস্থা আরও করুণ; এখনই সুলেমান এসে পড়বে; হাতে যে জিনিষ নিয়ে এসে ঢুকবে সেই বামালসুদ্ধ ধরা পড়বে সুলেমান নয়; কামিনী মেহেরা। ভাবা শেষ হবার আগেই এসে ঢুকলো সুলেমান; আগন্তুককে দেখে সেলাম করে বললে : রায় সাহেব, কতক্ষণ? রঞ্জন রায় এতক্ষণে কথা বললো প্রথম : এইমাত্তর। তারপর কামিনীর দিকে ফিরে বললো সুলেমান : পেলাম না মেমসাহেব; কাল আসবেন; এনে রেখে দেব।

ভগবানকে অনেকদিন ভুলে গিয়েছিলো মিসেস মেহরা। কতদিন, তার মনে নেই। আজ জেনুইন কৃতজ্ঞতা জানালো ভগবানের উদ্দেশ্যে; রাস্তা না হলে জোড়হাত করেই কৃতজ্ঞতা জানাতো হয়তো।

গ্লোরিয়ার কাছে অরিভুয়া করে রাস্তায় পা দিয়ে যে কথাগুলো কামিনী মেহেরার স্মৃতির পর্দায় প্রতিফলিত হলো চলচ্চিত্রের মতো,—সেই কথাগুলোই একটু সংযোগ বিয়োগ করে ওপরে সাজিয়ে দেওয়া গেল। কামিনী যে দুর্জয় আত্মবিশ্বাসের দম্ভে খেলতে গেছিলো আগুন

নিয়ে তার চেয়েও আস্পর্ধাকর আত্মান্ধ গ্লোরিয়া এখন যাকে নিয়ে খেলাবার চেষ্টায় পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত, সেই রঞ্জন আগুন নেই কেবল আর; আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়ে আছে অনেকদিন। গ্লোরিয়াকেও রঞ্জন কিছুতে যদি এঁটে উঠতে না পারে তাহলে তার চরমাস্ত্র, সেই গোলাপী পানীয় গলার মধ্যে ছুড়ে দিতে দ্বিধা করবে না মুহূর্তকালও। তবে, গ্লোরিয়ার বহ্বাড়ম্বর যেরকম এইমাত্র দেখে এল আজ কামিনী, তাতে গোলাপী পানীয়র প্রয়োজন হবার আছে থোড়াই। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো,—হচ্ছে যথার্থ এবং একমাত্র বাঙলা বাকধারা, কামিনী মেহেরার সেই মুহূর্তে, গ্লোরিয়া রঞ্জনকে নিয়ে যে খেলা খেলতে যাচ্ছে, তার পরিণতি যা হবে বলে মনে হলো, মাতৃভাষায় নয়; বিমাতৃভাষা ইংরেজিতে,—তার।

রঞ্জনকে চেনে না গ্লোরিয়া; কামিনী মেহেরা চিনেছে। নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যে কোনও কার্যই যার সিদ্ধির অযোগ্য বলে মনে হয় না কখনও। আরেকটি ঘর নষ্ট হবে; আরেকটি স্বামী বঞ্চিত হবে স্ত্রীর অধিকার থেকে। আরেকটি সংসারে পাপের বাসা তৈরী হবে দিনে দিনে; তারপর একদিন –। এ পৃথিবীতে হয়তো সেদিন তাতে কারুর এসে যাবে না; বড় জোর সেকথা কারুর কানে গেলে যেশ্ল্যাং তারা বর্ষণ করবে গ্লোরিয়ার উদ্দেশ্যে, তাতে কানে আঙ্গুল দেবার ভাণ করতে হবে আরও শোনার জন্যে উৎসুক শ্রোতাকে। হয়তো গ্লোরিয়ার স্বামীও সেদিন কেবলমাত্র দায়ী করবে গ্লোরিয়াকেই; স্বীকার করতে চাইবে না যে আরম্ভেই যদি শক্ত হাতে রতনলাল মুন্সী নিবারণে সমর্থ হতো এই অশুভের ইনট্রুশান এক সুখী দম্পতীর ব্যক্তিগত নিভৃতে তাহলে কিছুতেই হতে পারতো না সেই ট্রাজেডি যে ট্রাজেডি ঘটতে যাচ্ছে অবধারিত বলে দেখতে পাচ্ছে কামিনী মেহেরা।

হাতে ছিলো মুন্সী ষ্টুডিওতে যাবার অনুমতি কার্ড। সেটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলো কামিনী মেহেরা। মুন্সী ষ্টুডিওতে যাবার প্রয়োজন নেই আর। যে মরতে চায় সে মরবে; তার জন্যে কামিনী মেহেরা বাঁচবে না কেন? কোন দুঃখে।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

রঞ্জন রয়ের ঘরে ছিলো রঞ্জন আর ডালিয়া। ডালিয়ার সঙ্গে রতনের কথা হচ্ছিলো গ্লোরিয়া প্রসঙ্গে। রঞ্জন আশ্বাস দিচ্ছিলো ডালিয়াকে। গ্লোরিয়ার ব্যাপারে তিনি ভিডি ভিসির উজ্জ্বল আশ্বাস। গ্লোরিয়া যে লায়লা-মজনুতে লায়লার ভূমিকায় নামতে রাজি হয়েছে রঞ্জনের নায়িকা হয়ে এসব খবরই ডালিয়া জানতো। তবুও যতখানি উৎসাহিত এবং উত্তেজিত দেখবার আশা করেছিলো রঞ্জন ততখানি উৎসাহিত অথবা উত্তেজিত না দেখতে পেয়ে রঞ্জনের কথার স্রোতেও কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়ে এলো। সে তার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত দিগ্বিজয়ের তুরঙ্গের রাশ টেনে ধরতে বাধ্য হলো। রঞ্জন ডালিয়ার চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন হলো। ডালিয়া নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারছে না; কিন্তু কেন?

রঞ্জন : তুমি কি নিশ্চিন্ত হতে পারছ না?

ডালিয়া : না।

র : কেন?

ডা : কারণ গ্লোরিয়া যত সহজে তোমাকে ধরা দেবার জন্যে এগিয়ে আসছে তত সহজে ধরা দেবার তার কোনও সঙ্গত কারণ নেই—

র : কি রকম?

ডা : স্বামীপুত্র নিয়ে সুখের সংসার ত্যাগ করে অন্য একজনকে দেখা মাত্তর, একথা উপন্যাসে পড়তে মন্দ লাগেনা; কিন্তু জীবনে এমন সচরাচর ঘটে কি?

র : সো হোয়াট? আমার জীবনে বহুবার প্রমাণ পেয়েছি ফ্যাক্টস আ 'স্ট্রেঞ্জা' দ্যান ফিকশান!

ডা : আমার জীবনে এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও প্রমাণ আমি

পাইনি বলেই বোধ হয় তোমার মতো অতো ওভারস্মুয়্য হতে পারছিনা—

র : নো ; ডালিয়া য়ু আ'সিম্পলি লায়িং ; ইটস নট ছ্যাট --

ডা : তবে ?

র : য়ু হ্যাভ সামথিং আপ ইয়া' স্লিভ ; হোয়াটস ইট—

ডা : তোমাকে দেখবার আগেই সে মজেছে আরেক জনকে দেখে : এ সেকেণ্ড ম্যান হ্যাস এরাইভড ইন হা' লাইফ ওলরেডি ; য়ু আ' লেট,-এ বিট ট্যু লেট !

র : বেটা' লেট ছ্যান নেভা ?

ডা : না ; এ সে কেস নয় ; এখানে বেটা লেট ছ্যান নেভা'-সঙ্গত --

র : বেশ ; এখন সেই ভাগ্যবান পুরুষের নামটা বলবে কি ?

ডা : আমি নিজেই এখনও তার নাম জানি না ; তোমাকে কি করে বলবো ?

র : সে ছ্যাট ; তোমার সবটাই অনুমান—

ডা : যদি তাই হয় তাতেও তোমার আশান্বিত হবার নেই কিছু ? সব অনুমান ভ্রান্ত হলে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত সত্য ডিসকভার্ড হয়েছে তাব অর্ধেকের বেশি আনরিয়ালাইজড থেকে যেত –

র : তোমার অনুমান যদি সত্য হয় তাতেও আমার নিরুৎসাহিত হবার কিছুমাত্র কারণ নেই--

ডা : কেন ?

র : বিকস দিস ওয়ার্ল্ড ইজ কোয়ায়েট এ বিগ প্লেস য়ু নো ? দুজনের জায়গা হলে তৃতীয় জনেরও জায়গা হবে –

ডা : না। তা হবে না ; প্রেমের জগৎ বড়ো ছোট—

র : কিছুতেই যদি না হয় তাহলেও হাল ছাড়বো না আমি। তখনও থাকবে আমার লাস্ট ট্রাম্প কার্ড –

র : রয় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে খুলে ফেললো তার ওয়াড্রোব।

সেখান থেকে বের করে আনলো খুব ছোট্ট আঙুলের মাপের চেয়েও ছোট একটা শিশি। তারপর ডালিয়াকে দেখিয়ে বললোঃ এই গোলাপী রং দেখতে পাবে গ্লোরিয়ার চোখেও আর কয়েকদিনের মধ্যে। ডালিয়া জিজ্ঞেস করলোঃ 'মহার্ঘ বস্তুটা কি?' এ হচ্ছে লাভ পোসান; পৃথিবীতে এমন কোনও মেয়ে নেয় যে অস্বীকার করতে পেরেছে এ বস্তু যার অধিকারে, তার প্রভাব! ডালিয়া কি বলতে যাচ্ছিলো; বয় নক করতে দরজায় থেমে গেল।

কোন্ হ্যায়রে বাচ্চ্যু?

মেমসাব—

মেমসাব?

এখন আবার কাকে আসবার জন্যে কথা দিয়েছে রঞ্জন? কিছুতেই ভেবে পেলো না সে; ডালিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলো ডালিয়া হাসছে। তার ভাবখানা হচ্ছে এই যে ডালিয়ার সামনেই সে ধরা পড়ে যাবে যে এটা রঞ্জন নিশ্চয়ই আশা করেনি। এবং নিশ্চয়ই বিস্মৃত হয়েছে অসংখ্য অনুরাগিনীদের মধ্যে কোনও একজনকে আসতে বলেছিলো এই সময়েই; মনে থাকলে ডালিয়াকে যে কোনও ছুতোয় উঠিয়ে দিতো অনেক আগেই। ভাবতে ভাবতে ঘরের মধ্যে ঢুকলো যে সে বাচ্চুর ভাষায় মেয়ে মাত্তরই মেমসাহেবের ভেজাল নয়; সত্যি সত্যি খাঁটি মেম। বিয়ের পর যার নাম হয়েছে গ্লোরিয়া মুন্সী; বিয়ের আগে তার নাম ছিলো গ্লোরিয়া ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্।

গ্লোরিয়া মুন্সী যখন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে রঞ্জনের হাতে তখনও সেই শিশি ধরা; যার ভেতরের তরল পদার্থর আশ্চর্য এক গোলাপী রং। দেখে চোখ ফেরতে পারলো না গ্লোরিয়া বহুক্ষণ।

দুই

ডালিয়া রঞ্জনকে সম্পূর্ণ মিথ্যে কথাই বলেছিলো যখন সে বলেছিলো সবটাই তার অনুমান। গ্লোরিয়ার এই দ্বিতীয় প্রেমের নামধাম ছাড়া সবই সে জানতো। অনুমান করে, হাত দেখে অথবা ঠিকুজি বিচার করে, ডালিয়া যতখানি নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছিলো রঞ্জনকে যে গ্লোরিয়ার পৃথিবীতে তৃতীয় আরেকজনের স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব, অতখানি বলা যায় না; গেলেও, ডালিয়া সেভাবে বলেনি। সে জানতে পেরেছিলো; গ্লোরিয়ার অসুখের সময় ছেলেটিকে সে দুচারবার দেখেছিলো গ্লোরিয়ার খোঁজখবর করতে। কিন্তু তখন অনুমান করতেও পারেনি সে গ্লোরিয়ার জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের ঘটেছে আবির্ভাব। তখন আন্দাজ করতে পারলে গ্লোরিয়াকে রঞ্জনের নাগালের কাছাকাছিও সে আনতো না কোনওদিন। আজ রঞ্জনকে নিবৃত্ত করবার ব্রেকও তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে অনেকখানি। একটা ভয়াবহ ট্রাজেডির দুর্যোগ ঘনঘোর অন্ধকার করে আসছে আকাশ; দেখতে পেয়ে নিজেকে ধিক্কারের পর ধিক্কারে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে ডালিয়া। কিন্তু জীবন তো আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যুর রূপকথা নয়। যে চিচিং ফাঁক বললে সে ঢোকবার এবং বেরুবার পথ করে দেবে আপনা থেকেই। আগুন নিয়ে যে খেলা সে খেলতে গিয়েছিলো তার উত্তাপে মরবে যারা তারাই বেঁচে যাবে আসলে। বেঁচে মরে থাকবে সারাটা জীবন কেবল ডালিয়া। অনুশোচনার তুষের আগুণ ভালো করে জ্বলবেও না; নির্বাপিতও হবে না কোনও কালে।

কিন্তু গ্লোরিয়ার জীবনে এই দ্বিতীয় মানুষকে উপলক্ষ্য করে দেখা দেবে অদ্বিতীয় প্রেম। রতনলাল মুন্সী ডুবে যাবে ছবির পর ছবি করার সৃষ্টির আনন্দে; রঞ্জন রয় তার ধর্ম খুঁজে পাবে হয়তো একদিন চরম অধর্মের মধ্যেই। কিন্তু ডালিয়া পাবে কি? রতনের ওপর

শোধ তুলতে গিয়ে শাস্তি দিলো সে নিজেকে ছাড়া আর কাকে। দিনের পর দিন রতনের জীবন নষ্ট করবার যে বীভৎস স্বপ্নে সে মশগুল ছিলো আজ স্বপ্ন ভঙ্গের মুহূর্তে তারই ছায়া পৈশাচিক মূর্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে উলঙ্গ নৃত্যের ভঙ্গীতে। থেকে থেকেই চমকে ওঠে ডালিয়া। নিদারুণ আতঙ্কে দু চোখের পাতা এক করতে পারে না রাতের পর রাত। কেবলই মনে হয় রতনের বিদেশ যাত্রার দুঃসময়ে মিথ্যে অভিমানে দূরে না থেকে, একবার যদি হাতে তুলে নিতো রতনের হাত তাহলে রতন সেদিন পারতো কি দুপায়ে ঠেলে যেতে। রতন তার প্রতি অন্যায় করেছিলো; কিন্তু গ্লোরিয়া।

আজ গ্লোরিয়ার জীবনে এই দ্বিতীয় পুরুষ যে এসে দাঁড়িয়েছে গ্লোরিয়ার প্রেম যত মহৎই হোক এ অন্যায়; এবং এ অন্যায়ের সাজা যদি গ্লোরিয়া পেত তাহলে গ্লোরিয়ার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তর জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করে দুঃখ পাবার ছিলো না ডালিয়ার। কিন্তু নিজে থেকে যেচে রঞ্জনকে দিয়ে গেছে সে তার শিকারের দিকে এগিয়ে। গ্লোরিয়ার অদ্বিতীয় প্রেমও বাঁচাতে পারবে না রঞ্জনের হাত থেকে গ্লোরিয়াকে। রঞ্জনকে সে জানে; তার হাতে কত নীড় নষ্ট হয়েছে তার সংখ্যা আছে হয়তো; কিন্তু উপায় নেই গণনার। রঞ্জন এবং গ্লোরিয়ার অশুভ সাক্ষাৎকারে একদিন আগুণ জ্বলবে এবং রতনের সংসার জ্বলে যাবে তার আঁচে; রতনের ছেলে দাঁড়াতে পারবে না কোনওদিন মুখ তুলে। গ্লোরিয়া আর রতন, রঞ্জনের বঞ্চনায় ভুল বুঝে পরস্পরকে ডেকে আনবে সেই চরম দুঃখের সুনিশ্চিত আগামী কালকে। বিনিময়ে ডালিয়া কি পাবে যাকে সে হারিয়েছে একদিন অনেক কাল আগে?

তা যদি না পায় তাহলে কিসের জন্যে এই হারজিতের মরণ-বাঁচনের খেলা? নিজেকে বারম্বার জিজ্ঞেস করে ডালিয়া। বারম্বার অস্তিত্বের অতল থেকে সীমাহীন অন্ধকার থেকে উঠে আসে অদৃষ্টের অট্টহাসি। যেদিন ডায়মাণ্ড স্লিপার ক্লাবে গ্লোরিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো রঞ্জনের সেদিন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার নিদারুণ

সুযোগ সৃষ্টির শুভমুহূর্ত উৎসব সঙ্ঘটিত হওয়ায় ভয়ঙ্কর উৎফুল্ল হয়েছিলো। রতনের মুখ কালো করবার আনন্দে আলো হয়ে গিয়েছিলো মাৎসর্যের আঁধার। আর আজ? আজ সেই আলো দেখা দিয়েছে আলেয়া হয়ে। যে মরীচিকায় বুকফাটা তৃষ্ণার জল মিলবে বলে দৌড়ে গিয়েছিলো সেখানে আজ নিজের জালে নিজে জড়িয়ে চলচ্ছক্তিরহিত ডালিয়া; পেছবার কিম্বা এগুবার এক পা-ও আর উপায় রাখেনি সে।

ভাবতে ভাবতে উত্তপ্ত হয় মস্তিষ্ক। বেড সুইচ টিপে দেয়। অন্ধকার ঘরের ন্যাংটো দেয়ালে হেসে ওঠে হা হা করে উৎকট আলো; আর হাহাকার করে ওঠে ডালিয়া। অসহ্য হয় আলোর অনাবরণ। নিভিয়ে দেয়। ঘর ভরে যায় ফিসফিস রহস্যময় অস্ফুট কথায়। দেয়ালে দেয়ালে ছায়ার পিশাচেরা সুরু করে দেয় মৃত্যুর অভিসারে আতঙ্কের নৃত্য। আবার আলো জ্বেলে দেয় ডালিয়া। চোখ বন্ধ করে থাকে ভয়ে। অনেক্ষণ, অনেক্ষণ বাদে চোখ খোলে। না। এতক্ষণে চলে গেছে ছায়ামারীচেরা। বুকভরে নিঃশ্বাস নেয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস; শান্তির। চোখে মুখে জল দেয়। কি মিথ্যে ভয়ই সে পেয়েছিলো মনে করে লজ্জা পায় একলা ঘরে। উঠে দাঁড়ায়! টেবলের ওপর রাখা হাতঘড়িতে দেখে রাত শেষ হতে আরও তিনঘণ্টা। বিছানায় শুতে গিয়ে চোখ যায় সিলিংএর দিকে। চীৎকার করে ওঠে প্রাণপণে: ওকি? ওকি? ওকি? সিলিং ঝোলানো শিকেটা দুলছে। শিকেয় নেই কিছু। শূন্য সিকের ফাঁসটা নেমে আসছে নীচে। চোখ ঢেকে ফেলে ডালিয়া। চোখ মেলে একটু পরে।

গলার একটু ওপরে দুলছে সিকের ফাঁসটা; কেবল দুলছেই।

তিন

সেদিন রঞ্জন যখন তার নারীমেধ-কারণে পাশুপাত অস্ত্র সেই গোলাপী রংয়ের তরল পানীয়র শিশি হাতে দাঁড়িয়ে এবং সেই ঘরে

ডালিয়া উপবিষ্ট, তখন গ্লোরিয়ার সেই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত প্রবেশ রঙ্গমঞ্চে যেমন সে বুঝতে পারেনি তেমনই হতবাক হয়েছিলো সে একটু পরেই যেমন ঝড়ের মত এসেছিলো রতনের ব্রিটিশ বউ তেমনই ঝড়ের মত নিষ্ক্রান্ত হলো যখন। কেন এল সে রঞ্জনের ওখানে এবং কেন গেল কিছুই বোঝা গেল না। গ্লোরিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে ডালিয়া এবং রঞ্জন দুজনকে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত দেখে নিজে আসলে যতটা তার চেয়েও বেশি সপ্রতিভ হবার মারাত্মক চেষ্টায় উদ্যত হয়ে বললো: আসা অন্যায় হয়েছে না কি? আয়াম সো সরি দেন—। ডালিয়া উঠে গ্লোরিয়াকে জড়িয়ে ধরলো পুরানো দিনের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে: তুমি অন্যায় করতে জানো না কি? ততক্ষণে রঞ্জন তার ফর্মে এসে গেছে: আপনি যদি এসব কথা বলবার জন্যেই এসে থাকেন তাহলে বোথ অভ আস উইল বি সরিয়া' ষ্টিল; আমরা দুজনেই নিদারুণ দুঃখিত হব গ্লোরিয়া।

গ্লোরিয়া: আপনি নাকি ডায়মাণ্ড স্লিপারের ডায়মাণ্ড হতে চলেছেন এ বছর? মিস্টার রয়? য়্যাম সো হ্যাপী টু হিয়া' বাউট ইট, য়ু নো?

থতমত খেয়ে গেল রঞ্জন; ডালিয়াও। ডালিয়ার মুখে ম্যাক্স-ফ্যাক্টর বিট্রে করল না অবশ্য; কিন্তু রঞ্জনের মুখ থেকে রৌদ্রালোক মুহূর্তের জন্যে অন্তর্হিত হয়ে দেখা দিলো মেঘের ছায়া। মনের দুহাত দিয়ে মুখের ওপর থেকে মেঘের ছায়া মোছবার জন্যে বাইরেও দুহাত দিয়ে মুখের ওপর যা পড়েনি তা ঝেড়ে ফেলবার জন্যে বারম্বার ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখে গ্লোরিয়াকে চোখের মণিতে হাসতে দেখে আরও নার্ভাস আরও বিচলিত হয়ে কি বলবে ভেবে না পেয়ে থামা দেবার কারণে যেকথা বললো; সেকথায় যেকথা চাপা পড়বার তা আরও চাগিয়ে ওঠবার যে তা খেয়াল করবার মতো প্রকৃতিস্থতা উদ্বৃত্ত থাকলে কিছুতেই সেকথা বলতো না যেকথা বলে ফেলল রঞ্জন: হাও কুড য়ু নো? আপনাকে কে বললো?

গ্লোরিয়া: ট্রাই টু গেস ইট—

রঞ্জন মাথা ঝাঁকাতে না'-এর ভঙ্গীতে; ডালিয়া বললোঃ ডোলারেস ডেল রিও—

গ্লোরিয়া সেকেণ্ড করলো ডালিয়ার প্রস্তাবঃ ইয়েস; কামিনী মেহরা ছাড়া আর আমার এমন বন্ধু কে আছে?

রঞ্জনঃ আপনার তো বটেই; আমারও যে এমন বন্ধু আছে জানতাম না—

গ্লোরিয়াঃ বন্ধু চেনা বড়ো শক্ত যে।

রঞ্জনঃ আপনি কি এইসব কথা আমাকে শোনাবার জন্যেই আজ এসেছেন?

গ্লোরিয়াঃ না।

রঞ্জনঃ তবে?

গ্লোরিয়াঃ জানতে এসেছি হোয়েন আ'য়ু স্টার্টিং ইয়া' ওল্‌ড গেম? বলতে বাধা না থাকে যদি অবশ্য; এণ্ড ইফ আয়াম নট ট্যু ইনকুসিটিভ অফ কোর্স—

রতন অনেকক্ষণ মার খাচ্ছিলো। অসম প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে প্রত্যেক রাউণ্ডে মার খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে এক সময়ে সেও যেমন এক সময়ে অন্তত একবার চেষ্টা করে রি-পেমেণ্টের তেমনই এবারে আর হজম করল না নিঃশব্দে; উগরোলো তৎক্ষণাৎঃ ইচ্ছে তো করে এখনই সুরু করে দিই আপনার আরাধনা; কিন্তু—

গ্লোঃ কিন্তু কি?

রঃ সাহস হয় না--

গ্লোঃ কেন?

রঃ আপনি এদেশের মেয়ে হলে জানতেন যে বিজয়ার দেখা সাক্ষাৎ সন্ধ্যে না হলে সুরু হয় না -

গ্লোঃ আপনি এদেশের ছেলে হয়েও একটা জিনিষ জানেন না দেখছি—

রঃ সেটা কি?

গ্লো ঃ আপনি জানেন না যে সব দেশেই সেয়ানে-সেয়ানে সাক্ষাতের কোনও দিনক্ষণ নেই !

ডা ঃ দাস ফার এণ্ড নো ফার্দার প্লিস—

রঞ্জন রয় এবং ডালিয়া কেউ প্লেস করতে পারলো না গ্লোরিয়াকে কিছুতেই। ডালিয়া যে গ্লোরিয়া আসবার আগে রতনকে প্রিভেনশন ইস বেটা ত্থান কিও' বলে উচ্চারণ করেছিলো সতর্কবাণী,—সে-ও স্টান্‌ড্‌ হয়ে বসে রইলো বহুক্ষণ; গ্লোরিয়া চলে যাবার পরেও বসে রইলো বিনা বাক্যব্যয়ে। গ্লোরিয়া কি জেনুইনলি রঞ্জনকে প্রথম দেখাতেই মজেছে; না,—সে রঞ্জনকে জানাতে এসেছিলো, সব মেয়েই সমান নয়; কে জানে! রঞ্জনও সময় নিলো দীর্ঘকাল সব ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত অনুধাবন করতে। বাচ্চারা যেমন ওয়ার্ডপাজল্ সল্‌ভ করবার জন্যে সমস্ত শব্দগুলো ঢেলে সাজে তেমনই গ্লোরিয়ার প্রত্যেকটি কথা মনের মধ্যে উবুড় করে ফেলে উদ্ধার করতে বসলো; যদি পেয়ে যায় এই হিউম্যান পাজলের সলুসান।

গ্লোরিয়া কেবল যেমন উদয় হয়েছিলো পাহাড়ের আড়াল থেকে পূর্ণচন্দ্রের মতো আচম্বিতে তেমনই ড্যাংড্যাং করতে করতে দিনের আলো এসে পৌঁছবার আগেই মেঘের ওড়নায় মুখ ঢাকে। যতক্ষণ ছিলো ততক্ষণ মিউঁ মিউঁ করা বেড়াল যেমন ঘরের মধ্যে চুপ করে যায়, রাস্তায় ঘেউ ঘেউ শুনলে, তেমনই রঞ্জন আর ডালিয়া দুজনেই চুপ করে গেল গ্লোরিয়ার আবির্ভাব এবং তিরোভাবের পরও কেন সেকথার উত্তর ওরা একজনও জানলো না। রঞ্জন রয় ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করলো যে ওষুধে ইতোমধ্যেই কাজ দিয়েছে। ওই, তরল গোলাপী, বহু যুদ্ধে তাকে জয়ী করেছে; জীবনের প্রাইজ-ফাইটেও দিগ্বিজয়ী করবে ওই তরল গোলাপী আগুনই।

রঞ্জন তাই ভেবে আনন্দ পেল। ডালিয়া ভাবলো গ্লোরিয়া সম্পর্কে সে যার কথা শুনেছে ইতোপূর্বেই অথচ যার নাম শোনে নি আজও; সেই দ্বিতীয় প্রেম বোধ হয় আসলে মিথ্; সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু সেই যার কথা কাণে এসেছিলো ডালিয়ার, তবু আসেনি,—

রতনলাল-গ্লোরিয়া-রঞ্জন-ডালিয়া নাট্যে সত্য যদি কিছু থাকে তবে তা ওই গ্লোরিয়া মুন্সীর দ্বিতীয় প্রেম। না। গ্লোরিয়ার জীবনের অদ্বিতীয় প্রেম। সে না হলে এ দুর্ঘটনা অসম্ভব হতো; সে ঘটনা এই চারজনকে কাছে টেনেছে; অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেঁধেছে এক সূতোয়। কিন্তু সূতো জোড়াবার এবং ছেঁড়বার মুহূর্তেও সে থেকে গেছে নেপথ্যে। এই মামলায় অনেক আনইমপর্টান্ট সাক্ষীর তলব পড়েছে আদালতে; পড়েনি কেবল মূল গায়েন, রতনলালের সহকারী সন্দীপ মুখার্জির। আদালত তার কথা জানতে পারেনি। না জানবারই কথা; সন্দীপ মুখার্জিই কি জেনেছে আজ পর্যন্ত যে এই হত্যাকাণ্ডের না জেনে সে-ই হতে বাধ্য হয়েছে একমাত্র নায়ক?

চার

রতনলাল মামলার নেপথ্যে সন্দীপ মুখার্জিকে কুড়িয়ে না পেলে একাহিনী আমার কলমের মুখে যথেষ্ট কালি থাকা সত্ত্বেও লেখা হতো না কোনও দিন। তাহলে এবস্তু সাময়িক যত ঝড়ই তুলে থাক চায়ের কাপে সেদিন, ঝড় থেমে যেত অচিরেই। বিখ্যাত মামলার বিষয় হতো ম্যাক্সিমাম; পুলিশের রিপোর্ট হতো; সাহিত্যের হতো না উপাদান কিছুতেই। রতনলাল-মামলায় যা ঘটেছে তা হয়ত পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যখনই দুর্ঘটেছে তখনই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে সারা দুনিয়ার; টেলিপ্রিণ্টারের লাউডস্পীকারে তার বিবরণ বিঘোষিত হবার অপেক্ষায় থেকেছে আবালবৃদ্ধবণিতার কাণ। তবুও তা বারম্বার পুনরাবৃত্তির অমহিমায় পুরোণো হয়ে পচে বাসি হয়েছে। এও জানি যে আবার, আরেকবার তা অনূদিত হলে লাল পড়বে কুৎসা শুনতে উদগ্রীব জিহ্বা দিয়ে, তবুও। তবুও সমস্ত উত্তেজনা, রহস্য, কুৎসা, লালসা, ঈর্ষা, এবং ক্রূরতা সত্ত্বেও তা যারা শুনতে চায় অথবা শোনাতে চায় তারা যথাক্রমে সেক্সস্টার্ভড পাঠক এবং ইয়েলো পত্রিকার Sex-peer-রা ছাড়া আর কে। পরের ঘর ভাঙ্গার কেচ্ছায়

সবচেয়ে উৎসাহ যাদের তারা জানে না যে তাদের বাস কাচের ঘরে; জানলে অবশ্য এই জাতীয় কাহিনী এত জনপ্রিয় হতো কি না, এর কাহিনীকার হতো কি না বেস্টসেলারের জনক বলা শক্ত। কিন্তু সে সব আপাততঃ শিকেয় তোলা থাক; তার বদলে তাক থেকে পাড়া যাক, এতক্ষণ পর্যন্ত আনকোরা যে চরিত্রটির দ্বারোদ্ঘাটন করতে যাচ্ছি এবার সেই সন্দীপ মুখার্জির।

রতনলালের মামলা চলাকালীন আমি যখন ক্ষ্যাপার মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি রহস্য সমাধানের পরশপাথর সেই সময়ে কার কথায় এখন মনে নেই আর আমার একটা ব্যাপার খুব পিকুল্যার লাগলো। রঞ্জনের অতীত জানবার পরেও তার সঙ্গে যে রকম প্রায় ওপনলি ঢলাঢলি করেছে গ্লোরিয়া তাতে গ্লোরিয়ার মুখে থুতু ছাড়া আর কিছুই দিতে অপ্রস্তুত ছিলো, যারা তারাও বলবে না। এমন কি রতনও, গ্লোরিয়াকে অভিযুক্ত করে বলেনি একটি কথাও। সে কেবল উত্তেজিত হয়ে গেছে রঞ্জনের ওখানে; এবং উত্তেজনার মাথাতেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে টিপে দিয়েছে পিস্তলের ঘোড়া রঞ্জন রয়ের বুক লক্ষ্য করে। কিন্তু রঞ্জনের সঙ্গে নোংরামো করাই যদি গ্লোরিয়ার উদ্দেশ্য হতো, তাহলে সে তা গোপনে করত। সে একা কেন; দুজনেই। কিন্তু গ্লোরিয়া যেভাবে রঞ্জনের সঙ্গে ঘুরেছে তাতে অনেক আগেই কেন রতন তাকে হত্যা অথবা আঘাত করতে উদ্যত হয়নি এই একমাত্র অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারত। গ্লোরিয়া যদি বা উন্মত্ত বাসনায় এমন সাঙ্ঘাতিক রিসকি কাণ্ড করতে উদ্যতও হয়ে থাকে রঞ্জন কেন তাতে রাজি হবে। গ্লোরিয়াকে কেন, যাদের সঙ্গে চিরকাল আগুন নিয়ে খেলা খেলেছে, তাদের কাউকেই বিবাহ করবার কনামাত্র সদিচ্ছা তার মনের কোনও অন্ধকারতম কোণেও, মুহূর্তের জন্যে নিঃশ্বাস নিতে মাছ যেমন জল থেকে মাথা তোলে, দেখা দিয়েছিল, একথা রঞ্জন রয় বেঁচে থেকে মহামান্য আদালতে শপথ করে বললেও, বিশ্বাসের বাইরে থাকত তা তাদের কাছে যারা রঞ্জনকে একদিনের জন্যে, একঘণ্টার জন্যেও মিট করে থাকে কোনও উপলক্ষ্যে।

তাহলে? এই জ্বলন্ত জিজ্ঞাসার সামনে গ্লোরিয়াকে জেরা করেছি আমি দিনের পর দিন। রতন তখনও পুলিশের হেফাজতে: রঞ্জন রয় লোং ডেড। ডালিয়া হাফ-সেন হাফ-ইনসেন। একমাত্র গ্লোরিয়াকেই পেয়েছিলাম হাতের কাছে। জানি; জানি একটু বেশি ক্রুয়েল, প্রায় ইনহুম্যান ব্যবহারই করেছিলাম সেই বিদেশিনীর সঙ্গে; যার স্বামী পুলিশ নজরে এবং যার জন্যে নিহত আরেকজন যুবক। গ্লোরিয়ার সঙ্গে আমার এমন অন্তরঙ্গতা হবার সুযোগ হয়নি যাতে ঘনিষ্ঠ হতে পারি এতটা। কিন্তু পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতাই আমার সাঙ্ঘাতিক সহায় হলো। অর্থাৎ সে সময় এই মামলার সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে সবচে সলিটারি পার্সন ছিলো গ্লোরিয়াই। রতনের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব পরিত্যক্ত নির্জন পুরীতে নির্বাসিত রাজকন্যার মতো গ্লোরিয়ার বিনিদ্র কাটে রাত, নিসঙ্গ দিন কাটে। রতনের বন্ধু হিসেবে উপস্থিত হবার দাবীর সামনে তার মনের অসবরণ না হবার চেষ্টা বন্যার মুখে খড়-কুটোর চেয়েও দ্রুত ভেসে, তলিয়ে, হারিয়ে গেল কোথায় কে বলবে। এই সময়েই একদিন আবার আমি সেই পুট করেছি আমার সেই একমাত্র জিজ্ঞাসা: রঞ্জনের জন্যে তুমি এত বড় সবনাশ কেন করলে নিজের? রঞ্জনের সব জানবার পরেও এ দুর্মতি তোমার হলো কেন?

আর পারলো না গ্লোরিয়া। টেবলের ওপর মুখ নীচু করে ছিলো; তাই দেখতে পাইনি। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে গ্লোরিয়া; দেখে উঠে পড়তে যাচ্ছিলাম। আর নয়; ইনাফ। মেয়েদের কান্না আমার সহ্যের অতিরিক্ত। অনুতপ্ত হলাম; টর্চার আর না করবার নির্দেশ পেলাম তখন অবশিষ্ট কনসায়ান্সের কাছ থেকে। উঠে পড়লে অবশ্য ক্ষতিই হতো। যা জানাবার, যার জন্যে দিনের পর দিন অত্যাচার করেছি এবং নিপীড়িত হয়েছি সেই প্রশ্নের উত্তরে নৌকাডুবি স্রোত তীরের কাছে এসে। কান্নায় ভেঙ্গেপড়া গলায় গ্লোরিয়া হঠাৎ বললো: ইট ওয়াস নট রঞ্জন; ইট ওয়াস নট হি –

তবে?— তাকালাম অশ্রুজলে ভরা গ্লোরিয়ার বড় বড় দুটো চোখের

আয়নায়। সেখানে যার ছবি সেদিন সহসা আবির্ভূত হলো তারই নাম : সন্দাপ মুখার্জি। গ্লোরিয়াই আদ্যন্ত এই সন্দীপ-বৃত্তান্ত আমাকে অবগত করায় শেষ পর্যন্ত। সে আমাকে যেভাবে বলেছিলো এখানে আমি সেইভাবেই সাজিয়ে দেবার আগে আবার স্মরণ করিয়ে দিই যে এই সন্দীপ মুখার্জিব নাম মামলায় শোনা যায়নি; তার সম্বন্ধে কাগজের গসিপরাইটারের কলমেও লেখা হয়নি এক লাইনও। রঞ্জন রয় ভেবেছে তার মহাস্ত্রেই নিহত হয়েছে গ্লোরিয়ার হৃদয়পক্ষীর চক্ষু; ডালিয়া ভেবে পায়নি গ্লোরিয়ার সব জেনেও রঞ্জনকে নিয়ে এভাবে দৃষ্টিকটুভাবে নিজেকে নির্যাতনের সম্মুখীন করার। রতনলাল মুন্সী জেনেছে সব নষ্টের মূলে রঞ্জন রয়।

সন্দীপ মুখার্জিও জেনেছে যে গ্লোরিয়া তাদেরই একজন যারা পোষাকের মতোই প্রেমিকও পালটায় এবেলা ওবেলা। সেও জানতে পারেনি, সম্ভবত আজও পর্যন্ত জানে না যে গ্লোরিয়ার দ্বিতীয়, অদ্বিতীয় প্রেমের নায়ক সে-ই। লোকে জেনেছে মামলার রিপোর্ট থেকে যতটুকু জানবার। তাই তারা বলেছে ঘরে বাইরে; চায়ের দোকানে; অফিসে যে রঞ্জনের সঙ্গে গ্লোরিয়াকেও গুলি মারা উচিত ছিলো রতনের। কিন্তু আমি জানি। আমি জানি যে এই ট্রাজেডি যার নির্দেশে মাঝে মাঝে ঘটে তার নাম নেমেসিস। তার হাত থেকে রক্ষা পায়নি যে তাকে নিন্দে করা সহজ কিন্তু তার নিরুপায়তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। উপলব্ধি করার দুর্ভাগ্য হলে আবার গ্লোরিয়াকে ক্ষমা না করা অসম্ভব।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

মুন্সী ফিল্‌ম স্টুডিওতে গ্লোরিয়া এসেছিলো বাড়িতে একা একা সারাদিন কাটাতে না পেরে আর। ভারতবর্ষে বিবাহের আগে অল্প যে কয়েকদিন মাত্র থাকতে পেয়েছিলো সেকদিনের আশ্চর্য অনুভূতি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো নিজের দেশে। বিবাহের পর ভারতবর্ষের মাটিতে দ্বিতীয়বার স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধবার জন্যে এসে ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে, এক্সপার্টরা যেমন বিখ্যাত কোনও শিল্পীর আঁকা ছবিখানা অরিজিনল কিনা বলবার জন্যে চোখের কষ্টিপাথরে বারবার ঘষে ঘষে দেখে। তাই নিয়ে পরমানন্দে কেটেছে পুরীর সমুদ্রের সূর্যাস্ত আর টাইগার হিলের ওপর থেকে সূর্যোদয় দেখে। দুচোখ ভরে দেখেছে কাশীর গঙ্গায় নৌকা করে যেতে যেতে এই ভারতবর্ষের অপরূপ। নিজের দেশে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যা পড়েছে আর যা শুনেছে এতকাল তা যে কতদূর মিথ্যে তাই জেনেছে দিনের পর দিন। গ্লোরিয়া লিখতে না জানার দুঃখ সেই একবার বোধহয় অনুভব করেছে। লিখতে জানলে সে লিখতো সেই ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত যে ইতিহাস সাহেবের লেখা ইণ্ডিয়ান হিস্টরিতে নেই; সে ইতিহাস বিদেশীদের বিবরণ থেকে এতদূরে যতদূরে নয় গ্লোরিয়ার পৈতৃক আবাস গ্লোরিয়ার স্বামীগৃহ থেকে। সে ইতিহাস পুঁথির পাতায় চোখ খুইয়ে ফেললেও পাওয়া অসম্ভব। যে ইতিহাস পথের পুঁথিতে পায়ের অক্ষরে লেখা সে ইতিহাস কপাটবন্ধ ঘরের নীল আলোতে নিশ্চিন্ত আরামে বসে মুখস্ত করা সম্ভব নয়। সেই ইতিহাস যা পড়তে ঘরছেড়ে পথে বেরুতে হয়, পথ ছেড়ে বিপথে। সেই ইতিহাস যা অতীতের রোমন্থন নয়; প্রতিমুহূর্তের জীবনসংগ্রামে রক্তের লাল কালিতে সে ইতিহাস লেখা হচ্ছে। রৌদ্রে, জলে, শীতে, আশ্রয় আর অন্নের জন্যে, অনাবৃষ্টি ঝড় অতিবৃষ্টির উভয় আশঙ্কায় কম্পমান যে সাতলাখ গ্রামে গাঁথা ভারতের

তেত্রিশ কোটি মানুষ—তার ইতিহাস লিখতে পারলে তবেই গ্লোরিয়া ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত লিখতো।

গ্লোরিয়া যদি লিখতে পারত তাহলে সে নিশ্চয়ই একথা স্পষ্ট করে একবার নয়, বারবার লিখতো যে আসল ভারতবর্ষ পূর্ণিমার রাতে তাজমহলের শ্বেতপাথরে প্রতিবিম্বিত নয়; কাশীর ঘাট থেকে ঘাটে, যমুনা থেকে অসি, গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী সেখানকার দুচোখভরে তৃষ্ণা নিবারণের মনোরম সন্ধ্যায় অঙ্কিত নয় আসল ভারতের প্রোফিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার চূড়া প্রথম সূর্যের আলোর মুকুট পরলে ঘুমথেকে বাদিকে ওপরে টাইগার হিলে উঠে তা প্রত্যক্ষ করা আর পুরীর সমুদ্র-তীরে দিবসের শ্মশানে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার আগে শেষবারের মতো জ্বলে ওঠা জবাকুসুম সঙ্কাশ দিবাকরকে অবলোকন,—এ দুই-ই অপরূপ; তবু আসল ভারতের এই নয় একমাত্র রূপ। কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, করাচীতে যারা সকাল বেলায় ব্রেকফাষ্ট, দুপুরে লাঞ্চ, এবং রাত্রে ডিনার করে; যারা সাহেবদের 'সার' এবং স্বদেশীয়কে ব্লাডি সোয়াইন ছাড়া কথা বলে না; যাদের বাবারা পাবলিকের অস্পৃশ্য ছোঁয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে নিজের ছেলেদের পাবলিক স্কুলে দেয়; যারা, বেয়ারা তাদের সায়েব না ডাকলে সাড়া দেয় না, লোকে মিস্টার না লিখলে চিঠি পড়ে না এবং যাদের গৃহিণীরা সবাই মেমসায়েব এবং ছেলে-মেয়েদের বাবা-মিসিবাবাই হচ্ছে একমাত্র ডাকনাম দাস-মহলে, সেই তারা ভারতবর্ষে জন্মালেও ভরেতবর্ষের তারা কেউ নয়।

ভারতবর্ষ হচ্ছে সেই সাতলাখ গ্রাম, সেখানে:

.. 'It was the peasant, terribly emaciated, with nothing to cover his nakedness but a rag round his middle the colour of the sun-baked earth he tilled, the peasant shivering in the cold of dawn, sweating in the heat of noon, working still as the sun set red over the parched fields, the starveling peasant toiling without cease in the north, in the south, in the east,

in the west, toiling all over the vastness of India, toiling as he had toiled from father to son back, back for three thousand years when the Aryans had first descended upon the country, toiling for a scant subsistence, his only hope to keep body and soul together.'.......

গ্লোরিয়া লিখতে জানলেও লিখত না; কারণ এদের কথা এদের একজন হয়ে না জানলে লেখা অসম্ভব। গ্লোরিয়া বিদেশিনী বলে নয়; ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভারতবাসীর লেখা পড়ে দেখেছে; সেও বিদেশীর চোখে স্বদেশকে দেখার মিথ্যে কাহিনী। সে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে কি লাভ?

ভারতবর্ষের সেই বৈচিত্র্যও এক সময়ে গ্লোরিয়ার চোখে তার জৌলুষ হারালো এবং তখনই গিয়ে ঢুকলো মুন্সী ফিল্ম স্টুডিওতে। ঢুকতে একরকম বাধ্য হলো। বাড়িতে সমস্ত দিনটা, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হাহা করে; আর হাহাকার করে ওঠে গ্লোরিয়ার সঙ্গকাতর হৃদয়। রতন বাড়ি ফেরে অনেক রাতে। মোর ডেড দ্যান এলাইভ রতনলাল মুন্সী। বিছানায় গা এবং বালিশে মাথা দিতে না দিতে ঘুম। রতনকে যখন প্রথম দার্জিলিংএর পাহাড় থেকে বেলাগাম তুরঙ্গপৃষ্ঠে মৃত্যুর মুখোমুখি গ্লোরিয়া মিট করে তখনও তার মধ্যে আজকের গ্লোরিয়ার আবির্ভাব হয়নি; নিজের দেশে এই ভিন্ দেশের যুবকের গলায় বরমাল্যের অঙ্গীকার করে যেদিন, সেদিনও নয়। আজ ভালবাসায় চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গে যখন উছলে পড়ছে যৌবনের আলো তখন দেখা নেই কেন সেই বন্ধুর? যে কেবল মৃত্যুর কৃষ্ণবর্ণ দস্তানার জবরদস্ত মুঠো থেকে একদা উদ্ধারকারী নয়; নয় শুধু স্বামী অথবা সন্তানের পিতা। যে তার সখাও। বিজন ঘরে নিশীথরাতে সে যদি শুধু শূন্যহাতেও আসতো তাহলেও গ্লোরিয়া গাইতো: জানি বন্ধু জানি তোমার আছে তো হাতখানি। কিন্তু সেই শূন্য হাতও বাড়িয়ে দিলো না রতন; কাজের জন্যেই কেবল

প্রস্তুত সেহাত রতনের টেনে নিলো আস্তে আস্তে মুন্সী ফিল্‌ম স্টুডিও।

সব দেশেই পুরুষেরা যে ভুল করে, যে ভুল করেছে সব কালে, রতনলাল মুন্সীও সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করলো। কাজ নিয়ে মেতে গেল এমন অন্ধের মতো যে ঘরের রমণীরও যে কিছু দাবী আছে তার ওপর সেবার্তা বিস্মৃত হলো মুন্সী ফিল্‌ম স্টুডিও খোলবার পর অচিরেই। পুরুষের কাজ থাকে, বাইরের জগৎ থাকে, জীবনভোর থাকে আরও অর্থ, আরও সামর্থ্য, আরও, আরও, আরোও-র আলেয়ায় পথভুলে মরার দুরন্ত নেশা। সেই নেশা ভাঙ্গলে, আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, লিখে চিরস্মরণীয় হতে পারে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পের ক্ষেত্রে অর্জুন না হতে পারার জন্যে কর্ণের সাফল্যের চেয়ে অনেক নাটকীয় ব্যর্থতার ইতিহাসে। কিন্তু তাতে তার স্ত্রীর কি সান্ত্বনা। স্বামীর গৌরবেই স্ত্রীর গৌরব , পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, –এগর্ব সম্বল করে মরা যায়; কিন্তু বাঁচা যায় না। বাঁচবার জন্যে কেবল স্বামীর খ্যাতি, বংশের পরিচয়, অথবা অর্থের আর সামর্থ্যের সমারোহ সব নয়। তার জন্যে প্রয়োজন হয় স্বামীর বন্ধুত্ব; সখার প্রেম। স্ত্রীর চোখের দর্পণে যে তার মনের সূর্য তারা দেখতে না পায় সে কেবল স্ত্রীর র‍্যাশান কার্ডে নেম অভ হাসব্যাণ্ডের খাতে পাদপূরক মাত্র; স্ত্রীর অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় কিছুতেই।

দুই

গ্লোরিয়া বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই দেখলো এই বিপুল বিশ্ব-সংসারে সে একবারে একা। বাচ্চা মানুষ হয় আয়ার হাতে; রান্নাঘরে বাবুর্চি এবং ঘরের কাজে বেয়ারা একাধিক হবার ফলে গ্লোরিয়াকে প্রায় কিছুই করতে হয় না। এই অবস্থাতেই সে মুন্সী ফিল্‌ম্ স্টুডিওতে আসাযাওয়া আরম্ভ করে দিলো রতনের লাঞ্চ বাড়ি থেকে গাড়ি করে

স্টুডিওতে পৌঁছনকে উপলক্ষ্য করে। তারপর আস্তে আস্তে মজে গেল ততটা রতনের নয় যতটা মুন্সী ফিল্ম্ স্টুডিওর রক্ষণা-বেক্ষণে; সারাক্ষণ কোনও না কোনও কাজের মধ্যে নিজেকে ভুলতে না পারলে পাগল হয়ে যাওয়া মোটেই বিচিত্র ছিলো না তার পক্ষে। রতনের স্টুডিওতে ঢুকে সে সবই ঠিক মতো চলতেই দেখতে পেত যদি না সন্দীপ তার দুচোখ খুলে দিতো আস্তে আস্তে। রতনের সহকারী সন্দীপ হচ্ছে সমস্ত স্টুডিওর প্রাণ। রতন যখন ছবি তুলছে তখন সন্দীপ তাকে সাহায্য করছে। রতন যখন ছবি তুলছে না তখনও রতনকে অনুপ্রাণিত করছে সে একা। ভেঙ্গে পড়ছে যখন রতন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে তার নিজের কি হচ্ছে তুলছে যখন এপ্রশ্ন তখনও সন্দীপই তাকে নতুন করে চাগাচ্ছে; বলছেঃ ঘরের খেয়ে বনের মোষ একজন তাড়াচ্ছে বলেই এতগুলো লোকের ঘরে অন্ন উঠছে। আজকে রতন একা; কিন্তু যেদিন এই ফিল্ম্ ইণ্ডাস্ট্রী বড় হবে, বিপুল বিত্তশালী হবে ব্যবসা হিসেবে, সেদিন এর অগ্রদূত হিসেবে কাকে তারা স্মরণ করবে, রতনলাল মুন্সীকে ছাড়া [সন্দীপ মনে মনে জানে অবশ্য যে সেই বহুদূর ভবিষ্যৎকালে আর যারই নাম স্মরণ করুক, ভুলেও যে মনে করতে পারবে রতনলাল মুন্সীর মুখ, সে আর যাই হোক বাঙালী হবে না কোনও দিন]।

কিন্তু কেবল উৎসাহে চিড়ে ভেজে না। সন্দীপ একা কিছুতেই সব দিক সামলাতে পারছিলো না; আর একজনও যদি তার অর্দ্ধেক আন্তরিকতা নিয়েও এসে দাঁড়াতো রতনের পাশে তাহলে মাঝে মাঝে যে দারুণ দুশ্চিন্তার, নিদারুণ সমস্যার মেঘ আঁধার করে আসে ফিল্ম্ স্টুডিওর আকাশে তা ঘটতে পেত না। সমস্ত লোকগুলো ফাঁক পেলেই ফাঁকি দেবে। প্রোডাকশনে চুরি; ফুডিংএ চুরি, খুচরো আর্টিস্টদের পেমেন্টে চুরি, কস্টুম ও ফার্নিচার আগের আগের ছবির যেগুলি নতুন ছবিতে ব্যবহার করবার কারণে গোডাউনে থাকার কথা, সেগুলি কোথায় হাওয়া হয়ে যায় তাদের ডাক পড়বার আগেই। অথচ সন্দীপ যদি কেবল এই নিয়ে থাকে তাহলে অন্যদিকে, রতনের খোদ

ছবি করার ব্যাপারেই সমস্যা জাগে। এবং এমন সমস্যা যাতে স্টুডিওর দরজা প্রায় বন্ধ হয়ে থাকার জোগাড় হয়। অন্য সহকারীকে পান্ত আনতে বললে সে এসে জানায় নুন ফুরিয়েছে আর এমন টেম্পার লুস করে রতন যে সে খবর শোনবার পরও যদি সন্দীপ প্রোডাকশনের চুরির পথ আগলে বসে থাকে তাহলে আসল ছবি এমন মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে তাকে অক্সিজেন না দেওয়া তক, পাহারাদারি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

ঠিক সেই সময়ে গ্লোরিয়া এসে উপস্থিত হয় মুন্সী ফিল্‌ম্ স্টুডিওর দরজায়। প্রথমটায় সানন্দ শুভাগমনের কর যে গোটা ষ্টুডিওতে একা শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়নি সে হচ্ছে সন্দীপ মুখার্জি। বরং মনে মনে সে আরও আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়লো। এতদিনে এক মনিবে যদি বা চলছিলো এবার ষ্টুডিওর গেট সত্যি সত্যি না বন্ধ হয়। রতনের ওপর আর কোনও প্রভাব, আর কারুর প্রভাব কাজ না করুক, সুন্দরী মেম-সাহেব বউয়ের পেটিকোট ইনফ্লুয়েন্সের ওপরে যাওয়া অসম্ভব যে কারুর পক্ষেই ; রতনলাল মুন্সীর পক্ষেও সম্ভব বলে মনে হয়নি সন্দীপের। রতনের জন্যে দুঃখিত হলো সন্দীপ। এবার বোধ হয় আত্মসম্মান বজায় রেখে কাজ করাই শক্ত হয়ে উঠবে সন্দীপেরও, মুন্সী স্টুডিওতে সবাই যাকে নাম্বার ওয়ান এবং রতনকে নাম্বার টু বলে জানে। গ্লোরিয়াকে রতন কিন্তু ষ্টুডিওতে পাকাপোক্ত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার আগেই সন্দীপ সম্পর্কে উচ্চারণ করেছিলো সতর্কবাণী। আর যার ব্যাপারেই মাথা গলাও গ্লরি, সন্দীপকে কিছু বোলো না।

কেন ? গ্লোরিয়ার উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর।

কারণ, সন্দীপ চলে গেলে তুমিও বাঁচাতে পারবে না মুন্সী ফিল্‌ম্ ষ্টুডিওকে ; আমি তো নাই-ই—

আচ্ছা ? একটু ব্যঙ্গের কণ্টক হাসির গোলাপ ফুলে এগিয়ে দেয় গ্লোরিয়া।

গ্লোরিয়াও কাজে কাজেই পরিহার করে চলতে লাগলো সন্দীপকে ; সন্দীপও ছায়া মাড়ায় না মালিক পত্নীর। অন্যান্যদের সঙ্গে আস্তে

আস্তে আলাপ জমিয়ে তুললো মুন্সীপত্নী। সন্দীপ দূরে থেকেই বুঝতে পারলো যে স্টুডিওর আর যারা তারা তাদের জীবনের স্বর্ণতম সুযোগ পেয়েছে হাতের মুঠোয়। গ্লোরিয়ার দুকানে যত পারছে তত বিষ ঢালছে সন্দীপের বিরুদ্ধে। মুন্সী ফিল্‌ম্ স্টুডিওতে দিনে পুকুর চুরির মহৎ কর্মে যারা সর্বদাই নিয়োজিত, সন্দীপ মুখার্জিই তাদের একমাত্র পথের কাঁটা। সন্দীপ না থাকলে মুন্সী স্টুডিও যে মাঠের ওপর একদিন খাড়া হয়েছিলো আস্তে আস্তে অনেকদিন ধরে,—অনেকদিন আগেই আবার তা ধূলিসাৎ হতো; মিশে যেত মাটিতেই। হয়নি যে, যার জন্যে হয়নি, সে ওই সন্দীপ। গ্লোরিয়া তাদের সঙ্গে এমনভাবে জমে গেল যে তারা হড়হড় করে সন্দীপের নামে প্রথমে এবং অভ্যেসের দোষে পরম্পবেব নামে তার পরে এত রকম সত্য মিথ্যে বলে ফেললো যে গ্লোরিয়ার সামনে কয়েকদিনের মধ্যে অবারিত হলো সেই সুরঙ্গ যে পথে মুন্সী স্টুডিওর লাভের গুড় সব পিঁপড়েয় সারিবদ্ধভাবে সাফ করে নিয়ে অন্তর্হিত হচ্ছে।

সন্দীপও লক্ষ্য করলো কান ভাবি হচ্ছে গ্লোরিয়াব। এবং সন্দীপকে সে যে ডাকছে না একবারও, তার সরলার্থ হচ্ছে এই যে বতনকে দিয়ে একবাবই ডাকাবে সন্দীপকে সে। ওই একবারই খাস দরবারে ডাক পড়বে তার। এবং সে ডাকের নিহিতার্থ হচ্ছে, সন্দীপকে আর প্রয়োজন নেই মুন্সী ফিল্‌ম্ স্টুডিওর। গ্লোরিয়াই চালাতে পারবে একা। সন্দীপকে ডাকতেও হবে না। সে জানে রতন অত্যন্ত এম্‌বারাসড্ ফিল করবে তাকে এই বার্তা কর্ণাধঃকরণ করাতে গিয়ে। অথচ গ্লোরিয়াকে অমান্য কববাব হবে না দুঃসাহস। ফলে বিটুইন শিলা এণ্ড চ্যাবিবডিস,—নাস্তানাবুদ হবে রতনলাল; সেই এমবাব্যাসমেণ্টের হাত থেকে সেই হর্ণস অভ ডিলেমার অস্বস্তি থেকে রেহাই দেবার জন্যে সন্দীপ নিজে থেকেই চলে যাবার জন্য বেডি হলো। যাই-যাই করেও তাব কোথায় যেন যেতে আটকায়। পায়ে পায়ে যে জড়িয়ে যায় তা নয়; বিবেক গলার টুঁটি টিপে ধবে। কিছুতেই বলতে পাবে না যাবার কথা নিজে থেকে রতনের কাছে, না বলে গেলে ডেসার্টারের লজ্জা দুঃসহ মনে হয়। মুন্সী

ফিল্‌ম্‌ স্টুডিওর ভালো দিনে গেলেও কথা ছিলো ; দুর্দিনে চলে যাবার অপরাধ যারা এই দুদিনের জন্যে দায়ী তাদের অপরাধের চেয়ে গুরুতর বলে গণ্য হবে। অন্যের কাছে হলেও কিছু এসে যেত না কিন্তু নিজের কাছে মরে যাবে নিজে। মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াতে পারবে না আর কোনও দিন। ঠিক এই সময়ে ডাক এলো গ্লোরিয়ার কাছ থেকে। যে বহন করে আনলো আদেশ, তাকে কেন কে জানে ফস করে বলে বসল সন্দীপঃ গিয়ে বলো, এখন আসতে পারবে না সে ; অন্য আরও দরকারী কাজ আছে। যে এসেছিলো তার কৃষ্ণপক্ষ আননে প্রকৃতির চিরদিনের নিয়ম ভঙ্গ করে, খুসির পূর্ণিমা হেসে উঠলো এমন হঠাৎ, এমন পরিপূর্ণতায় যে সন্দীপের চোখ এড়ালো না তা ; সম্ভবত আশে-পাশের ফার্ণিচারের চোখ থাকলে তাদের লক্ষ্যেও আসত। তার এমন হঠাৎ খুসির ঘনিয়ে আসার চিত্তে-র কারণ অবশ্য এক সন্দীপের কাছেই স্পষ্ট হতো তখনও যেমন হলো এই মাত্র। সে বুঝলো, গ্লোরিয়া নিজে ডেকে পাঠানো সত্বেও, সন্দীপের এই না যাওয়ার, 'কাজ আছে'-র অজুহাতে না বলার, ডিলিবারেট ইমপার্টিনেন্স, অফুল ইনসোলেন্স, উইল -ফুল ডিসওবিডিয়েন্স যতদূর কদর্থে কালো করে উপস্থিত করা যায় তার নিদারুণ সুযোগ করে দেওয়ায় সন্দীপ, ভগ্নদূত ভয়ঙ্কর খুসি হয়েছে যে নিঃসন্দেহে সেকথা ম্যাক্সফ্যাক্টর কববার কোনও প্রয়াস পর্যন্ত নেই সেই মুখে। কথাটা চট করে বলে ফেলে, দূত ফিরে যাবার পর একটু, খুব নেগলিজিবল অবশ্যই, চিন্তার রেখা ভুরুর ওপর সমান্তরাল রেখায় দেখা গেল কি গেল না ; বোধ হয় এতটা হট্‌হেডেড রিপ্লাই না দিলেও হতোঃ এ্যাফটা 'ওল গ্লোরিয়া রতনের স্ত্রী ; এই স্টুডিওরও সেই বেটার হাফ। তারপরেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলল দুশ্চিন্তার নীর হাঁসের পিঠ থেকে। মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে তা আর ফেরাবার উপায় নেই ; ধনুক থেকে তীর, টিউব থেকে টুথপেষ্ট বেরিয়ে গেলে তার জন্যে অনুশোচনার অর্থ, কেটে যাওয়া দুধের ওপর কান্নার মতো অর্থহীন।

সন্দীপের ভাবা শেষ হয়েছে কি হয়নি,—খট খট করে আওয়াজ হতেই, চোখ তুললো সে ; গ্লোরিয়া মুন্সী তার দিকেই আসছে। আসন্ন

ঝড়ের জন্যে প্রস্তুত হলো সন্দীপ মুখার্জি। চোয়াল শক্ত হলো, মুঠি দৃঢ়বদ্ধ, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগলো। গ্লোরিয়া এসে দাঁড়াতেই বললোঃ আপনি এলেন কেন? গ্লোরিয়া হাসলো; তার মধ্যে অস্বাভাবিকতার উত্তেজনার এতটুকু ছায়া পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পেল না সন্দীপ। তেমনই হাসতে হাসতেই গ্লোরিয়ার ঝর্ণার ধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলোঃ পর্বত মহম্মদের কাছে না গেলে, মহম্মদের পর্বতের কাছে না এসে উপায় কি? সন্দীপের মুখের কাঠিন্য ঈষৎ নরম হলোঃ না; একটু বাদে আমি নিজেই যেতাম। সন্দীপের এই ভদ্রতা কিন্তু গ্লোরিয়ার অনুমোদন লাভে বঞ্চিত হলো। গ্লোরিয়া বললোঃ গেলে কিন্তু আমি খুশি হতাম না—। এবারে সন্দীপ রীতিমতো অবাক হয়ে প্রশ্ন করেঃ সেকি খুশি হতেন না কেন? আপনি তো ডেকেই পাঠিয়েছিলেন—

গ্লোরিয়াঃ আপনার হাতে কাজ আছে, বলেছেন না?

সন্দীপঃ সত্যিই কাজ ছিলো—

গ্লোঃ এই স্টুডিওতে আজ এতদিনের মধ্যে এই একজনের কাছেই তবু প্রথম শুনলাম সেই কথাঃ কাজ আছে—

সঃ আপনার কি ধারণা হয়েছিলো এখানে—

গ্লোঃ এখানে যত কাজ সব আমার স্বামীর; আর কারুর বুঝি কিছু করবার নেই। আজ প্রথম ধারণা পালটাচ্ছে; আরও একজন আছে, যার কাজ থাকে —

সমস্ত হিসেব গোলমাল হয়ে তালগোল পাকিয়ে বিদিকিচ্ছিরি চেহারা নিলো সন্দীপ মুখার্জির মনে। মনে হলো একবার একথাও যে গ্লোরিয়া ঠাট্টা করছে না তো? এবং মনে হওয়া মাত্তর তা মুখ দিয়ে বেরিয়েও গেলঃ ঠাট্টা করছেন?

গ্লোঃ আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করবার সম্পর্ক নয় প্রথমতঃ; সেকেণ্ডলি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কারুর সঙ্গেই রসালাপ করা আমার স্বভাব নয়, মিস্টার মুখার্জি; ওয়েল,

আমি ঠাট্টা করছি, এমন মনে করার আপনার কারণ কি, মে য়াই নো প্লিস্ ?

স ঃ আমার ধারণা হয়েছিলো এতদিনে আমার সহকর্মীরা আপনার কানে আমার সম্বন্ধে যত মধু ঢেলেছে তাতে আজ আপনি ডেকে পাঠানো সত্ত্বেও আমার 'না' বলার পর যখন আপনাকে আসতে দেখলাম, তখন, ধরেনিলাম যে, আমার সার্ভিসেস আ' নো লোংগা' রিকোয়াড —বলবার জন্যেই নিশ্চয়ই আপনার আগমন হয়েছে ; কিন্তু তার পরিবর্তে আপনার লাস্ট কথাগুলো শুনে, ইঁদুরকে মারবার আগে বেড়াল যেমন খেলায়, তেমনই খেলাচ্ছেন মনে করে থেকে কিছু অন্যায় করেছি, এই সার্কামস্ট্যান্সে ?

গ্লো ঃ নাথিং হোয়াট সো এভার ; আপনার অনুমানও মিথ্যে নয়। এতদিন ধরে ওদের সকলেরই প্রায় ওই এক কাজই ছিলো ; আপনার বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিষ উদ্গীরণ করা। কিন্তু যা রটে তার সবটাই কি মিথ্যে ?

স ঃ তাহলে আপনি বিশ্বাস করেছেন—

গ্লো ঃ হ্যাঁ ; আমি বিশ্বাস করি যে এই স্টুডিওকে আপনি বাঁচাতে পারতেন কিন্তু বাঁচাতে চাইছেন না—

স ঃ আমি বাঁচাতে চাইছি না মুন্সী ফিল্ম্ স্টুডিওকে ?

গ্লো ঃ এক্স্যাক্টলি সো।

স ঃ কি ভাবে আমি বাঁচাতে পারতাম ?

গ্লো ঃ পারতেন বলছেন কেন ? এখনও পারেন—

স ঃ কি ভাবে ?

গ্লো ঃ মিথ্যে অভিমানে আমার কাছ থেকে দূরে না থেকে—

স ঃ আপনিও তো কই আমার কাছে আসেন নি ?

গ্লো ঃ আসিনি, তার কারণ সন্দেহ নয় ; আসিনি, কারণ স্টক নিচ্ছিলাম—

স ঃ স্টক ?

গ্লো ঃ হ্যাঁ ; কত ফার্ণিচার আছে অথবা স্টুডিও প্রপার্টির স্টক নয়—

স ঃ তবে ?

গ্লো ঃ লাইভস্টক যারা,—স্টুডিও ওয়ার্কারদেব তত্ত্ব নিচ্ছিলাম —যখন আপনি—

স ঃ আমি—

গ্লো ঃ যখন আপনি একেবাবে স্থূয়া হয়ে বসে আছেন যে আমি এসেছি ওদের কথায় আপনাকে সরাতে ঃ

স ঃ আমি—আমি—

গ্লো ঃ ইটস য়ুসলেস মিস্টার মুখার্জি,—এবসলিটলি য়ুসলেস ! আমি যেমন জানি, আপনিও তেমনই জানেন আমি যা বলছি তা-ই কাবেক্ট —

স ঃ আপনি কি কবে বলছেন তাই ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি —

গ্লো ঃ একটুও অবাক হতেন না যদি জানতেন যে আপনারা বুদ্ধি দিয়ে সব জানতে চান তাই প্রায় কিছুই জানা হয় না ; আমাদেব বুদ্ধি দেননি ভগবান ; দিয়েছেন ইনটুশান,—তাই আমাদেব, যা কোনও দিন জানার সম্ভাবনা নেই তা-ও জানিয়ে দিয়ে যায় অনেক আগে থেকে। কামিং ইভেন্টস, মেয়েদেব ইনটুশানে, ওলওয়েস কাস্ট দেয়া 'স্যাডোস বিফো'--

স ঃ সেই ইনটুশানে আপনি আব কি জানতে পেবেছেন ?

গ্লো ঃ জানতে পেবেছি যে আপনি আমাব অপেক্ষাতেই ছিলেন—

স ঃ আপনাব অপেক্ষায ?

গ্লো ঃ আমাব অপেক্ষাতেই ছিলেন আপনি সেইদিন থেকেই যেদিন বুঝেছিলেন সে মুন্সী ফিলিম স্টুডিওকে

বাঁচানোর সাধ্য আর আপনার একার হাতে নেই ;
আমিও আপনার অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন—

স ঃ আমার অপেক্ষায় ?

গ্লো ঃ হ্যাঁ আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম যে মুহূর্তে বুঝেছিলাম যে মুন্সী ফিলম্ স্টুডিওকে বাঁচানোর সাধ্য আর আমার একার হাতি নেই—

স ঃ তাহলে এখন করনীয় ?

গ্লো ঃ লেট আস জয়েন হ্যাণ্ডস ফার্স্ট দেন টুগেদার ফাইট দি ইভিল্স্ আউট—

গ্লোরিয়া হাত বাড়িয়ে দেয় সন্দীপের দিকে। করমর্দন করে দুজন। সন্দীপ মুখুজ্জের সমস্ত স্নায়ু অব্যক্ত উত্তেজনায় রিমঝিম করতে থাকে ডিসেম্বরের কলকাতায় দুপুর বেলায় নিঃসীম নীল আকাশের মতো। গ্লোরিয়ার বুকের ভেতর বাদল অপরাহ্নের বর্ষণ আসন্ন মেঘের গুরুগুরুও বোধ হয় শুনতে পায় সন্দীপ। দুজনেই দুজনের চোখ এভয়েড করে। দুজনেই চুপ করে যায় মেঘে মেঘে ঘর্ষণের আগে ঝড়ের থমথমে প্রকৃতির মতোই। মুহূর্তকাল মাত্র। তারপরেই ছিটকে যায় দুদিকে। স্টুডিও ফ্লোরের ভেতর থেকে রতন মুন্সীর গলা ভেসে সাউণ্ড ট্রাকের কৃপায় ঃ কাট !

তিন

দুজনে কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগে গেল মুন্সী স্টুডিওকে নতুন করে ঢেলে সাজতে। সন্দীপ মুখার্জ্জি আর গ্লোরিয়া মুন্সী। গ্লোরিয়া সন্দীপের কাছে প্রথম যেদিন গেলো সেদিনও খালি হাতে গেলোনা। সঙ্গে একটি তালিকা নিয়ে গেছিলো। তালিকাটি সন্দীপের হাতে দিয়ে বললো ঃ এই চারজন দিনে ডাকাতি করতে চায়। বাকী সব কেউ চোর ; কেউ ছ্যাচোর। তালিকাটি হাতে নিয়ে সন্দীপ হতবাক হয়ে গেল

বেশ কিছুক্ষণের জন্যে। সেই চারজনেরই নাম ফার্স্ট প্রেফরেন্সের ফার্স্টে'ই যে চারজনকে স্পট করতে সন্দীপের লেগেছে কয়েক বছর; গ্লোরিয়ার,—কয়েক মাসও নয়। সন্দীপ যখন লিস্ট্‌টা দেখতে দেখতে বললো: তাহলে এ চারজনকে খতম করে দেওয়া যাক অবিলম্বে এবং তখন যখন গ্লোরিয়া বললো: না; এদের এখন খতম করা ঠিক হবে না,—তখনও সন্দীপের অবাক হবার অন্ত হয়নি। কেন? প্রশ্ন করে সন্দীপ! জবাব করে গ্লোরিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে: এরা কম্‌পিটেন্টও সব চেয়ে যেমন সব চেয়ে বড় ডাকাতও। এদের একসঙ্গে নোটিশ দিলে চোর ছ্যাচোর সমেত এমন জট পাকিয়ে দেবে যে স্টুডিওর কাজ শিকেয় তুলে রাখতে হবে বেশ কিছুকাল; এই অবস্থায় হিতে বিপরীত হবে তাহলে। তার চেয়ে চোরছ্যাচরগুলোকে সরানো দরকার একে একে। সন্দীপ: বেশ; 'তারপব? তারপর গ্লোরিয়া নেক্সট্ স্টেপ বাৎলায়: তারপর নয়; ইন দ্যা মিন টাইম, বড় চারজনের মধ্যে ছুটো দল করে ছুজন-ছুজনকে আলাদা আলাদা করে দেওয়া এবং প্রথমে একদলকে নোটিশ দেওয়া: তারপর দ্বিতীয় গ্রুপকেও —;

সন্দীপের খেয়াল হয় এতক্ষণে। গ্লোরিয়া মুন্সী হবার আগে যে ম্যাকডোনালড্ ছিলো তার রক্তেই যে ডিভাইড এণ্ড রুলের ট্রাডিশন রয়ে গেছে। গ্লোরিয়া এখানেও থামলো না। মুন্সী ফিলম স্টুডিওতে দেড়খানা ফ্লোর ছিলো। আধখানা ফ্লোরকে পুরো একখানা ফ্লোরে পরিণত করে ভাড়া দিলো অন্য ছবিওলাদের। তখন অবশ্য কলকাতায় ছবিওলার সংখ্যা আঙুলের সংখ্যা অতিক্রম করতো না। তাহলেও মাসে পনের থেকে কুড়িদিনের ভাড়াব টাকায় মুন্সী ফিলম্ স্টুডিওর স্টাফের মাইনের জন্যে ভাবতে হলো না আর রতনকে। সন্দীপকে দিলো রতনের কাজে পুরো লাগিয়ে; এবং গ্লোরিয়া নিজে আগলিয়ে রাখলো প্রোডাকশন ইত্যাদির যে চোরা রাস্তা দিয়ে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যাচ্ছে সেইদিক। ঝলমল করে উঠলো মুন্সী ফিলম্ স্টুডিও। গ্লোরিয়াই প্রথম মতলব দিলো রতন এবং সন্দীপকে যে বাঙলা ছবি করলে হবে না; হিন্দি ছবিও চাই। অল ইণ্ডিয়া মার্কেট

ছাড়া এত পরিশ্রম পোষাবে না। এবং প্রথম হিন্দি ছবির বিষয় নির্বাচিত হলো লায়লা-মজনু। লায়লার ভূমিকায় ঘোষিত হলো গ্লোরিয়ার চিত্র-নাম : মিস কোয়েলি ; মজনুর রোলে ! চারু দত্ত,—রঞ্জন রয়ের ফিলম্‌নেম।

মুন্সী ফিলম স্টুডিওর ছাদের আলসে থেকে যে সুখের পায়রারা উড়ে গেছিলো তারা আবার আলসে জুড়ে বসলো সার সার। স্টাফ পেমেণ্ট হতে লাগলো মাসের পয়লা। পয়লা রবিবার পড়লে তার আগের দিন। রতনলাল সেটে ঢোকবার আগে রেডি হলো লাইট। সেট, আর্টিস্ট। পান থেকে চূণ খসলে নো মার্সি। তটস্থ রইলো সারাক্ষণ সারা স্টুডিও।

।। নবম পরিচ্ছেদ ।।

রতনলাল মুন্সীর মামলার কথা কয়েকবারই বলেছি ; তবেই কথাই বলেছি কেবল। আসলে কি হয়েছিলো বলতে গিয়ে আদালতে কি হয়েছিলো তার উল্লেখ পর্যন্ত করিনি। কিন্তু এখন পর্যন্ত যেমন কেন করিনি তার যথেষ্ট কারণ আছে তেমনই আবার না করলে তার সুযোগ পাব কিনা বলা শক্ত। এই মামলা পঁচিশ বছর আগে ঘটেছে বলেই তা-ই ; নাহলে এর উল্লেখ করবার হয়তো প্রয়োজনই হতো না। কিন্তু পঁচিশ বছর আগের এই উত্তেজক হত্যাকাণ্ডের যেটুকু প্রকাশ্য আদালতে দিনের আলো প্রত্যক্ষ করেছিলো সেটুকুর সঙ্গে বিডারকে আরেকবার অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ না দিলে, তার মেমারী ঝালিয়ে নিতে না দিলে এ মামলার নেপথ্যের সেই ড্রামা উইদিন ড্রামার পুরো রস উপভোগ করা অসম্ভব হবে তাদের পক্ষে যারা উনিশশো ষাট সালেও জলের মতো করে সব বুঝিয়ে খোলসা করে না বললে বই শেষ করে বলেন ঃ দূর ! একি হলো, কিছু বোঝা গেল না তো। এ হলো তাদের কথা যাদের জন্যে বাঙলা ছবির রজতজয়ন্তী এবং বাঙলা বইয়ের এক মাসে একহাজার বইয়ের প্রত্যেক আড়াইশোতে একটি করে চারটি সংস্করণ হয়। এদের জন্যে যথেষ্ট শিশুপাঠ্য না হলে উপন্যাস, প্রকাশক বই বিক্রী আরম্ভের সাতদিনের মধ্যে লেখককে শাসাতে থাকে ঃ কই মশাই বই তেমন টানছে কই ? বই কি চাল ডাল আলু-পটল ? বই কি ঘুঘনি, চানাচুর, সিনেমার কাগজ অথবা তাড়ির পাত্র যে যত দ্রুত টানা যাবে ততই তার অসাধারণত্ব অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

তীর কেবল একদিক এলে রক্ষে ছিলো তবু। বাঙলা উপন্যাসকে চিরকাল রামেও মেরেছে ; সুগ্রীবেও। বর্তমানে, লঙ্কাকাণ্ড বাধানোই যার রামভক্ত জীবনের সব চেয়ে প্রকাণ্ড কীর্তি, সেই সে অথবা তারাও মারছে। এরা যেহেতু ইংরেজি অক্ষরে ছাপা পিটার চেনীর পাঠক

সেইহেতুই এরা নিসংশয়ে বঙ্গসাহিত্যের অবিসম্বাদী সমালোচক। সাধারণ পাঠক যারা বাঙলা উপন্যাসের সেই পাঠিকারা যেমন সব বুঝতে না পারা পর্যন্ত বুঝতে চান না যে উপন্যাস পড়বার উপযোগী হয়েছে, এদের কাছে আবার তেমনি উপন্যাসেব সব যদি বোঝা গেল তাহলে হয়ে গেল আপনার; আপনার মানে বুঝতে হবে এক্ষেত্রে 'আমার' কথা বলছি। এই ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীরদের ভয়ে বাঙলা উপন্যাসে বর্তমানে টংএ চড়ে আছে; সেখান থেকে তাকে নামিয়ে আধখানা জল এবং আধখানা ডাঙা বরাবর সেফলি পৌছে দেওয়া তার সুস্থতার আর স্বাভাবিকতার গতি নির্দিষ্ট পথে তার জীবনসঙ্গত গন্তব্যস্থলে এগিয়ে নিয়ে যাবার সাধ অথবা সাধ্য কোনটাই আমাব অযথাক্রমে কব্জি অথবা কলজেয় দেখতে পাচ্ছিনা। আসল কথা, জনপ্রিয়তার মুখ চেয়ে দারুণ টেনশান অথবা বিজ্ঞজনপ্রিয়তার তুর্মুখ চেয়ে নিদারুণ প্রিটেনশান, তুয়েরই প্রতি আমার অনীহা তুল্যমূল্য; ফিফটি-ফিফটি।

রতনলাল মুন্সীব মামলাকে অতএব তুলে ধরি যেমন সিরিয়ালি আত্মপ্রকাশ করেছিল কোর্টে অবিকল তেমনই। মামলার বিবরণে প্রকাশ পায় যে বিখ্যাত ভাবতীয় চিত্রপরিচালক, রতন মুন্সী শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রঞ্জন রয় ওরফে নিরঞ্জন রায়কে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার অপরাধে ধৃত হন। হত্যা করার কারণ বলে যা জানা যায় তা হচ্ছে রঞ্জন রয়েব সঙ্গে রতনলালেব স্ত্রীর ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া। আসামী পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করবার পর নিজেকে নির্দোষ বলে আদালতে ঘোষণা করে। তার বক্তব্য এই হয় যে রিভলবার নিয়ে রঞ্জনের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় আকস্মিকভাবে একটি গুলি পিস্তল থেকে ছুটে বেরিয়ে রঞ্জনেব খুলি ফুটো করে দেয়। হত্যা করবার অভিসন্ধি নিয়ে সে সেখানে যায়নি। ববং রঞ্জনের সঙ্গে তাব স্ত্রীব ব্যাপারে সম্মানজনক মীমাংসাব প্রস্তাব নিয়েই উপস্থিত হয়েছিলো হত্যার দিন নিহতের ফ্ল্যাটে। দায়বার সোপর্দ হবার পর যথারীতি জুরী সনভি-ব্যাহারে বিচার আরম্ভ হয় রঞ্জন রয় হত্যা মামলায় অভিযুক্ত রতনলাল মুন্সীর। এবং জেরার মাধ্যমে যে তথ্য দিনের আলো অবগত হয় তা

নাচে পাঠক অর্থাৎ পাঠিকাদের অবগতির জন্যে তার যথাসাধ্য হুবহু সামারি অথবা প্রেসি করে দেওয়া গেল।

মামলার উদ্বোধন করতে উঠে ক্রাউনের হয়ে তদানীন্তন ব্যবহারজীবি এন এন তরফদার বলেন ঃ

অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক; নিহত ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদার। হত্যাকাণ্ডের ঠিক আগের অঙ্কে দেখা যায় যে লায়লা-মজনু ছবির বহিদৃশ্য গ্রহণের জন্যে প্রায় একমাস উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় স্যুটিং করে ফিরে আসে কলকাতায়, রঞ্জন রয়কে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত এই রোমাঞ্চকর মামলার সুদর্শন নায়ক রতনলাল মুন্সী [হাইট ঃ ৫´ - ১১´´; বুকের ছাতি ৪৫´´; কোমর ঃ ৩৩´´; ডানভুরুর ওপর ছোট্ট লাল জরুল, আসামীর জন্মচিহ্ন] কলকাতায় ফিরে দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এই প্রথম তার স্ত্রী গ্লোরিয়াকে কেমন যেন একটু নিরুত্তাপ লাগে তার। এর আগে যতবার রতনলালকে একা বেরুতে হয়েছে দলবল নিয়ে কলকাতার বাইরে ছবি তুলতে ততবারই ফিরে এসেছে সে যেমন অপার আগ্রহ নিয়ে স্ত্রী আর সন্তানের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্যে, তেমনই স্ত্রীও প্রত্যেকবার অন্তহীন সোহাগে উছলে পড়েছে; এই অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রমে বিস্মিত রতন তার স্ত্রীকে কাছে টানবার জন্যে যতবার গ্লোরিয়ার সন্নিকট হবার প্রস্তাব করে ততবার গ্লোরিয়া নানা অছিলায় দূরে দূরে সরে সরে ছিটকে ছিটকে যায়। তারপর একদিন আর সহ্য করতে না পেরে গ্লোরিয়াকে জিজ্ঞেস করে ঃ হোয়াটস রোং উইথ য়ু? মাথা নীচু করে থাকে রতনের স্ত্রী। দ্বিতীয় প্রশ্নও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুড়ে দেয় রতনলাল মুন্সী ঃ টেল মি, ইস ইট রঞ্জন? এবারেও নিরুত্তর থাকে গ্লোরিয়া।

এর পরের দৃশ্যই এ নাটকের চরম যবনিকা পতনের দৃশ্য। রঞ্জন রয়ের ওখানে যায় রতনলাল মুন্সী। রঞ্জন তখন তার বেডরুমে ছিলো; সেখানে ঢুকে বেরুবার দরজা আগলে দাঁড়ায় রতনলাল। তিনটি গুলির শব্দ হয় একের পর এক। গুলীর শব্দের সঙ্গে জানলার কাঁচ ভেঙ্গে পড়ার আওয়াজ নিস্তব্ধ ফ্ল্যাটবাড়ির ঘুম ভাঙায় মুহূর্তে। রঞ্জনের

বেয়ারা এবং সেই সময়ে উপস্থিত নিহতের আত্মীয় ডালিয়া এসে প্রবেশ করে মঞ্চে। শোনা যায় যে ডালিয়া নাকি রতনকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে? এবং রতন নাকি তার কোনও উত্তর না দিয়ে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে ডালিয়াকে পিস্তল দেখিয়ে। নীচে নেমে তার গাড়ি চালিয়ে বেরুবার সময়ে রতন আরেকবার বাধা পায় অবশ্য; এবারের বাধা আসে ফ্ল্যাটবাড়ির কম্যন ওয়াচম্যানের কাছ থেকে। বলা হয়েছে যে রতন তাকেও এই বলেই নিরস্ত করে যে তাকে আটকাবার দরকার নেই; সে নিজেই পুলিশের কাছে যাচ্ছে।

ডেপুটি কমিশনার উইলিয়ামসানের সামনে রতনলাল মুন্সীর স্টেটমেণ্ট রেকর্ড করা হয়।

রতনলালের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন সেদিন যিনি তাঁর নামও রতন: রতন ভাণ্ডারী;—সেই সময়ে কলকাতা হাইকোর্টের উঠতি ক্রিমিন্যাল লয়ার। আসামী রতন মুন্সীকেই ডিফেন্স কাউন্সেল এক নম্বর সাক্ষী করেন। মিষ্টার ভাণ্ডারীর জিজ্ঞাসার উত্তরে রতনলাল যা বলে তা হচ্ছে এই:

গ্লোরিয়া যখন তাব চরম জিজ্ঞাসা: 'টেল মি ইস ইট রঞ্জন?' এর উত্তরে জবাব দেয় না তখন কিছুক্ষণের জন্যে কিছুই ভাবতে পারেনি সে। এবং প্রথম যে চিন্তা আমার মাথায় আসে তা রঞ্জনকে নয়, নিজেকে হত্যা করবার। আমার স্ত্রীর নিরুত্তরতাই আমার প্রশ্নের চরম উত্তর দিয়েছে: সে উত্তর জীবন-মরণ প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছে মুহূর্তে। রঞ্জনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার দৃশ্য আমার চোখে পড়েনি ঠিক; কিন্তু কানে এসেছে তাব আগে বহুবার। কিন্তু কাকে কান নিয়ে যাওয়ার গুজবের সঙ্গে সাহা কাকের পেছনে দৌড়নো আমার স্বভাববিরুদ্ধ; তাই তার আগে কাণে হাত দিয়ে কাণ আছে কি না দেখাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলাম। কিন্তু গ্লোরিয়ার জবাব না দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি জবাব পেয়ে গিয়েছিলাম আমার প্রশ্নের। আমার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মুহূর্তেই ধ্বসে ছড়িয়ে ছত্রখান হয়ে গিয়েছিলো তাসের ঘরের মতো। তারপরেও আমি মারতে যাইনি রঞ্জনকে মরতে চেয়েছিলাম, মারতে

চেয়েছিলাম নিজেকেই। জানতে গিয়েছিলাম তার কাছে সপুত্র আমার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে সে যদি সম্মানজনক সর্তে প্রস্তুত থাকে তাহলে আমি গ্লোরিয়াকে ছেড়ে দিতে রাজী আছি তার হাতে যাকে নিয়ে সে সুখী হতে পারবে বলে তার বিশ্বাস।

রঞ্জনকে যখন সেই প্রস্তাব করলাম তখন সে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী সম্পর্কে এমন একটি ইতর উক্তি করলো যে তারপর চুপ করে থাকা কোনও নপুংসকের পক্ষেও অসম্ভব।

ভাণ্ডারী : উইল য়ু প্লিস টেল দি অনারেবল কোর্ট, প্রিসাইসলি হোয়াট হি সেড এগেন্সট য়ুয়া' ওয়াইফ ?

রতন : ইটস আনাটারেবলি ভালগার—

কোর্ট : ইটস আণ্ডারস্টুড,—গো এহেড উইথ হোয়াট হ্যাপ্‌ন্‌ড্‌ দেন :—

রঞ্জন আবার বলে : আমি নিজেকে যে কোনও মুহূর্তে শেষ করে দেবার জন্যে আমার পিস্তলটা পকেটে নিয়ে ঘুরি তখন ; সেই পিস্তলটা টেবলের ওপব রেখে রঞ্জনকে বলি : বাই গড, য়ু আ গোয়িং টু বি থ্র্যাশড্‌ ফ' দিস—। আমি শুধু হাতে লড়ায়ের জন্যে এগুতেই রঞ্জন টেবলের ওপর রাখা পিস্তলটার দিকে হাত বাড়ায়। তাই দেখে আমি পিস্তলটা তুলে নিই। এবং পিস্তলটা রঞ্জনের দিকে ঘুরিয়ে চীৎকার করি : খবরদার ! রঞ্জন দাঁড়িয়েছিল আমার খুব কাছে। হঠাৎ সে আমার পিস্তলধরা হাতের কব্জিটা চেপে ধরে উল্টোদিকে মোচড় দেবার চেষ্টা করে। ওই অবস্থায় তাকে ধাক্কা দিতে দিতে আমি বাথরুমের দিকে নিয়ে যাই। তখনও সে আমার কব্জি ছাড়ে নি এবং হাঁটু দিয়ে আমার মালাইচাকিতে মারবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ততক্ষণে তাকে বাথরুমের ভেতরে নিয়ে গেছি আমি ঠেলে। এবং পিস্তলটা ছাড়াবার জন্যে তখনও মারাত্মক ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে।

এই সময়েই, যতদূর মনে পড়ে আমার দুটি গুলি বেরিয়ে যায় পিস্তলের মুখ দিয়ে। প্রথম গুলির পর রঞ্জন আমার হাতের ওপর ঝুলতে থাকে ; একটু বাদেই সে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে পড়ে যায়

বাথরুমের মেঝেয়। তারপর আমি নিজে থেকেই পুলিশে যাই। আমি বিশ্বাস করি, একজন আমার স্ত্রীর প্রতি যে অন্যায় করেই থাকুক না কেন তাকে হত্যা করবার কোনও অধিকার আমার অথবা প্রবঞ্চিত আর কোনও স্বামীরও নেই। আজও যেমন, সেদিন যখন রঞ্জনের কাছে যাই, তখনও আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় ছিলো। তাকে হত্যা করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার ছিলো না।

অভিযোগকারী ব্যবহারজীবি তরফদার: আমি মনে করি আপনি যা বলছেন তা সত্য নয়—

রতনলাল: সত্য ; সম্পূর্ণ সত্য—

তরফদার: না আপনি আহত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিহতের ওপর ; তাকে হত্যা করে তবেই আপনি ফ্ল্যাট ছেড়ে যান—

রতন: ইটস এ লাই ; ইটস নট ট্রু—

আসামীব পক্ষ সমর্থনকারী ব্যারিষ্টাব ভাণ্ডারী: দেন টেল আস হোয়াটস ট্রু ?

রতন: আয়াভ সেড ইট এস আই সে ওয়ান্‌স্' গেন ; -ইটস দিস—ইফ রঞ্জন হ্যাড এগ্রিড টু একসেপ্ট মাই ওয়াইফ এণ্ড মাই কিডস অনারেবলি, আই ওয়াস প্রিপেয়ার্ড টু গিভ হার দ্য ফ্রিডম সি ওয়াস এ্যাসকিং ফ'এণ্ড প্রোব্যাবলি উড হ্যাভ পুট এন এণ্ড টু মাই লাইফ, এণ্ড দ্যাট বাই শুটিং—

জেবার উত্তরে আরও বলে: ইফ আই ইনটেনডেড টু কিল হিম, আই কুড রিডল হিম উইথ বুলেটস,-বিফো' হি কুড মুভ অ টক ! কুডন্‌ট আই ?

দুই

রঞ্জনের বাড়িতে যখন ঢুকছে রতন সেই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য ঘটতে যাবার দিন,—গ্লোরিয়া তখন বেরিয়ে যাচ্ছে সন্দীপের বাড়ি থেকে। সন্দীপ বাড়াতে ছিলো না; কিন্তু গ্লোরিয়ার জন্যে রেখে গিয়েছিলো এই চিঠি :

> রঞ্জন রয়ের সঙ্গে তোমার কীর্ত্তিকলাপ জানতে কারুর আর বাকী নেই শহরে। আমারও নেই। নিজের স্বামীকে বঞ্চিত করে আমার সঙ্গে যে খেলা তুমি খেলতে চেয়েছিলে সে খেলায় আমি যোগ দিইনি কেন, রঞ্জন রয়ের সঙ্গে তোমার সেই একই খেলার পুনরাবৃত্তি তারই সুনিশ্চিত প্রমাণ। আমার সঙ্গে দেখা করার আর চেষ্টা করলে আমি তোমার স্বামীকে সব জানাতে বাধ্য হব। আমার একটি কথা তুমি রাখবে? এভাবে আর ভবিষ্যতে আমার মতো আর কোনও হতভাগ্যকে—

চোখের জলে সন্দীপের চিঠির বাকী কথাগুলো পড়তে পারে না গ্লোরিয়া তবে তা অনুমান করতে পারে। চিঠিটাকে ছিঁড়ে উড়িয়ে দেয় রাস্তায় পা দেবার আগেই। চিঠির টুকরোগুলো হাওয়ায় নাচতে থাকে অশান্ত সমুদ্রে ডিঙি নৌকর মতোই।

তিন

গ্লোরিয়া মুন্সী রঞ্জনের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার কলঙ্ক নিয়ে সরে গেল; রঞ্জন রয়ের অপঘাত মৃত্যু হলো রতনের পিস্তলের গুলিতে; রতন হত্যার মামলায় দাঁড়ালো আসামীর কাঠগড়ায়; ডালিয়া তখন প্রায় উন্মাদ হয়ে আছে অনুশোচনায়, গ্লানিতে, আর

ফ্রাসট্রেশানের কন্‌স্ট্যান্ট আক্রমণে। কেবল এই সমস্ত ঘটনার জন্যে যে একমাত্র দায়ী তার নাম প্রকাশ পেল না কোথাও; না আদালতে, না নিউসপেপার গসিপে। যারা প্রায় কিছুই না জেনে সব ব্যাপারে বলে থাকে, 'আরে আসলে কি হয়েছিলো এক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না; তাই বলছি এখন,—কিন্তু কথা দাও, য়ু মাস্ট্ নট ডাইভালজ ইট টু এনিবডি,'—তারপর শ্রোতা ভয়ঙ্কর পেট আলগা, অতএব তাকে বলা যাবে না কোনও কথা, এই কায়দায় আরও উদগ্র করে তোলবার জন্যে সাসপেন্স, চুপ করে যায় অসময়ে। শ্রোতা যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে সে পীড়াপীড়ি করে না বাকী কিস্তির জন্যে, ফ্যাক্টের নয়,—ফিকশনের। কারণ সে জানে এই জাতীয় নেপথ্য কাহিনীর বিবৃতিকারদের বাকীটুকু না বলতে পারা তক পেটের ভাত হজম হয় না। এবং তার অনুমান সত্য প্রমাণিত হয় প্রায় পরের মুহূর্তেই; অর্থাৎ শ্রোতার ডাইভালজ না করবার প্রতিশ্রুতির পূর্বাহ্ণেই সুরু হয়ে যায় স্টোরি বাহাইণ্ড স্টোরি। এই জাতীয় স্টোরি টু্পাররাও সন্ধান পায়নি এই মামলায় আসল কেন্দ্রবিন্দুব।

মুন্সী ফিলম্ স্টুডিও জমে ওঠবার আগেই জমে উঠলো সন্দীপ-গ্লোরিয়ার সখ্য ফ্রিজের ঠাণ্ডায় যেমন জল জমে বরফ হয়ে যায় জানবার আগেই; অথবা অনেক লোকের মাথায় চুল যেমন নাপিতের কাঁচিতে নিশ্চিহ্ন হবার আগেই পুরো, আবার বাড়তে থাকে সেইরকম সুইফট পেসে সন্দীপ-গ্লোরিয়া-নাট্য জমে উঠলো। গ্লোরিয়াকে জেরায় জেবায় বার করে নিয়েছিলাম সব। গ্লোরিয়ার সমস্ত কথার মধ্যে একটা কথাই কেবল আমি মেনে নিই নি। সে কথায় পরে আসছি; তার আগে বলে নিই। গ্লোরিয়ার অন্যান্য কথা। সে যেভাবে বলেছিল প্রায় সেইভাবে; কিন্তু অবিকল সেই ভাবে নয়। অবিকল সেই ভাবে বললে অনেক বাস্তব হয়েও উপন্যাসে তা বিশ্বাস করা শক্তই হতো হয়তো।

প্রথমে গ্লোরিয়া নিজেও বুঝতে পারেনি। সে ভেবেছিলো তারা দুজনে মিলে নতুন করে বাজিয়ে তুলছে একটি মৃতপ্রায় রাগিণীকে। মুন্সী ফিল্‌ম্ স্টুডিও শুকিয়ে গেল না; সাজানো বাগান হয়ে দেখা

দিতে লাগলো দিনের পর দিন। দিনের পর দিন তারা, দুজন একসঙ্গে উঠলো বসলো। স্টুডিওতে; স্টুডিওর পর বাড়িতে। তারপর অসুস্থ হয়ে পড়লো একদিন গ্লোরিয়া। সন্দীপ এলো বাড়িতে; ডালিয়া সেই সময়েই তাকে দেখে কিন্তু লক্ষ্য করে না। লক্ষ্য করে না রতনও। একদিন ডাক্তার সারদা সেন, মুন্সী পরিবারের একমাত্র বন্ধু, সারা দুপুর গ্লোরিয়ার শয্যার পাশে অপেক্ষা করলো ওষুধের জন্যে। ওষুধ আনতে বেরিয়েছিলো সন্দীপ। দুষ্প্রাপ্য ঔষুধ। খুজতে খুজতে এ দোকান ও দোকান করতে বেলা গড়িয়ে এলো কিন্তু ওষুধ মিললো না। হতাশ হয়ে ফিরে এসে দেখে ডাক্তার সারদা সেন বসে আছে তখনও। মুখ যতদূর সম্ভব কালো করে ওষুধ না পাবার ডিটেলড্ ফিরিস্তি দেবার পরেও ডাক্তারের মুখে তেমন মেঘ জমতে না দেখে ভাবলো ডাক্তার নিশ্চয়ই বিকল্প প্রেসক্রিপশানের মেটিরিয়াল খুজে পেয়েছে কিছু।

সন্দীপ ঃ তাহলে এখন উপায়?

ডাক্তার ঃ উপায় হয়েছে—

স ঃ হয়েছে? নতুন ওষুধ কিছু?

ডা ঃ নতুন নয়; খুব পুরোনো ওষুধই দেব এবার,—তবে এ অসুখের সেই বোধ হয় একমাত্র ওষুধ যা ধরবে—

স ঃ বলুন—

ডা ঃ বলছি; তার আগেই তুমি বল দেখি ছোকরা, সন্দীপ কার নাম?

সে মুহূর্তে সন্দীপ যদি সমস্ত অসুখ গা থেকে ঝেড়ে ফেলে এক ঝটকায় উঠে বসতে দেখতো গ্লোরিয়াকে তাহলেও অত চমকে উঠতো না; সারদা সেন মানুষ হলেও ডাক্তার মানুষ তাই রক্ষা পেল সন্দীপ; ডাক্তারের চোখে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিলো না! অনেক কষ্টে বাকরুদ্ধ কারুর দীর্ঘদিন বাদে ফিরে এলে বাকশক্তি বাচ্চা ছেলের প্রথম পাঠ মুখস্ত করার সময়ে প্রত্যেক শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করার বেকায়দায় সন্দীপ কেবল কোনও রকমে বার করতে পারলো এই ক'টি অক্ষর ঃ কেন বলুন তো?

ডাঃ সি ইজ ইন লাভ উইথ এ ফেলো নেমড সন্দীপ,—হ্যাটস হোয়াই—

সন্দীপ চুপ করে আছে দেখে আবার বলেন ঃ রতন নিড্‌ন্ট নো দিস নাও অ' এ্যাট অল; এখন সন্দীপকে এনে দিতে পারলে গ্লোরিয়া সেরে উঠবে আর কোনও ওষুধ ছাড়াই; তারপর এক সময়ে গ্লোরিয়া সেরে যাবার আগেই পুরো সরিয়ে দিলেই হবে সন্দীপকে।

ডাঃ সারদা সেন তার নতুন প্রেসক্রিপশানে পেশ করে বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে। সন্দীপ কি করবে ভেবে না পেয়ে তাকায় গ্লোরিয়ার মুখের দিকে। দিন শেষের ম্লান আলোয় ঘরের কোণে কামিনী ফুলের গন্ধে পায়ে পায়ে এসে ঢুকলো সন্দীপের জীবনের প্রথম রোদন ভরা বসন্তের রাত। সমস্ত জীবন ধরে যে মুহূর্তের জন্যে উন্মুখ অপেক্ষায় থাকে হৃদয়; যে মুহূর্ত আসি আসি করেও আসে না দীর্ঘকাল। প্রতীক্ষায় কাটে ব্যর্থ রাত; বিবশ দিন। বিরল হয়ে আসে কাজের বেলা। এমন সময় মনে হয় মাহ ভাদরের ভরা বাদরে মন্দির শূন্যই রইবে শুধু, সে আসবে না। যদিও সে না আসে তবু বৃথা আশ্বাসে পেতে রাখা ধূলিপরের আসন উঠিয়ে নেবার আসে মুহূর্ত আর মূর্ত হয় সেই,—ভালোবাসার রাত। হিমাদ্রি শৃঙ্গে আসন্ন হয়ে আসে আষাঢ়; বিপুল সমারোহে আসে প্রেম; ভাসিয়ে নিয়ে যায় দুজনকে, অনাদিকালের হৃদয়উৎস হতে যে দুজন চলে আসছে আজও যুগল প্রেমের স্রোতে: যে দুজনেই খেলা করে এসেছে কেবল কোটি প্রেমিকের অশ্রু সলিলে, মিলন মধুর লজ্জায় বিরহ বিধুর সাঁঝে।

আষাঢ় সন্ধ্যার কনে দেখা আলোয় ভারি নরম, ভারি করুণ, অসহায় শুয়ে আছে যে তার দুটি চোখ বোজা; দুচোখে বেয়ে নেমে আসছে অবারণ অকারণ অশ্রুজলের উত্তপ্ত ধারা। সন্দীপের সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো প্রদীপ শিখার মতো; যৌবনের প্রদীপে জীবনের আরতি করার লগ্ন এসে পৌঁছেছে নিজে থেকে পায়ে হেঁটে। একবার মনে হোলো, এ পাপ, এ অন্যায়; ভালোবাসার রমণী পরের স্ত্রী। আরেকবার মনে হলো, সে অপদার্থ, সে ভীরু; জয় করেও যার ভয়

যায় না সে নয় পুরুষ। উন্মাদ বাসনায় আর পরিণামের আশঙ্কায় দুলতে লাগলো তার হৃদয়। দুর্নিবার কামনার উত্তাপে পুড়ে যেতে লাগলো শরীর; অন্যায় ভাবনার অনুশোচনায় পুড়ে ছারখার হতে থাকলো বিবেক। রাত্রি বাড়তে থাকলো বাইরে। ঘরের মধ্যেবইতে থাকলো শব্দময় নিস্তব্ধতা। গ্লোরিয়ার দুচোখের জল সন্তর্পণে মুছিয়ে দিতে গেলো সন্দীপ। চোখের পাতা মেললো গ্লোরিয়া; লক্ষ্য কবলো সন্দীপ চোখের জলে ভিজে গেলেও পাতা, চোখের কোণে ফিরে আসছে জীবনের দ্যুতি। আস্তে আস্তে তুলে দিলো গ্লোরিয়া তার নিজেব হাত সন্দীপেব হাতে।

চার

অসুখ থেকে সেবে ওঠবাব পর স্টুডিওতে এসে দেখে গ্লোবিয়া যে সবাই আছে সন্দীপ নেই। শুনলো, সন্দীপ একমাসের ছুটি নিয়ে বাইবে চলে গেছে। গ্লোবিয়া বুঝলো সন্দীপ এভয়েড করতে চাইছে তাকে। সন্দীপেব বাড়িব ঠিকানা জানা ছিলো; সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো যখন তখন সন্দীপ বাড়ি নেই; বেবিয়েছে। অপেক্ষা করলো গ্লোরিয়া সন্দীপেব ঘবে। এবই, ওবই নাড়াচাড়া করে কবে; সময় কাটতে চায় না কিন্তু। উঠে দাঁড়ায়; পায়চাবী করে; এসে বসে আবার। মাদাম বেভারীব একটা ট্রানস্লেশান র‍্যাক থেকে টেনে বার করতেই তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে গ্লোরিয়াব একখানা মুখ; হাতে আঁকা। গ্লোবিয়া যখ অসুস্থ সেই সময়েব পেন্সিলস্কেচ। সন্দীপ তাহলে আকতেও জানে। ছবিখানা বাব কবে নিয়ে নিজের গর্বপেটিকাস্থ করবে কিনা ভাবছে যখন তখনই এসে দাঁড়িয়েছে সন্দীপ। ছবিখানা গ্লোরিয়ার হাতে দেখে একটু থতমত খেয়ে যায়; এ ছবি কোথায় পেলে? দেখো তো তোমাব চেহাবার সঙ্গে মেলে কি না?

গ্লোরিয়া: না; একটুও মেলে না—

স: তুমি ইচ্ছে করে 'না' বলছ; তোমার মুখ অবিকল বসানো।

গ্লো: না আমার নয়। এমুখ যার তাকে অবশ্য আমি জানি—

স: কে সে:?

গ্লো: মাদাম বোভারী!

ছবিখানা মাদাম বোভারীব অনুবাদের মধ্যে ভরে যথাস্থানে রেখে দেয় গ্লোরিয়া মুন্সী। তারপর কৃত্রিম অনুশাসনের ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করে সন্দীপকে। তুমি ছুটি নিয়েছ বাইরে যাবার জন্যে; বাইরে না গিয়ে কলকাতায় কেন জানতে পারি?

সন্দীপ: এই যাব যাব করছিলাম—

গ্লো: বাইরে নয়; সে স্টুডিওতেই; আবার 'যাব-যাব' করছিলে—

স: তা-ই; কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে—

গ্লো: সেখানে আবার আমি যাচ্ছি অতএব তোমার যাওয়া হয় না;
—এই তো?

স: না; ঠিক তা নয় -

গ্লো: ঠিক তা-ই। বেশ, আমি স্টুডিওতে যাব না কথা দিচ্ছি;
কাল থেকে তাহলে আবার তুমি যেও স্টুডিওতে—

স: একথা বলছ কেন?

গ্লো: বলছি, কারণ মুন্সী ফিল্ম্ স্টুডিও এখন আমাকে না হলেও চলবে; কিন্তু তোমাকে না হলে তার চলবে না—

স: আমি তোমার জন্যে স্টুডিওতে যাচ্ছি না কে বললো?

গ্লো: তুমি ছাড়া আর কে বলতে পারে সেকথা আমাকে বলো?

স: আমি? আমি কখন বললাম সেকথা আবার?

গ্লো: যখন তোমার অসুখ করেছিলো আর সেবা করেছিলাম আমি সেই সময়ে প্রলাপের ঘোরে কি বলেছিলে মনে না থাকারই কথা; তার জন্যে তোমাকে দোষ দিচ্ছি না সন্দীপ; টেক ইট ইসি—

অসুখের সময়ের কথা ঘুরিয়ে বললো সন্দীপকে গ্লোরিয়া। মুহূর্তের জন্যে চুপ করে গেল সন্দীপ। ভেসে এলো সেদিনের স্মৃতি। রোদন

ভরা বসন্তের প্রথম সন্ধ্যায় কামিনী ফুলের গন্ধ বিজড়িত কথা বলার আর না বলার ভীড়ে হারিয়ে গেল হঠাৎ। গ্লোরিয়াই ভাঙ্গলো স্তব্ধতার বরফ : কি, কথা বলছ না কেন?

স : না এ ঠিক নয়—

গ্লো : কি ঠিক নয়?

সন্দীপ তাকালো গ্লোরিয়ার মস্ত বড় দুটো চোখের দিকে : তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হওয়া ঠিক নয়—

গ্লো : ঠিক কে বলেছে? নির্জন ঘরে পরস্ত্রীর সেবার ছলে দেখা করা তোমার ঠিক নয়; দেখা দেওয়াও আমার ঠিক নয়—

স : তাহলে?

গ্লো : কিন্তু স্টুডিওতে আমি মালিকের স্ত্রী। আপনি কর্মী। সেখানে দেখা হওয়ায় বাধা কোথায়?

স : ভয় লাগে যদি আবার—

গ্লো : আপনার ভয় হতে পারে; আমার হয়না। আপনাকে যে ভয় দেখিয়েছিলো সে ছিলো অসুস্থ; আপনি তার দুর্বলতার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন; পারছিলেন না। এখন সে সুস্থ: সম্পূর্ণ সুস্থ। তার দিক থেকে কোনও ভয় নেই—

স : নেই?

গ্লো : এতটুকু না; ভয় করবে সে কাকে? আপনাকে? আপনি কি রঞ্জন রয়? তার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে; আপনার কি আছে?

স : বেশ; আমি যাব স্টুডিওতে কাল থেকে।

গ্লো : কাল থেকে কেন? আজ থেকেই যাবেন। মুন্সী ফিল্‌ম্ স্টুডিওর আপনাকে না হলে চলবে না; কিন্তু মুন্সী ফিল্‌ম্ স্টুডিওর মালিকের স্ত্রীর আপনাকে না হলে চলবে না 'এমন ভাববার মতো দুঃসাহস নাই বা করলেন!

পাঁচ

পরের দিন সন্দীপ স্টুডিওতে গিয়ে দেখে গ্লোরিয়া আসেনি। সন্দীপের মনে ছিলো না যে তার এখন স্টুডিওতে আসার কথা নয়,—কলকাতার বাইরে ছুটিতে থাকার কথা। রতনকে গ্লোরিয়ার কথা জিজ্ঞেস করাতে রতন তার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করে : কিন্তু তুমি এসেছ কেন? তখন মনে পড়ে যায় সন্দীপের যে ছুটি নেবার সময়েই রতন বলেছিলো : ছুটি নিচ্ছ নাও; স্টুডিও ছেড়ে কোথাও গিয়ে এমন কি মরেও বাঁচবে না তুমি; বিশ্রাম নেওয়া তো দূরের কথা।—মাথা চুলকে সন্দীপ বলে : বাইরে যাওয়া হলোই না যখন তখন আর ছুটি নিয়ে ঘরে বসে থেকে কি করব, ভাবলাম যাই, স্টুডিওতে গিয়েই ছুটির বাকী ক'টা দিন উপভোগ করি। 'করো', রতন হাসে : তবে আবার ছুটি নেবার সময় মনে রেখো যে একেবারে ম'রে শেষ ছুটি হবার পরেও, কেওড়াতলায় কি নিমতলায় যাবার সময়ও খাটের ওপর উঠে বসে তুমি বলবে, আমি এখনই এখানে বসেই দেখতে পাচ্ছি, যে আমাকে একবার মুন্সী ফিল্‌ম্ স্টুডিও ঘুরিয়ে না নিয়ে গেলে আমি শ্মশানে যাবো না। সন্দীপও হাসে : রতনলাল মুন্সীও। সন্দীপকে তার পরেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রতন বলে : হ্যাঁ, গ্লোরিয়া আজই আসেনি কেবল। কি ব্যাপার বলতো? গ্লোরিয়া আসে তো তুমি আস না : তুমি আস তো গ্লোরিয়া আসে না কেন? সন্দীপ মাথা নিচু করে থাকে; জবাব দেয় না : কেবল ব্লাশ করে।

সন্দীপ : কাল আমি ওকে বলেছিলাম, যে অসুখ থেকে উঠেই আপনি আবার স্টুডিওতে যাচ্ছেন কেন? ক'দিন বিশ্রাম নিন —

রতন : কাল আবার তোমার সঙ্গে দেখা হলো কোথায়?

স : উনি আমার বাড়ি গিয়েছিলেন কাল যে—

র : হ্যাঁ, হ্যাঁ ; আমাকে ওই কাল বলেছিলো বটে যে তুমি ছুটি নিয়ে কোথাও যাও নি ; স্টুডিওতে আসবার জন্যে ছটফট করছ ; গ্লোরিয়া তোমাকে ধরে নিয়ে আসতে যাচ্ছে—

সন্দীপ মুখার্জি দু' মিনিটের মধ্যে সেকেণ্ড টাইম ব্লাশ করে।

রতন আবার মুখর হয় : তা, তুমিই তো কাল তাকে আসতে বারণ করেছ ; আবাব আজ অবাক হচ্ছ আসেনি কেন ? ডকটর হিল দাই সেল্ফ : রুগীর আগে তোমার মেমারিরই তো চিকিৎসা করা দরকার।

রতন প্রত্যেকটি কথা যেমন মনে আসে তেমনই বলে যায় দ্বিতীয় কোনও গূঢ়ার্থ না করেই। আর প্রত্যেক বারই চোরের বুক ছাৎ করে ওঠে ; মনে পড়ে যায় বোঁচকার কথা। গ্লোরিয়া-সন্দীপের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করছে না তো রতনলাল মুন্সী। সন্দীপ তাকায় রতনের দিকে ; সে মুখে আর যাই থাক ব্যজস্তুতির কোনওপ্রচেষ্টা নেই কোথাও। রতনও তাকায় সন্দীপের মুখের দিকে ; তারপর সান্ত্বনা দেয় : ডোণ্ট ওরি ; তুমি যেমন ছুটি নিয়ে ছটফট করছিলে বাড়িতে ; গ্লোরিয়ার অবস্থা তার চেয়ে ভালো নয়। এই এসে পড়লো বলে সেও—।

কিন্তু দিন শেষ হতে চললো গ্লোরিয়া এল না স্টুডিওতে। অসুস্থ গ্লোরিয়ার করুণ, নরম অসহায় মুখ মনে এলো সন্দীপের আর অব্যক্ত যন্ত্রণায় মোচড দিলো বুকের মধ্যে সেই সন্ধ্যার এবং তারপরের অনেক দিনরাত্রির নিভৃত গুঞ্জরণের ঝঙ্কার। সন্ধ্যার সময়ে গেলো গ্লোরিয়ার ফ্ল্যাটে। গ্লোরিয়া দাঁড়িয়েছিলো একটুখানি কোন বার করা সেমিসার্কুলার বারান্দায় চুপ করে। সন্দীপ যেদিক দিয়ে আসছিলো তার উল্টোদিকে মুখ করে তাকিয়েছিলো গ্লোরিয়া ; সন্দীপকে সে দেখতে পায়নি। সন্দীপ দেখছিলো গ্লোরিয়াকে। কতবার তাকে দেখেছে এর আগে ; কতরকম করে দেখেছে। কিন্তু আজকের সন্ধ্যায় যেমন অপরূপ, যেমন মোহময় লাগলো তাকে, যেমন করে সন্দীপের দৃষ্টিগোচরে তার

প্রোফিলের একটুখানি অনেকখানি হয়ে দেখা দিলো তেমন করে লাগেনি, তেমন করে দেখা দেয়নি এই বিদেশীনি পরস্ত্রী এর আগে।

বিকেলের পড়ন্ত আলো এসে পড়েছিলো সোনালী চুলে; মুখের একটুখানিতে এসে পড়েছিলো যাবার আগের সূর্যালোক! চোখের একটুখানি দেখা যাচ্ছিলো; সুদূরের পিয়াস সেই চোখের কোণে চিকচিক করছিলো ভোরবেলার ঘাসে দিনের প্রথম আলো এসে পৌঁছলে যেমন করে। কালকের সেই মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর মূর্তি নয়। নিজেকে যে হারিয়েছে অকারণে; আত্মরক্ষার প্রবল চেষ্টায় যে সফল হয়নি সমাজ সংসার যার মিথ্যে হয়ে গেছে; জীবনের কলরব যার কানে পৌঁছয় না আর অর্থবহ হয়ে; কুলছাড়াব বাঁশী যার কানে গেছে সেই অভিসারের অপেক্ষায় যে এসে দাঁড়িয়েছে ঘর থেকে বাতায়নে কখন আসে নিশীথ রাত্রির অমা তাবই বিরহ মধুর বেদনায় আচ্ছন্ন যার আনন্দ আজ তাকে দেখে সন্দীপ নিজেকে ধরে রাখতে পারছে কই।

পায়ের শব্দে চমকে ঘাড় ঘুরোতেই সন্দীপকে দেখে সে মুখে ছড়িয়ে যায় বর্ণনার অতীত অভিব্যক্তি। তুজনেই তুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। তারপর গ্লোরিয়া বলে : আজ আবার কেন এলে?

সন্দীপ : একটা কথা জানতে।

গ্লোরিয়া : বলো—

সন্দীপ : কাল তুমি বলে গিয়েছিলে যাবার সময় যে আমাকে না হলে মুন্সী ফিল্ম্ স্টুডিওর চলবে না; কিন্তু তোমার চলবে—

গ্লোরিয়া : তারই শোধ তুলতে এসেছ বুঝি আজ—

সন্দীপ : হ্যাঁ :

গ্লোরিয়া : বেশ, কি বলতে চাও আরও কঠিন, বলো—

সন্দীপ : বলতে চাই, যে আমাকে না হলে তোমার চলবে হয়ত; হয়ত কেন নিশ্চয়ই চলবে। কিন্তু

গ্লোরিয়া : কিন্তু কি?

সন্দীপ : কিন্তু তোমাকে না হলে আমার চলবে না—

সন্ধ্যা হলো; সূর্যদেব অস্তাচলে গেলেন। ওরা দুজনে বারান্দা থেকে ঘরে গেলো। পাশাপাশি বসলো; কিন্তু কেউ কারুর অঙ্গ স্পর্শ করে কলুষিত করলো না স্বপ্নের মতো জীবনের একটি পরমাশ্চর্য পবিত্র এই সন্ধ্যাকে। একটি দুটি তারা উঠি উঠি করে চুমকির মতো জ্বলে উঠলো নীলাম্বরীর সর্বাঙ্গে। সন্ধ্যা গড়ালো রাত্রিতে। নীলাকাশ আলো করে এলো পঞ্চদশীর চাঁদ; ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণীর বাসর প্রদীপ জ্বালাতে। স্বর্গীয় মদের ফেনায় উপচে পড়লো আকাশের আধার। ফুলের গন্ধে, চাঁদের আলোয় এলো জীবনের চরমাশ্চর্য সেই রমণীয় রাত্রি। দুজনে কথা পর্যন্ত বললো না বহুক্ষণ। পাছে কথা বললে ভেঙ্গে যায় এই কেঁপে ওঠা রঙীন স্তব্ধতা। পৃথিবীর কোলাহল থেকে অনেক দূরে তারা দুজন; একজন আরেকজনের কানে উচ্চারণ না করে আবৃত্তি করলো:

চল যাই আজকেই ছুটি দিয়ে কাজকেই
আকাশের আল ধরে আমরা দুজন—
পার হয়ে পৃথিবীর পথঘাট আলো ভীড়
নীল মেঘ কি নিবিড় দেখা প্রয়োজন!
আজ কোনও কাজ নয়, সাজ নয়, লাজ নয়
আলো হাসি গানময় কোকিল কূজন—
চল যাই আজকেই, ছুটি দিয়ে কাজকেই
আকাশের আল ধরে আমরা দুজন!

অনেক, অনেকক্ষণ বাদে গ্লোরিয়া স্বপ্নেভেজা অস্ফুট কণ্ঠে বললো: চিরকাল কি এমনই পাশাপাশি বসে থাকবো? এই সামান্য ব্যবধান ঘোচবার নয়?

সন্দীপ: না, তোমার স্বামী-পুত্র-সংসার আছে -

গ্লোরিয়া: তাহলে আবার এলে কেন—

স: এলাম এই কথা বলতে যদি কোনও কারণে অন্যায় সন্দেহ করে ত্যাগ করে রতন তোমাকে,—তাহলে আমার দরজা তোমার জন্যে খোলা রইলো—; আর

সেদিন সমাজ সংসার কারুর মুখ চেয়ে বাধা মানব না আর ; তোমাকে গ্রহণ করব পূর্ণ মর্যাদায়—

গ্লো : বেশ, তাই হবে। আমিও কথা দিচ্ছি যদি মুক্ত হই এই বন্ধন থেকে তবেই আবার ব্যবধান ঘোচাবার দাবী নিয়ে দাঁড়াব তোমার সামনে। ততদিন আমরা কেবল বন্ধু ; তার বেশি নয়।

সন্দীপ চলে গেল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ আর পৃথিবীতে রমণীয় অন্ধকারে বসে রইল এক রমণী নীরব অপেক্ষায়।

পাঁচ

এর পরেই রঞ্জন রয়ের সঙ্গে দৃষ্টিকটু ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো গ্লোরিয়া। ডালিয়া দেখলো চোখের ওপর তাই ঘটতে যাচ্ছে যতদূর ঘটানোর ইচ্ছে রতনের ওপর প্রতিশোধ নেবার স্পৃহাতেও ছিলো না। কামিনী মেহেরার ইচ্ছে হলো গ্লোরিয়াকে কনগ্র্যাচুলেট করে আসে রঞ্জন রয়ের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জেতায়। ডায়মাণ্ড স্লিপারের ডায়মাণ্ড হবার সুখে ডগমগে রঞ্জন ধরাকে সরা দেখতে লাগলো। ডায়মাণ্ড স্লিপারের অসভ্যেরা রঞ্জনের সঙ্গে বাজি ধরে এমন বুড়বাক বনবে ভাবতে পারে নি : তারা কতদূর এগিয়েছে রঞ্জন তা আবিষ্কারের আশায় চর নিযুক্ত করলো ডলোরেস ডেল রিও ওরফে কামিনী মেহেরাকেই। রতনের কানে গিয়ে যাতে পৌঁছয় তার জন্যে সবপ্রকার অনুষ্ঠানে ত্রুটি রাখলো না তারা যারা কারুর ঘর ভাঙ্গলে সবপ্রথম সমবেদনা জানাবার অছিলায় দেখে আসে ঘর আবার জোড়া লাগাবার চান্স আছে কি নেই।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

গ্লোরিয়া আমাকে একটি কথা বলেছিলো সেটি মানতে পারিনি বলে শেষ পর্যন্ত মামলা শেষ হবার আগেই আমি একদিন গেলাম সন্দীপের কাছে। সন্দীপ তখন থাকতো অক্ষয় বড়াল ষ্ট্রীটে একখানা ঘর নিয়ে এক পরিবারের সঙ্গে পেয়িং গেস্টের মতো। বাড়িটার গায়ে বাইরের দিকে একখানা ঘরে একা থাকতো; বাড়ির সঙ্গে সে ঘরের কোনও যোগ ছিলো না। সন্দীপের চাকর সেই বাড়িতে খেত এবং সন্দীপের খাবার নিয়ে আসতো। সন্দীপের খোঁজ করতে যে বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো আমাকে চট করে সে কলেজেও রতনের যাবতীয় দুষ্কর্মের সবচেয়ে বড় সহযোগী ছিলো। ইন ফ্যাক্ট তখন যাকে আমরা বরাবর ভোম্বল বলে জানতাম তার যে আসল নাম সন্দীপ, সে যে মুখার্জি,—এ যেমন তখনও, তেমনি এখনও আমার অজানা। আমার একার কেন; আমাদের সকলেরই যে ওই একই অবস্থা হবে ভোম্বলের ভালো নাম জিজ্ঞেস করলে আমি সকলের হয়ে তার রসিদ দিতে পারি। এমন কি রতন, যার অধীনে সে এখন সন্দীপ মুখার্জি হিসেবে মাইনে পায় তারও অবস্থা আমাদের দুরবস্থা থেকে বেশি দূরে নয়; তাকে জিজ্ঞেস করলেও সে চট করে কেন, অনেক ভেবেও ভোম্বলের ভালো নাম যে সন্দীপ, তার পদবী যে মুখার্জি বলতে পারবে না। ভোম্বলও নয়; আমরা আরও ইম্প্রুভ করেছিলাম: ভোমলা। ভোমলা এবং রতনকে দেখিয়ে আমাদের কমান কমেণ্টই সোচ্চার হতো সেদিন ঐকতানে: রতনে রতন চেনে। একজন আরেকজনের ছায়া ছিলো। কাউকে একা দেখলেই ধরে নেওয়া হতো আরেকটি হাতের কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। জগাইয়ের যেমন মাধাই; রতনের তেমনই ভোমলা।

আমি বসতে বললাম ঃ তুমি সন্দীপ মুখার্জি কি করে জানব ? আমি ভাবছি কে না কে ?

সন্দীপ ঃ কেউ না ; কেউ না দাদা,—আমি সেই তোমাদের ভোমলা ;—আদি ও অকৃত্রিম !—এখন বলো এমন হঠাৎ ?

আমি ঃ হঠাৎই বটে ; তবে এরজন্যে তুমিই দায়ী, আমি নয়—

সন্দীপ ঃ আমি ? বুঝেছি ; তুমি গ্লোরিয়ার কাছ থেকে আসছ ?

আ ঃ এখন আসছি না ; তবে সেই আসল কারণ তোমার কাছে আসার ; কিন্তু কি করে বুঝলে ?

স ঃ এখনও মামলা মেটেনি যে রতনের—

আ ঃ তাতে কি হলো—

স ঃ তাতে এই হলো যে চোখকান সজাগ রাখতে হয়েছে সর্বক্ষণ ; মামলাতে আমার নামটাও যাতে জড়িয়ে না যায় ফস করে—

আ ঃ স্কাউড্রেল !

স ঃ স্কাউড্রেল কেন দাদা ?

আ ঃ কেন ? সমস্ত ব্যাপারটার নায়ক তুমি তা জানো ?

স ঃ জানি—

আ ঃ আর আগাগোড়া মামলার মধ্যে তোমার নাম যাতে না বেরোয় ফস করে এখন কেবল তারই চেষ্টা—

স ঃ আমার অবস্থায় পড়লে তুমি কি করতে এছাড়া জানতে পারি ?

আ ঃ এ অবস্থায় পড়বার আগেই জাল কেটে বেরিয়ে যেতাম—

স ঃ এখন আমিও ভাবছি যে এ অবস্থা অব্দি আমার গড়াতে দেওয়া উচিত ছিলো না নিজেকে ; কিন্তু মুশকিল কি জানো ?

আ ঃ না ; কি বলো ?

স: চোর পালালে বুদ্ধি আর অন্যকে ডুবতে দেখলে উপদেশ দেবার প্রবৃত্তি বাড়ে গৃহস্থের; সে এ্যাডভাইস ভাইস এ্যাড করা ছাড়া আর কিছু করে কি?

আ: কিন্তু তুমি ডুবলে কোথায়? ডুবে ডুবে জল খেলে; পকেট কাটার দায়ে ধরা পড়লো কেবল যার তুহাত কাটা গেছে অনেক আগেই—

স: ধরা পড়লে খুসি হতে বলে মনে হচ্ছে—

আ: খুসি হতাম কি না জানি না; তবে দোষ করবে একজন সাজা পাবে আরেকজন,—এ বিচার নয়; এতে তুঃখিত হবারই কথা—

স: বাঃ দাদাঃ বাঃ! তুনিয়া জুড়ে কোথাও ন্যায় বিচার নেই; আমার ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার হলেই অন্যায় হতো না?

আ: যাক; যেতে দাও। এ তর্কের শেষ নেই; আর সেজন্যে আমি তোমার কাছে আসিনি আজ—

স: কিজন্যে এসেছ বলো দাদা; আই অ্যাম এ্যাট ইয়োর সার্ভিস—

তারপর হঠাৎ কি মনে হতে বলে: দাঁড়াও তার আগে তোমার জন্যে চা-টায়ের অর্ডার করি—

সন্দীপ চাকরকে ডাকে; আমি বাধা দিয়ে বলি: শুধু চা; টা নয়—

চা দিতে বলে সন্দীপ বসে আমার মুখোমুখি; তুজনেই সিগারেট ধরাই; ধোঁয়ার একাধিক অঙ্গুরী ভাসতে থাকে ঘরময়। সন্দীপই আমাকে ওসকায়: বলো কিজন্যে এসেছ?

—এসেছি কয়েকটা কথা পরিষ্কার করে নেবার জন্যে; তোমার জন্যেই এই হত্যাকাণ্ড শেষ পর্যন্ত ঘটতে পেরেছে, একথা কি স্বীকার কর?

—করি।

—তুমি কি স্বীকার কর যে গ্লোরিয়া-বঞ্জনের সমস্ত ব্যাপারটাই অভিনয়; আসলে গ্লোরিয়া তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসে নি?

—পুরো স্বীকার করি না; রঞ্জনকে ভালোবাসেনি কোনও দিন, স্বীকার করি; কিন্তু রতনকে ভালোবেসেছে সে একদা, একথা অস্বীকার করবে কে?

—তাহলে রঞ্জন রয়ের সঙ্গে এই মারাত্মক প্রেমের খেলা সে খেলতে গেল কেন?

সন্দীপ শুধু, কেন? বলে থেমে গিয়ে বললো: কেন করল সে এই কাজ, সেকথা বললে বিশ্বাস করতে পারবে?

—পারব; আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলি: দুনিয়া যাই বলুক, গ্লোরিয়াকে আমি আজও অবিশ্বাস করতে পারি না; তাকে আমি চিনেছি—

সন্দীপ হাসে: চিনলেও; জন্ম জন্ম চিনলেও বিশ্বাস করতে পারবে না এখন যা বলতে যাচ্ছি তা; তবুও শোন—

চাকর চায়ের কাপ এনে রাখে টেবলের ওপর। বাইরে সন্ধ্যা নামে; আর তার ছায়া অন্ধকার হয়ে নামে ঘরের মধ্যে। সন্দীপ উঠে আলো জ্বালাতে যাচ্ছিলো; বাধা দিলাম। অবিশ্বাস্য কাহিনীর জন্যে আলো বড্ড রূঢ়; বড্ড ব্লান্ট। তার চেয়ে অল্প আলো আর অনেকটাই ছায়াঘন এই পরিবেশ অনেক কম অস্বস্তিকর। বিশ্বাসের অযোগ্য কিছু শুনলে মুখের অভিব্যক্তি লুকোনার জন্যে অভিনয় করতে হবে না; অন্ধকারই কাজ করবে মুখোসের।

সন্দীপ বললো: রঞ্জনের সঙ্গে গ্লোরিয়ার প্রেমের অভিনয়, আমাকে পাওয়ার আশা ছাড়া আর কিছুর জন্যে নয় আমি সেদিনও যেমন জানতাম, আজও তেমনই জানি। আমি যেদিন তাকে বলেছিলাম: 'রতন যদি কোনওদিন তোমাকে পরিত্যাগ করে তাহলে আমার দরজা তোমার জন্যে খোলা থাকবে সেদিন,—সেইদিনই এই মতলব মাথায় আসে তার?

আমি জিজ্ঞেস না করে পারি না; এই আত্মঘাতী পরিকল্পনায় গ্লোরিয়ার লাভ?

সন্দীপ একরাশ ধোঁয়া ছাড়বার জন্যে সময় নিয়ে বলে: রঞ্জনের সঙ্গে তার সম্পর্কে সন্দেহ করে রতন তাকে ত্যাগ করবে—

আমার মুখ দিয়ে শুধু বেরোয়ঃ কি সর্বনাশ ?

সন্দীপঃ সর্বনাশই শেষ পর্যন্ত ডেকে আনলো গ্লোরিয়া ; রতন যে ক্ষিপ্ত হয়ে রঞ্জন রয়কে হত্যা করে বসবে এটা গ্লোরিয়ার কল্পনার বাইরে ছিলো—

আমিঃ ডোণ্ট বি সিলি ভোমলা ; একজনের স্ত্রী নিজের মুখে স্বীকার করবে সে অন্যের আব স্বামী তাকে কিছু করবে না,—এ ভাববার মতো কচি কেউ না ; গ্লোরিয়া তো নয়ই

সঃ তুমি এইখানেই ভুল জায়গায় পা দিচ্ছ ; গ্লোরিয়াকে যখন রতন জিজ্ঞেস করেঃ ইসিট রঞ্জন ?—তখন গ্লোরিয়া, হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি -

আঃ তাতে কি হলো—

সঃ তাতে এই হলো যে গ্লোরিয়া বলতে চেয়েছিলো যার কথা তার কথা না বলায়, যার কথা সে বলতে চায়নি তার কথা ভেবে রতন গেল রঞ্জনের ফ্ল্যাটে এবং তার ফলেই যা হবার নয় তা-ই হলো--

আঃ কিন্তু একটা কথা আমি এখনও বুঝতে পারছি না যে—

সঃ দাঁড়াও ; আরেক কাপ চা পেটে না পড়লে মাথায় কিছু ঢুকবে না

সন্দীপ চা বলে চাকরকে। আমি বাধা দিই না ; বাধা দিতে গেলে সন্দীপ কথা শুনবে না এবং তর্কাতর্কিতে সময় নষ্ট হবে ; আসল কথা চাপা পড়ে যাবে।

চা বলে এসে সন্দীপ জিজ্ঞেস করবেঃ কোন্ কথাটা আবার বুঝতে পারলে না দাদা ?

আমিঃ গ্লোরিয়া এত কাণ্ড না করে তোমার কথা খুলে বললে কি হতো রতনকে ?

সন্দীপঃ তার জন্যে আমি দায়ী !

আঃ মানে—

স ঃ আমি একটা জিনিষ গোড়া থেকেই ক্লিয়ার করে দিয়েছিলাম যে ঘূণাক্ষরেও আমার নাম যদি তার সঙ্গে জড়ায় তাহলে আমাকে আর স্টুডিওর অথবা গ্লোরিয়ার ধারে কাছে দেখতে পাবে না কেউ—

আ ঃ কারণ ?

স ঃ কারণটা তোমার এ্যাটলিস্ট জিজ্ঞেস করার মানে হয় না ; কারণ,—রতন আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু—

ডি. এল. রায়ের সাজাহান না মনে পড়ে পারে না এবার ; তাই বলি ঃ চমৎকার ! মহম্মদ, আবার বলি চমৎকার !

স ঃ বিদ্রূপ করছ ?

আ ঃ না ; স্তব করছি। তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করতে আপত্তি নেই ; নাম জানাজানিতেই আপত্তি তোমার ?

স ঃ তুমি অন্যায় করছ আমার ওপর—

আ ঃ কি রকম ?

স ঃ আমি তার স্ত্রীর আমার প্রতি এই দুরন্ত ইনফ্যাচুয়েশানের এতটুকু অন্যায় সুযোগ নিইনি ; আমি কেবল বলেছি যে রতন কোনও দিন ত্যাগ করলে তাকে সসম্মানে গ্রহণ করতে আমার বিবেকে বাধবে না।

আ ঃ বেশ, যদি তুমি জানতে রঞ্জনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছে গ্লোরিয়া তোমাকে পাবার জন্যে তাহলে গ্লোরিয়া যখন তোমার কাছে আশ্রয়ের জন্য এলো তখন তুমি পালিয়ে থেকে রঞ্জনের ব্যাপারে তাকে কলঙ্কিত করে নিজেকে বাঁচাতে চাইলে কেন ?

স ঃ ওইটুকুর জন্যে আই ডু প্লিড গিলটি ! তখন আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ; রতন যে রঞ্জনকে ছেড়ে দেবে না এবং সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারিতে গড়াবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো আমার চোখে,—তা-ই—

আ ঃ এটাকে তুমি ওইটুকু বলছ কোন্ আক্কেলে ?

সন্দীপ চুপ করে থাকে। কথার প্যাঁচে যে যে কোনও কালোকে সাদা প্রমাণ করবার জাদু জানে সে-ও যেমন একেবারে নির্জলা সত্যর সামনে চুপ করে যায় তেমনই।

ওঠবার উদ্যোগ করতে করতে আমিই আবার বলি: গ্লোরিয়া যা করলো এ উপন্যাসে পড়লে আমি উড়িয়ে দিতাম গল্পের খাতিরেও টু মাচ টু সোয়ালো বলে; কিন্তু গ্লোরিয়াকে দেখবার পর, সমস্ত ব্যাপারটা জানবার পর উড়িয়েও দিতে পারছি না মেনে নিতেও পারছি না যে—

স: কোন্‌টা বলো

আ: কোন্‌টা আবার? এই একজনকে পাবার জন্যে আরেকজনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় যার এমন মর্মান্তিক ট্র্যাজিক পরিণতির জন্যে এতটুকু চিন্তা করতে না পারা?

স: এ তুমি আমি কেউই বুঝবো না; প্রেমে পড়েও না—

আ: কেন?

স: কারণ আমরা পুরুষ! এ ম্যান ইন লাভ আর এ উওম্যান ইন লাভ এক নয় কোনওদিন! উপন্যাসে এক হতে পারে; জীবনে এক নয়—

আ: কি বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বলো--

স: এর চেয়ে স্পষ্ট করে বলা আমার মতো পণ্ডিতের সাধ্য নয়। বিশ্বাস করো দাদা, প্রেমে পড়ে সিংহাসন ত্যাগ করা পর্যন্ত পুরুষের পক্ষে সম্ভব; সম্ভব কারণ, যে সিংহাসনের ঝামেলা এড়াতে চায় সে প্রেমকে মহৎ অজুহাত করে কারণ ওই সঙ্গে একদম ফাউ একটা ফল্‌স কীর্তিও রেখে যেতে পারে প্রেমের জন্যে স্বার্থত্যাগের জলন্ত উদাহরণে; কিন্তু প্রেমে নারীই পারে কেবল নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলে দিতে: প্রেমের জন্যে কুলত্যাগ অথবা কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে নেবার অনেক বেশি দাম দিতে হয় নারীকে যে সমাজে দুশ্চরিত্র আর অসতীর অপরাধ এক নয় আজও—রাস্তায় পা

বাড়াবার আগে সন্দীপ ওরফে ভোমলা জামার হাতা চেপে ধরে আমার ঃ এবার আমারকথা শুনবে ?

আ ঃ শোনবার হলে নিশ্চয়ই শুনবো—

স ঃ এই ব্যাপাবে যদি কখনও কিছু লেখো,—তাহলে আমাকে দাদা স্কাউণ্ড্রেল করে এঁকো না ; যা বললাম তার থেকে আমি ভয় পেয়ে ডুবিয়েছি একজনকে পাঁকের অতলে ; একজনেব হয়েছি নিহত হবার কারণ ; আরেকজনকে করেছি হত্যাব আসামী,—দোহাই তোমাব এরকম করে আমার চরিত্র গোড়ো না

আ ঃ তোমাব কাছে আজ না এলে বিশ্বাস কবো তোমার কথা কখনও যদি লিখতাম মহৎ চরিত্র কবেই আকতাম এবং তাতে আমাব বই, বাঙলা সাহিত্যেব যাবা একমাত্র পাঠক সেই পাঠিকাদের মনোরঞ্জন কবতো অনেক বেশি ; কিন্তু এবই যদি কখনও লিখি পাঠিকাব, অথবা বউভাতে বাড়তি বিক্রি অথবা লাইব্রেবীব মুখ চেয়ে লিখবো না ; লিখলে জীবনেব মুখ চেয়েই লিখবো- -

সন্দীপেব মুখে আমাব কথায কি রি-এ্যাকশন হয় তা লক্ষ্য করবাব মতো যথেষ্ট আলো ছিলো না ধাবে-কাছে কোথাও।

দুই

গ্লোবিয়া আমাকে বলেছিলো যে সন্দীপ তাকে ভুল বুঝেই ওই রকম দোষাবোপ কবে চিঠি দিয়েছিলো ; ওই একটি কথাই কেবল বিশ্বাসের যোগ্য মনে কবিনি আমি আব সেই কথাটা জানতেই আমার সন্দীপ ওরফে ভোমলাব কাছে যাওয়া ; এবং সন্দীপকে ধন্যবাদ সে আসলে যা তা লুকোবার চেষ্টা করেনি বিন্দুমাত্র। সোজাসুজি স্বীকার করেছে যে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো ; গ্লোবিয়া যখন তার

কথায় বিশ্বাস করে তার-ই জন্যে অন্যলোকের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে স্বামীর কাছ থেকে মুক্তিপত্র আদায়ের সববনেশে সর্ব্বস্বপণ করে বসেছে তখনই পিছিয়ে এসেছে সন্দীপ ভয় পেয়ে; এবং ভয় পাবার কাপুরুষ-তাকে ঢাকতে গিয়ে নিয়েছে ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যার আশ্রয়। গ্লোরিয়াকে অসতীত্বের অপবাদ দিয়েছে রঞ্জনকে জড়িয়ে। রঞ্জনের সঙ্গে গ্লোরিয়ার সম্পর্ক যে কেবল সন্দীপকে পাবার অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, তা জেনেও গ্লোরিয়াকে সরিয়ে দেবার সবচেয়ে হীন, সব চেয়ে সহজ উপায় ত্যাগ করবার মতো মহত্বের পরিচয় দিতে সেদিন সে সক্ষম হয়নি। এই কাহিনীর সেই অভিনায়কের সবচেয়ে কলঙ্কযুক্ত হবার যোগ্য নামই সবচেয়ে কলঙ্কমুক্ত থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত আদালতের নথাপত্রের অনেক বাইরে থেকে। আমার সন্দেহ শেষ পর্যন্ত পরিস্কার করে দিয়েছে সন্দীপ নিজেই। সে প্লিডগিল্টি করায় তার ঘনকালো কাপুরুষতার মেঘে এই একটুখানি স্বীকৃতির সিলভার লাইনিং-ই মাত্র বলবার মতো; বাকি সে যা করেছে গ্লোরিয়ার জীবন মরণের ব্যাপারে তা কোনও পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রেই পৌরুষের পরিচয়ে নয় প্রদীপ্ত: তাই সেকথা থাক।

কিন্তু যেকথা, যার কথা, তার অত কথার পরেও আমার কাছে আজও পরিস্কার নয় সে-ই এই কাহিনীর একমাত্র নাটক : গ্লোরিয়া। রতনলাল মুন্সীর মামলার নেপথ্যে গিয়ে দাঁড়াবার আগে, যখন এই মামলা কেবলমাত্র খবর কাগজে স্ল্যাণ্ডাবাস আলোচনার সবচেয়ে উত্তেজক, সবচেয়ে মুখরোচক বিষয় তখন যে একটা ব্যাপার নিয়ে আমার মনে এতটুকু দ্বন্দ্ব ছিলো না তা হচ্ছে গ্লোরিয়ার অন্যায়। কাগজে এবং লোকের মুখে যখন সাঙ্ঘাতিক ডেট ব্ল্যাক করে আঁকা হয়েছে তার প্রাতিকূল্য তখনও তার এই স্বামীপুত্র থাকতে দ্বিতীয় প্রেমে আমি অন্যায় কিছু দেখিনি এবং আজও দেখি না। সেই সময় সবত্র শুনেছি যে রঞ্জন রয়ের সঙ্গে গ্লোরিয়াকেও মেরে ফেলা উচিত ছিল নতুনের। তাহলেই একমাত্র যথার্থ বিচার হতো অসতী পিশাচার। দুর্ভাগ্যক্রমে এই মতের হুক্কা হুয়ায় আমি যেমন সেদিনও পারিনি, তেমনই আজও সক্ষম নই

এতটুকু সায় দিতে। তার কারণ আমি জানি। আমি জানি যে সামাজিক বিধিনিষেধ মানুষের ওপরই চলেছে চিরকাল; এখনও চলেছে ভবিষ্যতেও চলবে। কিন্তু মানুষের মনের ওপর তা কোনওদিন চলেনি; আজও তা চলবে না; এবং আগামী কালও তা অচলই রইবে।

আমি আরও জানি যে পুরুষের মধ্যে একাধিক নারীর সঙ্গলিপ্সা এবং স্ত্রীলোকের হৃদয়ে একাধিক পুরুষের জন্যে সিংহাসন বিরাজ করা বিচিত্র নয় বিন্দুমাত্র। বরং তাই হয়ে এসেছে; তাই হচ্ছে; এবং তাই-ই হবে। যে কোনও খাদ্যেই ক্ষুধা মেটে তবুও কেউ আছে কি এমন প্রতিদিন এক খাদ্যে যার অরুচি না হয়। তাই ঘরে পরমা সুন্দরী স্ত্রী থাকলেও লোকে পরম অসুন্দর স্ত্রীলোকের কাছে যাবেই। পুরুষ যে সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সে সমাজে স্ত্রী হয়তো অত সহজে মনের মানুষের কাছে প্রকাশ্যে যেতে সাহস করবে না; তবে মনে মনে কোথাও তার হারিয়ে যেতে নেই মানা! প্রকাশ্যে যেতে দুঃসাহসের অভাব হবে অনেকক্ষেত্রেই কারণ এ সমাজে পুরুষের একাধিক বিবাহের দুশ্চরিত্রতা তেমন অপরাধ নয় যেমন পাপ সতীর স্বামী ছাড়া আর যে কারুর ছায়া মাড়ানোতেও। তাহলে কেন সামাজিক বিধিনিষেধের এই বিপুল এবং বিপুলতর মিথ্যার বেড়াজাল? তারও উত্তর আমি জানি।

আমি জানি যে এরও প্রয়োজন আছে; এই সামাজিক বিধিনিষেধেরও। স্মরণাতীত কালে যখন জোর যার মুলুক তার রীতিতে মানুষ দেখলো বাঁচা যায় না তখনই সে সমাজ এবং সামাজিক আইনের ভিত্তি, লিভ এণ্ড লেট লিভ-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে প্রথম। এবং আজও সামাজিক কানুন ও ক্রিমিন্যাল কোডের কৃপাতেই সভ্যতা টিঁকে আছে। না হলে মানুষ আসলে এত অসভ্য এত প্রাগৈতিহাসিক রয়ে গেছে যে আইনের দণ্ড উদ্যত না থাকলে এই মুহূর্তেই ব্যাভিচার, হত্যা, লুণ্ঠনে ধরণী রসাতলে যেত। তাই সমাজের দুর্বলতর সংখ্যাগুরুদের বাঁচাবার জন্যেই দুর্দান্ত সংখ্যালঘুদের হাত থেকে হত্যা করলে প্রাণদণ্ড এবং ব্যাভিচার করলে শাস্তি দেবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে; প্রয়োজন আছে বারম্বার পুনরাবৃত্তি করার যে ক্রাইম

ডাস নট পে। এমনিতেই ক্রিমিন্যাল প্রবৃত্তি এত জোরালো যে তা না বললে; হিংসাবৃত্তি এত সোচ্চার যে অহিংসা পরমো ধর্ম না উচ্চারণ করলে কানের কাছে অনবরত মানুষের যে বনমানুষের স্তরে আবার ফিরে যেতে অতি অল্প অথবা একেবারেই কোনও সময় লাগতো না তাতে সন্দেহ কি।

তবুও। তবুও গ্লোরিয়ার এই দ্বিতীয় প্রেম আমার কাছে এতটুকু অসৎ নয়; অদ্বিতীয়। এবং সন্দীপকে ঘিরে একটি নতুন নীল আকাশ হৃদয়ের বাতায়ন পথে অবারিত হয়েছে দিন থেকে দিনে; এর জন্যে রতনের প্রতি একদা তার বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টির সবটুকুই মিথ্যা হয়ে গেছে অথবা স্বামীর সন্তানের প্রতি কর্তব্যের অমার্জনীয় ত্রুটি ঘটেছে একথা আমি স্বীকার করি না। গ্লোরিয়া নিজেও আমাকে বলেছে; বলেছে যে রাতের পর বিনিদ্র রাত একদিকে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে নিদ্রাগত স্বামী; অন্যদিকে বিবশ দিন বিরস কাজের মধ্যে প্রেমের আবির্ভাব সুবিপুল সমারোহে। রক্তাক্ত হলো গ্লোরিয়া। ক্ষতবিক্ষত হলো সে। যতবার এসে দাঁড়ায় সন্দীপ ততবার বিবেকের সবল বাহু দিয়ে সরিয়ে দেয় তাকে গ্লোরিয়া; তবুও আবার এসে দাঁড়ায় সে যার জন্যে মনে হয় শ্রাবনঘন গহণ রাতে বৃষ্টি নামলে সমাজ-সংস্কার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব। গ্লোরিয়া না বললেও আমার কাছে তার দ্বিতীয় প্রেম অদ্বিতীয় বলেই বিবেচিত হতো; সন্দীপ ছাড়া আর কারুর সঙ্গে তার ফ্লার্ট করার কোনও প্রমাণ নেই যখন তখন এবং যখন রতনের প্রশ্নের উত্তরে নীরব সম্মতি জানিয়েছিল সে যে আরেকজন এসেছে তার জীবন তখন তাকে ইনফিডিলের অখ্যাতি মানায় না বলেই আমার বিশ্বাস। রঞ্জনের সঙ্গে তার সম্পর্ক তুচ্ছ হয়েছিলো কি না আদৌ আমার সন্দেহ আছে; যদিও হয়ে থাকে তাহলেও মানুষের কাজের বিচার কেবল কাজ দিয়ে হয় না: হয় উদ্দেশ্য দিয়ে। এবং সে বিচারে গ্লোরিয়াকে আমি যে আসন দিতে প্রস্তুত সে আসন আমি পতিপ্রাণা কাউকে দিতেই দ্বিধান্বিত।

কিন্তু গ্লোরিয়ার এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার উচ্ছ্বাস হোক গত

মাত্রাহীন এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমার আজও সন্দেহ যায়নি। সন্দীপকে পাবার জন্যে গ্লোরিয়া যা করেছে, রঞ্জনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়; রতনের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সন্দীপের সঙ্গে মেলবার দুঃসাহসীক প্রত্যাশা তা অলৌকিক, না অলীক না সত্যসত্যই একটি মেয়ে এ পৃথিবীতে তার জন্যে একজনকে বলি এবং আরেকজনকে হত্যার আসামী হতে বাধ্য করেছিলো; যার পরিবর্তে সে পরিত্যক্ত হয়েছিলো তার দ্বারাই যার জন্যে তার শেষ পর্যন্ত নিজের মুখেও দুরপনেয় কলঙ্কের ব্ল-ব্ল্যাক। আমি ভেবে পাইনি সেদিনও যেমন আজও তেমনই যে এই অসম্ভব এবং অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থ প্রচেষ্টা কেন করে। একজন। তাছাড়া একজনকে পাবার জন্যে আরেকজনের কাছে কতদূর বিকোতে পারে একজন নারী যাতে যার জন্যে তার এই বিকোনো, সে-ও পারে ভুল বোঝার সুযোগ পেতে,—আমার কাছে হেঁয়ালী থেকে গেছে। হয়ত সন্দীপ যা বলেছে তাই ঠিক। আমাদের পক্ষে এ অনুধাবন করা সম্ভব নয় কারণ এ ম্যান ইন লাভ আর এ উওম্যান ইন লাভের মধ্যে এত পার্থক্য যে উওম্যান না হলে তা বোঝার চেষ্টা বৃথা।

পুরুষদের কাছেও প্রেম প্রয়োজন, তবে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থ, সামর্থ্যের বিনিময়ে নয়। কখনও কখনও যে ব্যতিক্রম ঘটে যায় ইতিহাসে তার নেপথ্যে দাঁড়াতে পারলে দেখা যাবে যে নারী এর কারণ সে নারী নামে মাত্রই মেয়ে আসলে তার ব্যক্তিত্ব যে কোনও প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের চেয়েই অনেক হিপনটিক। এদের প্যাসান আগুনের মতো, তার হাত থেকে রেহাই নেই কীটপতঙ্গ থেকে সুরু করে সিংহশার্দুলের, ঘাসের ডগা থেকে বনস্পতির চূড়ার। এদের নাগালের বাইরে যারা সেই সব পুরুষদের কাছে প্রেম হচ্ছে একটা বেশ কিছুকাল স্থায়ী প্যাসটাইম, তার বেশি নয়। সমাজের অথবা বাড়ীর অথবা স্বার্থের অঙ্গুলি হেলনে এরকম প্রেমকে মুহূর্তে বিস্মৃত হতে পারা নিঃশ্বাস নিতে পারার চেয়ে বেশি কষ্টের নয়। কিন্তু নারীর কাছে কখনও কখনও প্রেম এই পৃথিবীর আলোবাতাসের চেয়েও অনেক বেশি জরুরী।

কখনও কখনও এমন ভালোবাসায় ভরে যায় ভোরের আকাশ কোনও নারীর। ভালোবাসার পাত্র ওই আকাশের মতোই সুদূর জেনেও আর নিজেকে জেনে মৃত্তিকাচারী তবু কেন যে তার মনে জাগে desire of the moth for the star, সে জানে না। জানলে সে হতো এ ম্যান ইন লাভ; কিছুতেই হতো না সে যা তা-ই; এ উওম্যান ইন লাভ। যাকে ভালোবাসে তাকে ছাড়া আর কিছুই না ভালোবাসার আর যাকে ভালোবাসে তার কারণে সব কিছুকেই ভালোবাসার উদ্দামতা সকল যুগেই যাকে কলঙ্কের আর দুর্ভাগ্যের করেছে সম্মুখীন সেই তো কেবল উওম্যান ইন লাভ।

তা-ই সন্দীপের কথাই হয়তো ঠিক। বিচার করে বিশ্লেষণ করে এই সবনাশা প্রেমের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। সম্ভব নয় তার কারণ প্রেমে ব্যর্থ হয়েও জীবনে সার্থক পুরুষের সংখ্যা অগণ্য। কিন্তু প্রেমেব সঙ্গে যার অস্তিত্বের অবিচ্ছিন্ন যোগ সেই অবিনশ্বর প্রেমের অধিশ্বর পুরুষ নয় কোনও কালে; অনিবার্য অপ্রতিবোধ্য, অপরিহার্য প্রকৃতির কারণেই সে চিরকাল নারী।

তিন

সন্দীপের কাছ থেকে বেরুবার পর এমনই একটি নারীর কান্নায় ভেজা মুখ বারবার এসে দাঁড়াচ্ছিলো: বাধা দিচ্ছিলো বারবার পায়ে-পায়ে। সেমুথ একদিন অবারণ কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিলো: ইট ওয়াস নট রঞ্জন; ইট ওয়াস নট হি—। সন্দীপ মুখার্জি ওরফে ভোমলাকে গুড নাইট করে বেরিয়ে সারা রাস্তা যার অঙ্গহীন সঙ্গ সুধায় এবং বেদনায় ভবে দিলো তার অঙ্গে অঙ্গে একদিন যে বাঁশি বাজাতো আজ থেকে অনেকদিন আগেই নিশ্চয়ই সেই যৌবনের সূর্যাস্ত হয়েছে সুনিশ্চিত। তবু আজও কেন কখনও কখনও কে জানে অন্যমনে একলা ঘরে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় গ্লোরিয়া ম্যাকডোনালড্।

নিরুপম নীল আর নির্জন নিশীথ রাত্রে নির্ঝরিণীর স্বপ্নভঙ্গ হয় হঠাৎ সে এলে। তার দর্পণে ভারি করুণ ভারি নরম ভারি অসহায় ভেসে ওঠে চোখের জলে ভেসে যাওয়া মুখ গ্লোরিয়ার। রতন মুন্সীর মামলার সময়ে যখন গ্লোরিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তার নিভৃত সান্নিধ্যে তখনও রতনের কি হবে মামলায় হার না জিত জানতাম না; কিন্তু এটুকু প্রায় সবাই জানতাম সেদিন যে সাজা হলেও নমিন্যালের চেয়ে গুরুভার হবে না কোনও ক্রমেই যদি সাজা হয় আদৌ। জানতাম রতনলাল আবার ফিরে যাবে কাজের পৃথিবীতে; পূর্ণোদ্যমে না হোক আবার ঘুরবে তার চাকা। রঞ্জন রয় মরে বেঁচে গেছে আসলে। কামিনী মেহেরা ফিরে গেছে খেলার শেষে মিস্টার মেহেরার স্নেহসুনিবিড় শান্তির নীড়ে। সন্দীপ বিবাহ করে ডালিয়াকে জীবনের অপরূপকথায় নটে গাছ মুড়োবার আগে অবধারিত ইতিবাক্যকে সত্য করে তুলেছে এতদিনে নিশ্চয়ই ঃ দে ম্যারেড এণ্ড লিভ্ড্ আনহ্যাপিলি এভার এ্যাফটার। কিন্তু গ্লোরিয়া? সে কি পেলো দুহাত ভরে, ধিক্কার ও লাঞ্ছনা, নিয়তির এই নির্মম উপহার ছাড়া?

জীবনের পথ যখন দিনের প্রান্তে পৌঁছে, নিশীথের গহনে হারাবে নিজেকে, সবাই যখন হারজিতের খেলা শেষ করে হিসেব মেলাতে বসবে কি পায়নি তার সেদিন এই হতভাগ্য এক রমণীর জন্যে কারুর স্মৃতির ধূসর আকাশে বারেকের জন্যেও আঁকা হবে কি একটি নীলারঞ্জনরেখা? বোধ হয় না। ঘর যাকে বাঁধতে পারেনি; পথ যাকে মুখ ফিরিয়েছে; সমাজ যাকে পরিত্যাগ, সংসার যাকে পরিহার আর প্রেম যাকে করেছে কেবল প্রবঞ্চনা; সন্তান যাকে স্বীকার করতে পারেনি মা আর স্বামী যাকে সহধর্মিনী বলে; জীবনে যে দিল সব পেল না কিছুই তার সান্ত্বনার বাণী কোথায় এই বিপুল বসুন্ধরায়? সেদিন রাস্তায় বেরিয়ে না মনে করে পারিনি যে আজ থেকে অনেকদিন পর এই মামলার স্মৃতি যখন পরিণত হবে ধূসর পাণ্ডুলিপিতে; যখন উত্তেজনার কালো কেশে বিস্মৃতির শুভ্র পাক ধরবে; যখন লোলচর্ম ইতিবৃত্ত হবে শিথিলবন্ধন তখন রতনলাল মুন্সী হয়ত নতুন করে ঘর পাতবে নতুন কোনও শাখার

হাত ধরে ; সন্দীপের মনে পড়বে না সেদিনও কেউ প্রতীক্ষায় আছে তার ; রঞ্জন রয় বলতে আসবে না রহস্যের ওপার থেকে যে তার জন্যে যার কলঙ্ক সে অপাপবিদ্ধা ; ডালিয়ার প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি রক্তের উত্তাপ কমে গেলে অনুশোচনার সলিলে অবগাহন করে শান্ত হবে হয়ত ; কেবল কামিনী মেহেরার ঠোঁটের কোণে সিগারেটের মুখে জ্বলবে বাঁকা হাসির রক্তিম নিওনসাইন ; শুধু বিপথগামিনী এই মিথ্যা রায়ে চিরকালের জন্যে দাগী একজন দিনের পর দিন জ্বলেও মরবে না তুষের আগুনে ; অল্প অল্প করে পুড়বে জীবনভোর। সেদিন, ভারতীয়কে বিবাহ করবার গৌরবে এক বিদেশীনি নারীর সিঁথির সিঁদুরে আর হাতের নোয়ায় তখনও লেগে রইবে এক প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট পুরুষের মিথ্যা অঙ্গীকার ঃ তোমার স্বামী যদি কখনও তোমাকে ত্যাগ করে তখনও খোলা রইবে আমার দরজা।

চিরকালের জন্যে বন্ধ সেই দরজায় করাঘাত করে যাবে যে তার বন্ধ দরজা অবারিত হবে একদিন যেদিন তার পরম লজ্জার হাত থেকে মুক্তি দিতে চরম মুহূর্তে ধরনী দ্বিধাগ্রস্থ হবে ; অন্ধবিবরে আশ্রয় দেবার পর সেই নারীকে তার শেষ শয্যায় তার ওপর বিছিয়ে দেবে মৃত্যুর কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদন